"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মহান মে দিবস ২০১৮

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মহান মে দিবস ২০১৮

'যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা
গৌরী, যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান'

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৮ বৈশাখ ১৪২৫
০১ মে ২০১৮

বাণী

মহান মে দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষই হচ্ছে উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা 'রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১' বাস্তবায়নে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমজীবী মানুষের সার্বিক কল্যাণসাধন ও তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্ক, শ্রমিকের অধিকার, তাঁদের পেশাগত নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিতকরণের কোন বিকল্প নেই। বর্তমান শ্রমিকবান্ধব সরকার এ লক্ষ্যে ন্যূনতম মজুরী নিশ্চিতসহ শ্রমিকের স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে প্রয়োজন বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, শ্রমিকের একাগ্রতা এবং শ্রমিক-মালিক পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক। শ্রমিক ও মালিকের ইতিবাচক ও প্রাগ্রসরমাণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, স্বার্থ ও কল্যাণের সঙ্গে মহান মে দিবসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁদের জীবনমান উন্নয়ন এবং ন্যায্য অধিকার রক্ষায় সকলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ঐকান্তিকভাবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন- এ প্রত্যাশা করি।

আমি মহান মে দিবস ২০১৮ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮ বৈশাখ ১৪২৫
০১ মে ২০১৮

বাণী

মহান মে দিবস শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অবিস্মরণীয় দিন। এ দিবস উপলক্ষে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল দেশের মেহনতি মানুষের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করছি এবং তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

১৮৮৬ সালের এ দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা আত্মাহুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার। আমি তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত, একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত- আমি শোষিতের পক্ষে"। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন।

বর্তমান সরকার দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন ও কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আমরা পোশাক শিল্পসহ ৩৮টি শিল্প খাতের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছি। শ্রমঘন গার্মেন্টস শিল্প খাতের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১,৬৬২ টাকা থেকে ৫ হাজার ৩ শ টাকায় উন্নীত করেছি। ইতোমধ্যে শ্রম আইন যুগোপযোগী করে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত 'বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা চালু করেছি।

আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় হয়েছে। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সুসম্পর্ক বজায় রাখা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' ও বিধি, জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা এবং গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি প্রণয়ন করেছি। শিল্প কারখানায় বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে সার্বিক নিরাপত্তা সন্তোষজনক রাখার লক্ষ্যে মানসম্মত ও যথাযথ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করেছি। আমাদের এ সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সুফল শ্রমজীবী মানুষ পেতে শুরু করেছেন। আওয়ামী লীগ সরকার শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

শ্রমিকদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য আমরা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করেছি। এ তহবিলে ২০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এ তহবিল থেকে তাজরীন গার্মেন্টসের ক্ষতিগ্রস্থ ১০৯টি শ্রমিক পরিবারকে ১০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, ২০১৭ সাল পর্যন্ত ৯৬৬ জন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে প্রায় ৫ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্নখাতে কর্মরত ১ হাজারেরও বেশি শ্রমিককে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা কল্যাণ, গোষ্ঠিবীমার প্রিমিয়াম ও শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

আমি আশা করি, মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ উভয়ই সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরও নিবেদিত হবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে সক্ষম হব।

আমি মহান মে দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ও সংগ্রামের অনুপ্রেরণার উৎস। আজ থেকে ১৩২ বছর আগে ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ, শ্রমের যথার্থ মূল্য ও দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবি জানাতে গিয়ে যে শ্রমিকেরা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের মর্যাদাপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি ধারণ করে যাচ্ছে মহান এই দিনটি।

বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিবছর দিবসটি উদ্‌যাপন করে আসছে। শোষণ, বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে মুক্তির দীপ্ত শপথ নিয়ে এ দিবসটি পালিত হয়। মহান এই ঐতিহাসিক দিনে শ্রমজীবী সকল মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন হতে বিশ্বায়নের এ-সময় পর্যন্ত উন্নয়নে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি তারা হলেন শ্রমজীবী মানুষ। মে দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় তাদের অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদান তাঁদেরকে নব্য উদ্যমে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগায়। যে কোন দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শ্রমজীবী মানুষের কায়িকশক্তি ও সক্ষমতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান শ্রমবান্ধব সরকার শিল্পোন্নয়নের পাশাপাশি শ্রমিকের কল্যাণে শিল্প-শ্রমিক ব্যবস্থাপনায় সহায়ক পরিবেশ এবং শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের এ যুগে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শ্রম-দক্ষতা উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও শোষণহীন 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জাতির পিতার সেই স্বপ্নপূরণে দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে আমাদের মানোন্নয়ন হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন আরও গতিশীলতা লাভ করবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সার্বিক কল্যাণে শ্রমিক-মালিক-সরকার সু-সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ার অভিযাত্রায় দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে এ হোক মহান 'মে দিবস ২০১৮'-এর অঙ্গীকার।

মোঃ মুজিবুল হক এম.পি

সভাপতি
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা।

বাণী

আজ থেকে ১৩২ বৎসর পূর্বে ১৮৮৬ সালে শ্রমিকের মর্যাদা, দৈনিক কর্ম সময় নির্ধারণ ও শ্রমিকের ন্যায় সংগত অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা যে আত্মত্যাগ করেছিল তা স্মরণ করার অভিপ্রায়ে মহান মে দিবস ২০১৮ উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি সকল শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষকে ও দেশবাসীকে মে দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবরের মত এবারও মে দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করায় মে দিবসের অনুপ্রেরণায় সকল মেহনতি মানুষ অনুপ্রাণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ দিবসের মাহেন্দ্রক্ষণে আমি সে সকল শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করছি যাদের রক্তে আজ শ্রমিকদের ন্যায় সংগত দাবী ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্বের যে কোন দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি মেহনতি মানুষ। দেশের উন্নয়নে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একজন শ্রমিক দরদী নেত্রী। তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও নির্দেশনায় বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রমিক আইনকে সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হয়েছে। অতীতের যেকোন সরকারের তুলনায় সরকারি বেসরকারি খাতে শ্রমিকদের কল্যাণে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বিশ্বে প্রশংসিত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রম বান্ধব আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অবস্থান সর্ব মহলে সমাদৃত।

বিশ্বের যে কোন দেশের তুলনায় আমাদের দেশে শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগকে অবারিত করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন করার সরকারি সুযোগকে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যেন কেবলমাত্র শ্রমিকের ও দেশের সার্বিক কল্যাণে কাজে লাগান সে জন্য আমি অনুরোধ জানাই।

শ্রমজীবী মানুষের দ্রুত কর্মসংস্থানের প্রয়াসে বর্তমান সরকার একদিকে যেমন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করছেন ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছেন, তেমনি অন্যদিকে ইতোপূর্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কারখানা চালু করার সম্ভব সব পদক্ষেপ নিচ্ছেন,যা দ্রুত আমাদের অর্থনীতিকে গতিশীল করছে।

সর্বক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থে সৎ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে আমরা যেন বাংলাদেশের প্রতিটি শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারি, এটাই হোক এবারের মহান মে দিবসে আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান এম.পি

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মহান মে দিবস মেহনতি শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের মূর্ত প্রতীক।

১৮৮৬ সালের এই দিনে শ্রমজীবী মানুষের কর্মঘন্টা নির্ধারণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আত্মাহুতি দানকারী শ্রমিকদের স্মরণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মে দিবস ২০১৮ পালন করছে। এ উপলক্ষ্যে আমি সকল আত্মোৎসর্গকারী শ্রমিকের স্মৃতির প্রতি জানাচ্ছি গভীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্য-আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নতকরণের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য সরকার রপ্তানি, রেমিটেন্স, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প অবকাঠামো ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ধারায় গতিশীলতা সঞ্চারণে প্রায়োগিক ও কার্যকর পদক্ষেপ অব্যাহতভাবে গ্রহণ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দিক্-নির্দেশনায় সফল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশে গত এক দশক ধরে ধারাবাহিক উর্ধ্বগামীতায় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জাতিগঠনে শ্রমশক্তি এরই অনুক্রমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন-এ আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে টেকসই উন্নয়নের পথে দেশ অগ্রসর হচ্ছে। শ্রমবান্ধব আদর্শকে সামনে রেখে এদেশের সুবিশাল শ্রমজীবী মানুষের যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শিশুশ্রম নিরসন ও ন্যায্য মজুরি নির্ধারণের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে এগিয়ে চলাই হোক মহান মে দিবসের অঙ্গীকার।

(আফরোজা খান)

মহাপরিদর্শক
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

মহান মে দিবস বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের পহেলা মে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে দৈনিক কর্মঘন্টা নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকেরা নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে প্রাণ হারান। এ দিবসে নির্ধারিত হয়েছে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার। সে প্রেক্ষাপটে এটি শুধু একটি সাধারণ দিবস নয়, অধিকার আদায়েরও একটি প্রতিকী দিন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সারাদেশের কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা,২০১৫ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়ন ও শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করতে নিয়মিত ও বিশেষ পরিদর্শন ছাড়াও শ্রমিক ও মালিকগণের প্রতিনিধিদের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হচ্ছে।

শিশুশ্রম নিরসনকল্পে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ গুরুত্বসহকারে পরিদর্শন পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, গার্মেন্টস সেক্টর ও চিংড়ি সেক্টরে শিশুশ্রম নিরসন করা হয়েছে এবং অন্যান্য সেক্টর থেকেও ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। চলতি অর্থবছরে ১১টি সেক্টর থেকে ঝুকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে চারহাজার কারখানা ভবনে স্ট্রাকচারাল, ফায়ার ও ইলেক্ট্রিক সেফটি অ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের সংস্কার কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য 'সংস্কার সমন্বয় সেল' কাজ করছে। এজন্যে কারখানার মালিকগণের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে প্রয়োজন অনুসারে সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিসমূহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এর বিষয়টি নিশ্চিত করছে। এছাড়াও কারখানায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশ্রামাগারসহ শ্রম আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করতে অত্র অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।
আমি মে দিবস, ২০১৮ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া)

মহাপরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

মহান মে দিবস বিশ্বের মেহনতি মানুষের দাবী আদায়ের স্মৃতি বিজড়িত সংহতির এক অনন্য দিন। শ্রমের মর্যাদা এবং দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবীতে ১৮৮৬ সালের এই দিনে আমেরিকার শিকাগো শহরে সংগ্রামী শ্রমিকরা সৃষ্টি করেছিলেন আত্মত্যাগের এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আজকের দিনে বিশ্বের সকল মেহনতি মানুষকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে ঐক্য ও সংহতি প্রকাশ করে প্রতি বছরের মত এবারও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস উদ্‌যাপন করছে। শ্রম ক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের ঐক্যবদ্ধ কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রত্যয়কে প্রাধান্য দিয়ে এবারের মহান মে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে,

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

বর্তমান সরকার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সু-সম্পর্ক আস্থা ও বিশ্বাস উন্নয়নে সেতু বন্ধনের কাজ করে যাচ্ছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরকারের সঠিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে গৃহীত উদ্যোগ আজ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। দেশ আজ অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায়।

শ্রমিক বান্ধব বর্তমান সরকার শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নসহ শ্রম ক্ষেত্রে সঠিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম পরিদপ্তরকে "অধিদপ্তরে" উন্নীত করে এর জনবল বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছে। এজন্য শ্রম অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বর্তমান সরকারকে জানাচ্ছি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

শ্রমিক, মালিক এবং সরকারের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হবে এটাই হোক আমাদের সকলের অংগীকার।

(শিবনাথ রায়)

Officer in charge
ILO Bangladesh

Message

On behalf of the International Labour Organization I would like to wish the citizens of Bangladesh a happy May Day 2018.

Bangladesh continues to progress in many areas and its recent graduation to developing country status is an outstanding achievement. The contribution of the government, employers and workers to this achievement must be recognized.

Graduation will bring with it new challenges. However I am confident that the nation can continue along a growth path that is inclusive, job rich and lifts people out of poverty. A path in which decent work is created in safe working conditions and where labour rights are respected.

For the year ahead, ILO will continue to work closely with the Government of Bangladesh, employers and workers organizations.

We will continue to support efforts to complete remediation in the RMG sector and instil a culture and practice of Occupational Safety and Health that benefits all workers.

Work to build relationships between employers and employees based on mutual respect and trust will remain a priority as will efforts to provide equitable, inclusive and quality technical education.

We will also promote safe, fair and skilled migration while also seek to establish a universal Employment Injury Insurance scheme that benefits workers and employers alike.

On this historic day, I applaud the Government of Bangladesh as well as the representatives of employers and workers organizations for all their efforts over the past year. I firmly reiterate ILO's commitment to supporting your efforts to achieve decent work for all.

Gagan Rajbhandari

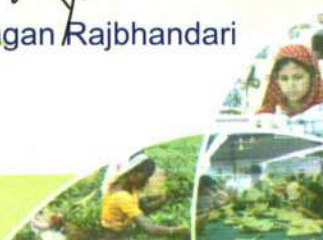

সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

বাণী

১ মে মহান মে দিবস। ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসের ১৪ তারিখে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশ। এ সমাবেশে প্রতিবছর মে মাসের ১ তারিখে শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসেবে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এই মহান মে দিবসে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেইসব কালজয়ী শ্রমিকদের যারা নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার। তাঁদের আত্মত্যাগ কেবল শ্রমিক সমাজকেই গৌরবান্বিত করেনি, গৌরবান্বিত করেছে বিশ্বমানবতাকে।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের গভীর দেশপ্রেম, অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার কারণেই দেশে আজ শিল্পায়নের গতি সঞ্চারিত হয়েছে। এর সাথে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে থাকে। উদ্যোক্তা ও শ্রমজীবী মানুষের নিবিড় ও একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন ও অগ্রগতি সূচিত হচ্ছে। সরকার বিশেষ গুরত্বসহকারে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অবস্থার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের অব্যাহত অগ্রগতির জন্য শিল্প সম্পর্কের উন্নয়ন এবং শিল্প-কারখানায় শান্তি-শৃংঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

এ মহান মে দিবসে সকল মেহনতি মানুষকে অভিন্দন জানিয়ে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। সবাই সম্মিলিতভাবে কৃষি ও শিল্প-কারখানাসহ সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সংগ্রামী শপথ গ্রহণ করি এবং দেশের স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলি।

কামরান টি. রহমান

সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ

বাণী

শ্রম ও ন্যায্য মজুরি, নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা শ্রমিকের শ্বাসত অধিকার। এটি ভুলে গিয়ে শিল্প শ্রমিকের উপর মালিকদের অমানুষিক নির্যাতন চলে। এর প্রতিবাদে আট ঘন্টা কাজের দাবিতে ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে সংঘটিত ঐতিহাসিক ও মর্মান্তিক শ্রমিক আন্দোলনের আজ ১৩২ বছর পূর্তি ১লা মে, ২০১৮ সাল। এ দিনে Michigan Avenue থেকে শ্রমিকরা যে সকল দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল আমরা তাদের উত্তরসুরি হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন কাযক্রমকে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী অনেক দূর নিয়ে এসেছি। বলা যায় এটি এখন সময়োপযোগি।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকল ভেঙ্গে বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুদক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙ্গালী জাতি যে বিজয় অর্জন করেছিল, তার মাধ্যমেই বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তার তীক্ষ্ণ দুরদৃষ্টিতে বুঝেছিলেন, শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিই একটি দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি। বাংলার আপামর শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়োজন অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন। তিনি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর তৎকালীন সকল কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছিলেন। কোন দাবিনামা পেশ করার পূর্বেই বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মজুরি কমিশন ও বেতন কমিশন গঠন করে তাদের মজুরি ও বেতন ভাতাদি পরিশোধ করেছিলেন। কলকারখানা, ব্যাংক, বীমাখাত ও প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় খাতে অধিগ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করাসহ ১লা মে জাতীয় ছুটি ঘোষণা করেন।

বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষেরে যে কোন যুক্তিসংগত প্রত্যাশা পূরণে সর্বদা সদয় দৃষ্টি প্রদান করেন। তাঁর সরকার বাংলাদেশ শ্রমনীতি ২০১৩, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, এর সংশোধনীসহ বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করেন যা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় অত্যন্ত যুগোপযোগি। দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তবমুখী সর্বাধুনিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় শ্রমিক লীগের পতাকাতলে সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীরা আজ ঐক্যবদ্ধ। জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ২০৪১ সালে বিশ্বে সুখি সমৃদ্ধশালী শোষণমুক্ত এবং সাম্প্রদায়িক উগ্র জঙ্গিবাদমুক্ত উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

(আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ)

সম্পাদকীয়

''শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই, সোনার বাংলা গড়তে চাই'' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় এবারের মহান মে দিবস সরকারি পর্যায়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১ মে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। মে দিবস শিক্ষা দেয় ঐক্য, দেশ প্রেম,আত্নত্যাগ ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করার।

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিক মালিকের অনন্য অবদানে যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে সরকার। শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সরকারের দূরদর্শী ভূমিকায় দেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হতে যাচ্ছে। মহান মে দিবসের তাৎপর্য দেশের এই অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করেছে। মে দিবসের অনুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এবারও এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ প্রকাশনার মাধ্যমে মহান মে দিবসের তাৎপর্য ও গৃহীত কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় স্মরণিকা প্রকাশে সদয় নির্দেশনা ও উপদেশ দিয়ে কমিটিকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

এবারের মহান মে দিবস উদ্‌যাপনে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, রবি আজিয়াটা লিঃ, ওরাসকম টেলিকম (বাংলালিংক), ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ, বাটা সু কোম্পানী লিঃ, বসুন্ধরা গ্রুপ, ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ লিঃ, আকিজ গ্রুপ, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ, দি ওয়েস্টিন হোটেল ঢাকা, বি.আর.বি ক্যাবলস লিঃ, ওয়ালটন বাংলাদেশ লিঃ, লিন্ডে বাংলাদেশ লিঃ, আবুল খায়ের গ্রুপ, কবির স্টিল লিঃ (কাঁচপুর,-মেঘনা-গোমতী ২য় সেতু), কবির স্টিল লিঃ (জাহাজ বিভাজন বিভাগ), খাজা শীপ ব্রেকিং লিঃ, কাফকো লিঃ, প্রাণ গ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ, ওরিয়ন গ্রুপ, নোভারটিস বাংলাদেশ লিঃ, বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিঃ, বিএসআরএম স্টিলস লিঃ, পিএইচপি গ্রুপ, হোটেল রেডিসন ব্লু, নীট কনসার্ন লিঃ, মেট্রো গ্রুপ, দাদা (ঢাকা) লিঃ, সিন সিন লিঃ, অবন্তি গ্রুপ, ফকির এ্যাপারেলস, ফকির ফ্যাশন, ফকির নিটিং লিঃ, মাইক্রোফাইবার লিঃ এবং ডিবিএল গ্রুপ আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

সাধ্যমত একটি সুন্দর স্মরণিকা প্রকাশে আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টার পরও প্রকাশনায় ভুলভ্রান্তি থেকে যেতে পারে, এ বিষয়ে পাঠকদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। স্মরণিকা প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা।

এ বি এম সিরাজুল হক
আহবায়ক
স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
১	মে দিবসের আন্দোলন ও আজকের প্রেক্ষাপট	ঃ শাজাহান খান এম.পি	০১-০৪
২	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের গুরুত্ব	ঃ মোঃ মুজিবুল হক এম.পি	০৫-০৭
৩	উন্নয়নশীল বাংলাদেশ ও কৃষি নারী শ্রমিক	ঃ শিরীন আখতার এম.পি	০৮-০৯
৪	শ্রম ও শিল্পভাবনায় মে দিবস ও বিকেএমইএ'র কার্যক্রম	ঃ এ.কে.এম সেলিম ওসমান এম.পি	১০-২০
৫	মহান মে দিবস: বাংলাদেশের পোশাক শিল্প	ঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	২১-২২
৬	কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান	ঃ কামরান টি রহমান	২৩-২৪
৭	"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই সোনার বাংলা গড়তে চাই"	ঃ শিবনাথ রায়	২৫-২৬
৮	Work and Employment of Persons with Disabilities	ঃ Md. Anwar Ullah FCMA, Phd	২৭-৩০
৯	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিকের নিরাপদ কর্মস্থল	ঃ মোঃ শাহজাহান মিয়া	৩১-৩২
১০	মহান মে দিবস ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ	ঃ আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ	৩৩-৩৪
১১	পহেলা মে'র তাৎপর্য ঃ বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা	ঃ আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম	৩৫-৩৬
১২	শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমেই শিল্প বিকাশ সম্ভব	ঃ ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান	৩৭-৩৮
১৩	''মহান মে দিবস - শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দিবস ''	ঃ এ্যাডভোকেট মো: দেলোয়ার হোসেন খান	৩৯-৩৯
১৪	ঐতিহাসিক মে দিবসের প্রত্যয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে	ঃ আবদুল মতিন মাষ্টার	৪০-৪৪
১৫	মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়নে দেশরত্ন শেখ হাসিনা	ঃ ফজলুল হক মন্টু	৪৫-৪৬
১৬	মে দিবসের চেতনায় শিল্প বিপ্লব, টেকসই অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রত্যয়	ঃ মোঃ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী	৪৭-৪৮
১৭	মহান মে দিবস ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার	ঃ মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া	৪৯-৫০
১৮	''গৃহ কর্মী এক সম্মানজনক কাজ''	ঃ রওশন জাহান সাথী	৫১-৫৩

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
১৯	মে দিবসের ভাবনা ঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজন "শ্রমিকের অধিকার, নিরাপদ কর্মস্থল/শোভন কাজ এবং সমমজুরী" নিশ্চিত করা;	ঃ জেড.এম.কামরুল আনাম	৫৪-৫৫
২০	মে দিবসের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে- শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হই।	ঃ শামসুন্নাহার ভূইয়া	৫৬-৫৭
২১	শ্রমিকের মুক্তির পথ	ঃ নইমুল আহসান জুয়েল	৫৮-৬০
২২	অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত: শ্রম অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ	ঃ এ আর চৌধুরী রিপন	৬১-৬৩
২৩	বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা	ঃ কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ	৬৪-৬৫
২৪	'মে দিবস পালন ও শ্রমের মর্যাদা সংরক্ষণ'	ঃ এম এ রশীদ	৬৬-৬৭
২৫	International Labor Day: A Celebration of Workers Rights	ঃ Prof Dr. Md. Golam Azam	৬৮-৭০
২৬	শ্রম আইন এবং শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন	ঃ ডাঃ এ.এম.এম আনিসুল আউয়াল, পিএইচডি	৭১-৭২
২৭	The Bloody History of May Day: How May 1 Became a Holiday for Worker's	ঃ A.T.M Saiful Islam	৭৩-৭৫
২৮	Bangladesh's Graduation from the Least Developed Country to a Developing Country: Implications for the Labour Sector	ঃ Md. Humayun Kabir	৭৬-৮৫
২৯	ঐতিহাসিক মে দিবসের প্রত্যয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে	ঃ মহসিনুল হক	৮৬-৮৭
৩০	পরিক্রমা	ঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন	৮৮-৯০
৩১	মহান মে দিবস বঙ্গবন্ধু এবং শ্রমিক বান্ধব শেখ হাসিনা	ঃ মোঃ সামসুল আলম (বকুর) হাওলাদার	৯১-৯৪
৩২	মহান মে দিবস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট	ঃ মোঃ শহীদুল্লাহ বাদল	৯৫-৯৬
৩৩	দেশের উন্নয়নে নির্মাণ শ্রমিকদের ভূমিকা	ঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	৯৭-৯৮
৩৪	মে দিবস : শ্রমজীবী মানুষের অবিরাম সংগ্রামের প্রেরণা	ঃ রাজেকুজ্জামান রতন	৯৯-১০০
৩৫	মহান মে দিবসের চেতনা	ঃ সুলতান আহম্মদ	১০১-১০২
৩৬	Informal Economy- তে বাঁচার মত মজুরি চাই	ঃ মোঃ নুরুল ইসলাম	১০৩-১০৪

সূচি পত্র

			পৃষ্ঠা নং
৩৭	মহান মে দিবসের স্বরণে ''শিল্পের উন্নয়ন-শ্রমিকের অধিকার বাড়বে মর্যাদা সবার''	ঃ সিরাজুল ইসলাম রনি	১০৫-১০৫
৩৮	মহান মে দিবস	ঃ এস.এ. তালুকদার	১০৬-১০৬
৩৯	বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীতকরণে শ্রমিকের ভূমিকা	ঃ মহব্বত হোসাইন	১০৭-১০৮
৪০	অক্ষয় অব্যয় চিরজীবী এক চেতনার নাম ১ মে	ঃ মোল্যা আবুল কালাম আজাদ	১০৯-১১০
৪১	উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে	ঃ আহসান হাবীব মোল্লা	১১১-১১২
৪২	শ্রম-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর আলোকে	ঃ ড. উত্তম কুমার দাস	১১৩-১১৫
৪৩	একজন শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাষ্টার-মেহনতি মানুষের নেতা	ঃ খালিদ মাহমুদ ভূঁইয়া	১১৬-১১৮
৪৪	মালিক কর্তৃক বঞ্চিত পরিবহন শ্রমিক	ঃ মোঃ ইনসুর আলী	১১৯-১২০
৪৫	ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রত্যাশা: স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী পালন	ঃ কামরুল আহসান	১২১-১২২
৪৬	বাংলাদেশের গার্মেন্টস এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা	ঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম	১২৩-১২৩
৪৭	মহান মে দিবস শিকাগো থেকে ঢাকা	ঃ মিতসু শাওলীন	১২৪-১২৬

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

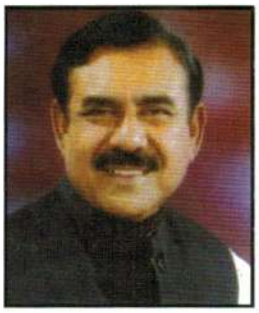

মে দিবসের আন্দোলন ও আজকের প্রেক্ষাপট

শাজাহান খান এম.পি
মন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

১৮৮৬ সালের ১ মে শ্রমিকের রক্তে মহান মে দিবস সৃষ্টি। শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও ৮ ঘন্টা কর্ম দিবস আদায়ের লক্ষ্য নিয়ে শ্রমিকরা বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়েছিল আমেরিকার শিকাগো শহরে হে মার্কেটে। সে রক্ত দানের ইতিহাস স্মরণ করে সারা বিশ্বের শ্রমিক কর্মচারীসহ সকল শ্রেনী পেশার মানুষ যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি পালন করে। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের ৮০ টি দেশের সরকার আত্মত্যাগী শ্রমিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ১ লা মে কে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছে।

শ্রমিকদের আত্মদানের স্মরণে ১৮৮৯ সালে আন্ত:দেশীয় শ্রমিক আন্দোলনের সংগঠন, আন্তর্জাতিক প্যারিস কংগ্রেস ১ লা মে বিশ্বে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য ও সংগ্রামের প্রতিকী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণের বিষয়গুলোকে পৃথক গুরুত্ব দিয়ে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) বিভিন্ন বিধিবিধান সহ দেশে দেশে প্রবর্তনের জন্য কাজ করে চলেছে।

মে দিবস এখন শুধু শ্রমিক ও সমাজতন্ত্রীদের নয় তা এখন বিশ্বজনীন। বিশ্বের সকল শ্রেণী পেশার মানুষ এই দিবসে এই দিনটিতে সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। নতুন করে শপথ গ্রহন করে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।
কেন মে দিবসের সৃষ্টি হয়েছিল ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের বহু দেশে শিল্পের মালিকরা শ্রমিকদের সাথে অমানবিক আচরণ করত। ১২ ঘন্টা হতে ২০ ঘন্টা পর্যন্ত খাটিয়ে নির্মম শোষণ ও পুঁজির দাসত্বে বেধে রাখা হয়েছিল। তখনই শ্রমিকরা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছিল। মজুরী বৃদ্ধি, সংঘটিত হওয়ার অধিকার এবং সেই সাথে ৮ ঘন্টা কার্য দিবসই ছিল শ্রমিকদের আন্দোলনের মূল দাবী।

শিকাগো শহরে শুধুমাত্র ১ লা মে তারিখে রক্ত ঝরেনি। পরেও কয়েকটি দিন তুমুল ধর্মঘট ও আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে আরো কয়েকজন শ্রমিক শহীদ হয়। শহীদ এর রক্ত কখনো বৃথা যায় না। ন্যায্য অধিকার, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চির ভাস্বর থাকে। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ যখন নির্যাতিত হয়, শোষিত, বঞ্চিত হয় তখনই মানুষ বিদ্রোহ করে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার পর থেকে বহু শ্রমিক আন্দোলন পর্যালোচনায় দেখা যায়, আন্দোলন যখন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য গনতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত হয়েছে এবং শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেয়েছে, সে আন্দোলনে যতই রক্ত ঝরুক না কেন তারপরেও সফল হয়েছে। আর যে আন্দোলনে গণতান্ত্রিক ধারা বা দেশের প্রচলিত শ্রম আইন লংঘিত হয়েছে এবং হঠকারিতায় রূপ নিয়েছে সে আন্দোলন সফল হতে পারেনি।

বাংলাদেশের বহু শ্রমিক আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য বিভিন্ন সরকার গুলি চালিয়েছে, অনেক শ্রমিকের জীবন দিতে হয়েছে। তারপরও শ্রমিক আন্দোলন হয়েছে, সফলও হয়েছে। এর নজিরও বাংলাদেশে রয়েছে। ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বিএনপি ও জামাত ক্ষমতায় যাওয়ার লালসায় আন্দোলনের নামে শ্রমিক কর্মচারী পেশাজীবী মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র, যুবক, শিশু ও নারীদের হত্যা করেছে। সম্পদ ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষন, লুটসহ নানা ধরনের নাশকতামূলক কাজ করেছে। অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই হঠকারী আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণি সহ সকল শ্রেণীর মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা জীবন দিয়ে প্রতিহত করেছে। এরও নজির বাংলাদেশে রয়েছে।

১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় এসে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৩-৯৪ সালে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধি ও বকেয়া পাওনা আদায়ের আন্দোলন করেছিল। সে আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য পবিত্র রমজান মাসে বিএনপি সরকারের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের গুলিতে ১৭ জন শ্রমিককে জীবন দিতে হয়েছে। ২০০১ সালে খালেদা জিয়া পুনরায় ক্ষমতায় এসে ২০০৩ সালে শ্রমিকরা একই দাবিতে আন্দোলন করলে পুনরায় তাদের উপর গুলি চালিয়ে ২ জন শ্রমিক হত্যা করে। শ্রমিক আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য এশিয়ার সর্ব-বৃহৎ শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠান আদমজী জুট মিলসহ বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান বিএনপি সরকার বন্ধ করে দিয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে বেকার করে।

পাশাপাশি শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে অলাভজনক ১১ টি বস্ত্র মিল শ্রমিকদের মালিকানায় দিয়ে দেন। বন্ধ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করেছে। শেখ হাসিনার শাসনামল ৩ টি মেয়াদকাল পূরণ করতে যাচ্ছেন। তিনি কখনো শ্রমিক বা অন্য কোন আন্দোলন হত্যাকান্ড ঘটিয়ে স্তব্ধ করতে যাননি। বরং শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা সচেষ্ট রয়েছেন।
১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে দেশে মৌলিক অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার কেড়ে নেয়। এরপর তিন জোটের আন্দোলন চলাকালে জেনারেল এরশাদ তিন জোটের সাথে বৈঠক করেন। শেখ হাসিনার দাবির ভিত্তিতে জেনারেল এরশাদ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ফিরিয়ে দেয়।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে ১৯৯২ সালে সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের ১১ দফা দাবীতে চলমান আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাস ও ট্রাক টার্মিনাল এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের অফিস দখল করে নেয়। তারা পুলিশ ও দলীয় সন্ত্রাসী একত্রিত হয়ে ঢাকা শহরে গাড়ী চালাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের অবৈধভাবে কমিটি গঠন করে ব্যাপক চাঁদাবাজি শুরু করে। তারপরও ২৩-৩০ জুন পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকে। চলমান সড়ক পরিবহন শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সমর্থন জানিয়ে সংসদে বক্তৃতা করেন। দ্রুত শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী মেনে নিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহারে দাবী জানান।

২০০৬ সালে খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংসদে পাশ হয়। ঐ আইনের অনেকগুলো ধারা-উপধারা পরিবর্তন পরিমার্জন করে আমি ৫৬ টি সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে উপস্থাপন করেছিলাম। ঐ আইনের উপরে আমাকে সহ বিরোধী দলের কোন সংসদ সদস্যকে বক্তব্য দানের সুযোগ দেয়া হয়নি। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সেদিন ওয়াক আউট করেছিলাম। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ সহ সকল শ্রমিক সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শেখ হাসিনা সেদিন ঘোষণা করেছিলেন তিনি ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করবেন। তিনি কথা রেখেছেন। ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন করেছে।

বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের সিংহ ভাগ অর্জিত হয় পোশাক শিল্প থেকে, সেখানে এই শিল্পের শ্রমিকরা বিভিন্ন সরকারের সময় ন্যূনতম মজুরি পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করে। ১৯৮৪ সালে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ছিল ৫৭০ টাকা। এর দশ বছর পর ১৯৯৪ সালে মজুরী নির্ধারিত হয় ৯৩০ টাকা। এক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতি বছর মাত্র ৩৬ টাকা হারে মজুরী বৃদ্ধি পেয়ে ১০ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬০ টাকা। এর ১২ বছর পর ২০০৬ সালে ১৬৬২ টাকা মজুরী নির্ধারিত হয়। এর ফলে দেখা যায় প্রতি বছর ৬২ টাকা হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ বছরে ৭৩২ টাকা বৃদ্ধি পায়।

২০০৯ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে ২০১০ সালে ১৬৬২ টাকার স্থলে ৩০০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করেন। ২০১৩ সালে পুনরায় ৩০০০ টাকা হতে ৫৩০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করেন, এবং প্রতিবছর শতকরা ৫ ভাগ হারে ইনক্রিমেন্ট এর ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে দেখা যায় শেখ হাসিনার শাসনামলে ৭ বছরে মজুরী বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৬৩৮ টাকা। প্রতি বছর ৫১৯ টাকা হারে মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি শ্রম আইন অনুসরণ করে ২০১৮ সালে পুনরায় ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহিলা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ করছেন এবং মালিকদের স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে শ্রমিকদের জন্য ডরমেটরী নির্মাণ করার সুযোগ দিয়েছেন। এছাড়া আইন অনুযায়ী শ্রমিকরা অর্জিত ছুটি নগদায়ন, মূল বেতনের সমপরিমাণ বছরে ২টি উৎসব বোনাস, পূর্ন বেতনে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, দূর্ঘটনার কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়িয়ে মৃত্যুজনিত ২ লাখ টাকা এবং স্থায়ী সম্পূর্ন অক্ষমতার কারনে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা দেয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রম কল্যাণ তহবিল গঠন করে দুঃস্থ অসহায় শ্রমিকদের আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। তার সরকারের ২০০৯-২০১৩ সালের মেয়াদকালে সড়ক পরিবহন শ্রমিক সহ সকল সেক্টরের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। শিল্পে উৎপাদনের পরিবেশ রক্ষার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়, শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষকে ভালবাসেন বলেই তাঁর সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা ও শিল্প রক্ষার জন্য সর্বদা কাজ করেছেন।

কর্মক্ষেত্রে নিহত ও আহত শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের সহযোগীতার জন্য সকল প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় এর কেন্দ্রীয় কল্যাণ তহবিলের আওতায় আনা হয়েছে। এজন্য বাণিজ্য মন্ত্রনালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রপ্তানি মূল্যের ০.০৩ শতাংশ হারে অর্থ বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র মাধ্যমে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হচ্ছে। একজন গার্মেন্টস শ্রমিক কোন দূর্ঘটনায় নিহত বা গুরুতর আহত হলে তার পরিবার এ তহবিল থেকে ৩ লাখ টাকা অনুদান পাবেন এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে যে কোন মৃত্যুর জন্য তার পরিবারের স্বজনরা ২ লাখ টাকা পাবেন।

তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এ খাতে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ২৮.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সেক্টরে প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিক সরাসরি কাজ করে যার প্রায় ৮০ ভাগ কম সুবিধা ভোগী নারী। তৈরী পোশাক খাতে সহায়ক খাত সমূহ যেমন ব্যাংক, বীমা, আইটি, পরিবহন, ট্যুরিজমসহ অনেক খাত গড়ে উঠেছে। এ খাত দেশকে ক্রমান্বয়ে সাহায্য-নির্ভরতা থেকে বাণিজ্য-নির্ভরতার দেশে পরিণত করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারের অব্যাহত বাণিজ্যিক কূটনৈতিক সাফল্যের কারণে ইতোমধ্যে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানের কমপ্লায়েন্স অর্জন করেছে।

ইপিজেড শ্রমিকদের অধিকার-সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ শ্রম আইন বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ অনুমোদিত হয়েছে। ইপিজেড কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে বেপজা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডে ইপিজেড হাসপাতাল এবং অবশিষ্ট ৬টি ইপিজেডে মেডিকেল সেন্টার করেছে। ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান নিশ্চিতকরণে বেপজা ইতোমধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম কর্ণফুলী ও কুমিল্লা ইপিজেডে বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও উত্তরা ইপিজেডে স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ইপিজেডসমূহ পর্যায়ক্রমে চাহিদার ভিত্তিতে স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

এর সবই সম্ভব হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বুকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন বলেই। তার সূদূর প্রসারী পরিকল্পনা, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার লক্ষ্যে সকল শ্রেনী পেশার মানুষ আবালবৃদ্ধবণিতাকে সচেতন করে তুলেছেন বলেই। সে কারনে একটি স্বল্পোন্নত বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সামাজিক অস্থিরতা হ্রাস পেয়েছে। এই উন্নয়নের ধারাকে নস্যাৎ করার জন্য খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠী ও যুদ্ধাপরাধীদের সাথে খালেদা জিয়া সরকার থাকাবস্থায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস করে ১৭ জন শ্রমিক, ১৮ জন কৃষক ও ১৮ জন গ্রাসবাসীকে হত্যা করেছিল। তেমনি সরকারের বাইরে এসেও ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫ সালে ৯২ জন ড্রাইভার ও হেলপার, ১৭ জন পুলিশ, ৩ জন বিজিবি জোয়ান, ৩ জন গ্রাম পুলিশ, ২ জন মুক্তিযোদ্ধা, ২জন ব্যাংক কর্মচারী, বীমা কর্মচারী, গার্মেন্টস শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, ৯ জন বালু ট্রাকের শ্রমিক, হকার, ফল ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, জনপ্রতিনিধি, নারী ও শিশুসহ অসংখ্য যাত্রীদের বোমা, পেট্রোল বোমা মেরে পুড়িয়ে, পিটিয়ে, কুপিয়ে হত্যা করেছে। পেট্রোল বোমায় অগ্নিদগ্ধ হয়েছে প্রায় ৪০০ শ্রমজীবী মানুষ। অনেক শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছে এবং কর্মহীন হয়ে পড়েছে। গরু ও মুরগী বহনকারী ট্রাকে আগুন দিয়ে ট্রাকসহ গরু ও মুরগীর বাচ্চা পর্যন্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে। আলু, চাল, পোশাক শিল্পের পন্যসহ ট্রাক পুড়িয়ে দিয়েছে। নিহত হয়েছে অসংখ্য শ্রমিক। আহত ও পঙ্গু হয়েছে বহু ড্রাইভার ও হেলপার।

পেট্রোল বোমা, গান পাউডার দিয়ে প্রায় এক হাজার যানবাহন জ্বালিয়েছে এবং তিন হাজার যানবাহন ভাংচুর করেছে। রেল লাইনের ফিসপ্লেট তুলে রেল দূর্ঘটনা ঘটিয়েছে। নতুন নতুন রেলগাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ষ্টীমার ও লঞ্চে আগুন দিয়েছে। ৬০ হাজার গাছ কেটে পরিবেশ বিনষ্ট করেছে। পবিত্র কোরআন শরীফ , হাদিস শরীফ ও মসজিদের জায়নামাজ আগুনে পুড়িয়েছে। গরীব হকারদের মালামাল লুট করেছে, পুড়িয়েছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মন্দির ও বাড়িঘর ভাংচুর করেছে। মসজিদে বোমা মেরেছে ও ইমাম হত্যা করেছে। নারীদের সম্ভ্রমহানী করেছে। ২০১৪ সালে ৫ জানুয়ারী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করার জন্য ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ৫২৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়েছে এবং ভাংচুর করেছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আসবাব পত্র ভেঙ্গেছে। প্রিজাইডিং অফিসার হত্যা করেছে। ভোটারদের পায়ের রগ কেটেছে। জাতীয় পতাকা পুড়িয়েছে। শহীদ মিনার ভেঙ্গেছে। অসংখ্য বাড়িঘর ও পত্রিকা অফিস আগুনে পুড়িয়েছে।

এসব ধ্বংসাত্মক, সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড করার উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করা, দেশের মানুষের শান্তি বিনষ্ট করা, সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত করা। যুদ্ধাপরাধী ও দুর্নীতিবাজদের রক্ষা করা এবং বাংলাদেশকে অকার্যকর, জঙ্গী, সন্ত্রাসী ও ধর্মান্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করা। সর্বোপরি শেখ হাসিনাকে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়েছে। বিএনপি-জামাতের তান্ডব ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডে নিহত ও আহত ড্রাইভার হেলপার, যাত্রী হিসেবে শিশু, নারী ও ক্ষতিগ্রস্থ যানবাহনের মালিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এ পর্যন্ত প্রায় ৬৩ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক অনুদান দিয়েছেন। আরও অনেকের অনুদানের বিষয়টি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অথচ বিএনপি নেতা খালেদা জিয়া অনুদান দেয়া তো দূরের কথা মানবিক কারণেও দুঃখ বা অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। এই জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের এহেন কর্মকান্ড বন্ধের আহবান জানাননি। বরং তিনি সন্ত্রাসীদের অর্থ অনুদান দিয়ে সন্ত্রাসীদের উৎসাহিত করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মহান মে দিবসে শ্রমিকের রক্তদানের প্রেরণা নিয়ে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের ন্যায় সঙ্গত দাবি প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। তারা যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্ব থেকে বহু আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ভবিষ্যতেও তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জঙ্গী ও সন্ত্রাসকে প্রতিহত করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী ও 'মাদার অব হিউম্যানিটি' শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জঙ্গি ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে শান্তি, গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে-ইনশাআল্লাহ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
দুনিয়ার মজদুর এক হও,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের গুরুত্ব

মোঃ মুজিবুল হক এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

দেশের সার্বিক উন্নয়নসহ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে নারী শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক, শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্ববাজারে নিজেদের পণ্যের চাহিদা আরো বাড়ানো ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এ জন্য উৎপাদনশীলতা ও শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণসহ সুস্থ্য শিল্পসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা খুবই জরুরি। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের জন্য শোষণমুক্ত, মর্যাদাসম্পন্ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সব শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় শ্রম আইন সংশোধন, যুগোপযোগি শ্রমবিধিমালা প্রণয়ন, নানাবিধ নীতিমালাসহ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছে। এছাড়া, শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়ন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাসহ সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে 'রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছে। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শ্রমিক-মালিকের বিদ্যমান আন্তরিক সম্পর্ক অব্যাহত রেখে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্পোদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে কাম্য। এটা সর্বজনস্বীকৃত যে কেবলমাত্র সকল পক্ষের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ইতিবাচক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিক-মালিক সরকারের মধ্যে সেতু বন্ধন তৈরীর লক্ষ্যে ইত্যেমধ্যেই একটি "কর্মক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক" এলামনাই গঠন করা হয়েছে।

শিল্পায়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম, মানবিক মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক (সরকারি ও বেসরকারি খাতে যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরির শর্ত ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত) ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের চাকুরির শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত) খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও শ্রমিকদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

একই মন্ত্রণালয়ের অধীন 'কেন্দ্রীয় তহবিল' ও গঠন এবং কার্যকর করা হয়েছে। এই কেন্দ্রীয় তহবিল কেবলমাত্র তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই কেন্দ্রীয় তহবিলের কার্যপরিধির ব্যাপক বিস্তার ঘটবে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে শ্রমিকদের কল্যাণার্থে যে খাতসমূহে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয় তা হলো-

- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় কোনো শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম বা অসমর্থ হলে অথবা তার মৃত্যু ঘটলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক অথবা তার পরিবারকে এককালীন অনধিক ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা;
- দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা;
- শ্রমিকের মেধাবী সন্তানের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি মেডিকেল কলেজ এবং সরকারি কৃষি/ প্রকৌশল/প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ অনধিক ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা;
- কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোনো শ্রমিকের জরুরি চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য অনধিক ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা;
- মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য অনধিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা;
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণে অনধিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা।

এছাড়াও, অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমার প্রবর্তন এবং এ খাতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' থেকে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হয়। আবেদন ফর্ম শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে (www.mole.gov.bd / www.blwf.gov.bd) পাওয়া যায়। এছাড়া, বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর কার্যালয়সহ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তরে প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করেও আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করা যায়। যদিও ২০০৬ সালে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর আইন জারি হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যাদি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে এখন দেশজুড়ে এর কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়েছে। বিগত ছয় বছরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কোন ক্যাটাগরিতে মোট কতজন মৃত শ্রমিক, অসুস্থ্য/পঙ্গু/আহত শ্রমিক এবং শ্রমিকের মেধাবি সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে তার একটি ছকসহ দুটি গ্রাফ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

সাল	মৃত/টাকা	চিকিৎসা/টাকা	শিক্ষা/টাকা	মোট
২০১২-২০১৩	১১১ জন	৪৪ জন	০০০	১৫৫ জন
	১,১১,০০,০০০/-	৮,৮০,০০০/-	০০০	১,১৯,৮০,০০০/-
২০১৩-২০১৪	৩ জন	৬৭ জন	০০০	৭০ জন
	৬০,০০০/-	১২,১৮,৩৫৫/-	০০০	১২,৭৮,৩৫৫/-
২০১৪-২০১৫	১ জন	৮৬ জন	০০০	৮৭ জন
	১০,০০০/-	১৭,২০,০০০/-	০০০	১৭,৩০,০০০/-
২০১৫-২০১৬	২ জন	৩৫জন	০০০	৩৭ জন
	২,২৫,০০০/-	১২,৪০,০০০/-	০০০	১৪,৬৫,০০০/-
২০১৬-২০১৭	১৭১ জন	৪৬৯ জন	২৮১ জন	৯২১ জন
	২,৫১,৫৫,০০০/-	১,৯৬,২০,০০০/-	১,০৫,৯০,০০০/-	৫,৫৩,৬৫,০০০/-
২০১৭-২০১৮	৫৮ জন	১০৫১ জন	২৯৮ জন	১৪০৭ জন
	৫,৫১,৫০০০/-	৫,১৭,৯৫,০০০/-	১,৩৫,৮০,০০০/-	৭,০৮,৯০,০০০/-

(২০১২-১৩ অর্থ বছরে তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকান্ডে ১১১ জন শ্রমিক মৃত্যু বরণ করেন)

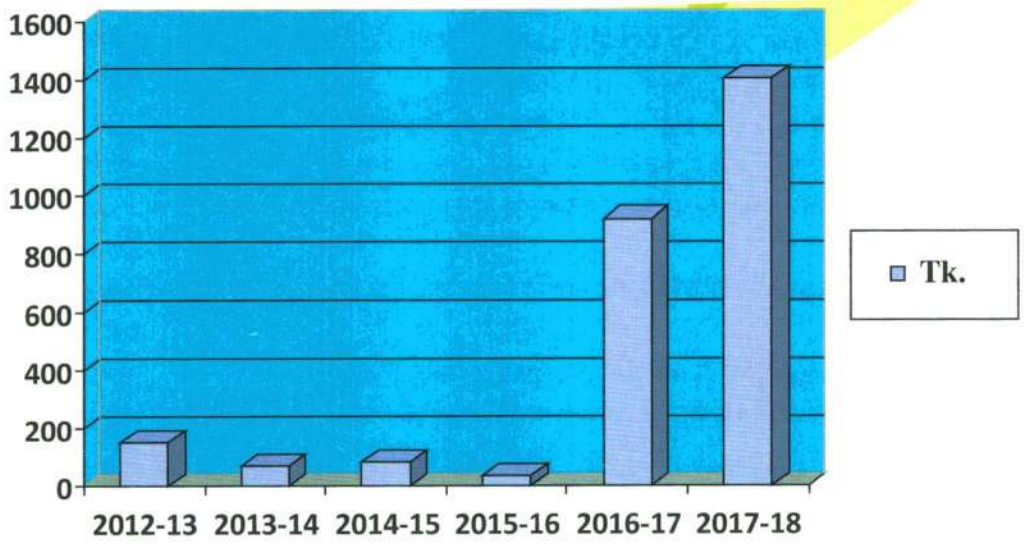

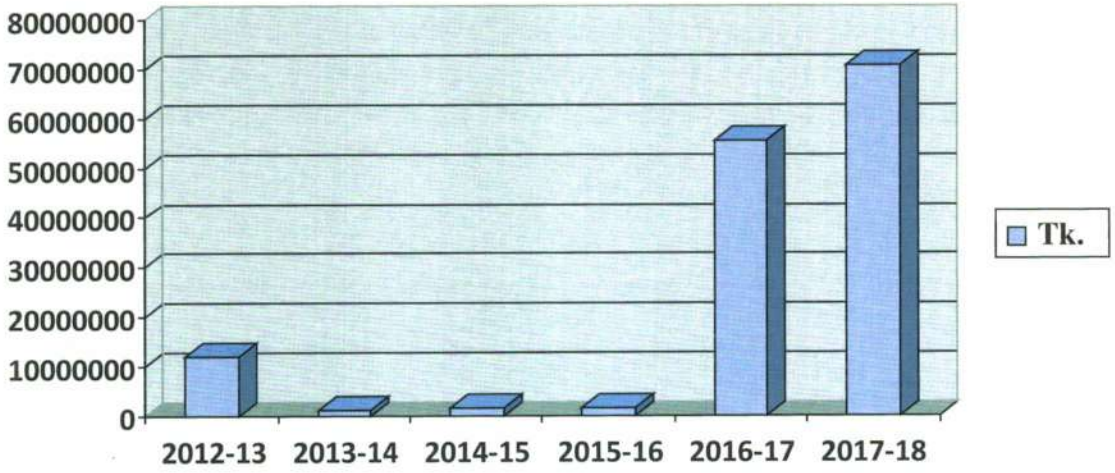

বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতির ভিত্তিতে জনসাধারণ এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ও জীবনমান উন্নয়নের স্বার্থে উৎপাদন বৃদ্ধি করাসহ সমাজ ও জাতির উন্নতি বিধানের জন্য সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন করা বাংলাদেশের শ্রমনীতির মূল উদ্দেশ্য। এ নীতি অনুসরণ করার ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, আশ্বাস ও সৌহার্দ্য স্থাপন এবং উভয় পক্ষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করার উন্নয়ন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রম আইনে সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে বিশেষ কিছু বিধান সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত-২০১৩) এমন এক সময়ে পাশ হয়েছে যখন সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিকদের বিরামহীন কর্মপ্রয়াসের ফলে আজ দেশের সকল শ্রেণির মানুষের জীবনমান আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে।

মানষের জীবনমান উন্নয়নের ফলে এবং সরকারি সঠিক পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন শিল্প। এখন পুরুষদের পাশাপাশি অসংখ্য নারী উদ্যোক্তা তৈরি হচ্ছেন। ব্যবসায়িকভাবেও তারা সফল হচ্ছেন। তাঁরা সবাই দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। সরকারের "বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন" এবং "কেন্দ্রীয় তহবিল"গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। আর এই ফাউন্ডেশন এবং কেন্দ্রীয় তহবিল এর মাধ্যমে নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সব শ্রমিকই উপকৃত হচ্ছেন।

উন্নয়নশীল বাংলাদেশ ও কৃষি নারীশ্রমিক

শিরীন আখতার এম.পি
সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অর্জন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। আর এই মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশকে প্রস্তুত করেছিলেন বাঙ্গালীর অবিস্মরণীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও ২ লক্ষ মা বোনের আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে পেয়েছি আমাদের এই বাংলাদেশ। এই রক্তে রঞ্জিত আমাদের সংবিধান, সংবিধানের ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি যা জনগণের মৌলিক অধিকারের চাবিকাঠি। '৭৫ এর পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির বাহিরে রাখা হয়েছিল। মুক্ত বাজার অর্থনীতির পথ ধরে বিশ্বায়নের কাছে মাথা নত করেছিল। বাংলাদেশের অর্থনীতি বিদেশীদের কাছে বন্ধক দিয়ে রাষ্ট্রকে দেউলিয়াতে পরিণত করেছিল। দেশ স্বাধীনের পর পরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বলেছিল বাংলাদেশ হবে তলাবিহীন ঝুড়ি। এক পর্যায়ে দেশকে দুর্নীতিতেও চ্যাম্পিয়ন হতে হয়। রাষ্ট্র বিরোধী যুদ্ধাপরাধী রাজাকার আলবদরদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয় বাংলাদেশ।

২০০৮ সালে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের শক্তি '১৪ দল' সরকার গঠন করে। রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধ এর জন্ম দেখতে পায় জনগণ। সংবিধানের চার মূলনীতিতে প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্র বৈষম্যহীন মুক্তির পথে হাঁটতে শুরু করে। এই সংবিধানের পথ ধরে ২ মেয়াদের নির্বাচিত সরকার বার বার তলাবিহীন ঝুড়ি নামক বাংলাদেশকে স্বগৌরবে দাঁড় করিয়ে দেয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশে। অবাক বিস্ময়ে পৃথিবী তাকিয়ে দেখে বাংলাদেশের এই উন্নয়ন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ভিত্তির ওপর দাঁড়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি। সামাজিক চাহিদা এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা নতুনভাবে নির্ণয় করা হয়।

গ্রামের অর্থনীতিকে বহুমুখী করা, জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধি করা, কৃষিখাতে ভর্তুকি দেয়া একটি বাড়ি একটি খামার আশ্রায়ণ প্রকল্প তৈরি করা, তৈরি পোশাক শিল্পের পাশাপাশি চামড়া ও পাট শিল্পের নব আবিষ্কার এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষার ব্যবস্থাপনা এখন জনগণের দোরগোড়ায়। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন, তথ্য ও প্রযুক্তিকে ইউনিয়ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি অগ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে।

১৭ই মার্চ ২০১৮ জাতির পিতার জন্মদিনে বাংলাদেশের জন্য এক অসাধারণ অর্জন সূচিত হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের মানুষকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। জনগণের সকল উদ্যোগের সমষ্টিগত প্রয়োগ আজকের এই স্বীকৃতি অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP) এই সংক্রান্ত ঘোষণার চিঠি বাংলাদেশকে হস্তান্তর করে। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে যোগ্যতা অর্জনের জন্য ৩টি শর্ত পূরণ করতে হয়। ১. মাথা পিছু আয় ২. মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ৩. অর্থনীতির ভঙ্গুরতা। এই তিনটির যে কোন ২টি অর্জন করলে শর্ত পূরণ করা যাবে। কিন্তু বাংলাদেশ ৩টি মানদণ্ডে উন্নত হয়। বিশ্বব্যাংকের গণনায় ১২৩০ মার্কিন ডলার মাথা পিছু আয় হতে হবে কিন্তু জাতিসংঘের হিসাবে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় ১২৭৪ মার্কিন ডলার। ইকোসকের হিসেবে মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকের উন্নয়নশীল দেশ হতে হলে লাগবে ৬৬ পয়েন্ট কিন্তু 'বাংলাদেশের রয়েছে ৭৩.২ পয়েন্ট, অর্থনীতি ঝুঁকির ক্ষেত্রে ৩২ এর নীচে থাকলে উন্নয়নশীল দেশ হতে পারে। বাংলাদেশের অর্জনের ক্ষেত্রে ২৫.২। সুতরাং বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসাবের অনেকটাই এগিয়ে আছে। এই অবস্থা লাগাতার ধরে রাখতে হবে ৩ বছর।

বাংলাদেশের এই অর্জন যখন প্রশংসিত হচ্ছে, এতবড় অর্জনের মধ্য দিয়ে কেমন আছে আমাদের কৃষিশ্রমিকেরা। বাংলাদেশের অর্থনীতি যে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ খাতের উপর দাঁড়িয়ে আছে তা হচ্ছে কৃষি, পোশাক শিল্প ও অভিবাসীদের আয়। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ এই দেশ। এইখানে কৃষকের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। যার অধিকাংশ প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিশ্রমিক যার ভিতরে ৭০ ভাগই নারী। কিন্তু এখনও পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজে নারীশ্রমের যথার্থ স্বীকৃতি মিলেনি। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে কৃষি কাজে নারীর শ্রম।

শ্রম আইনে এখনো কৃষি শ্রমিকের পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি মেলেনি। একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি শ্রমিক আইন প্রয়োগের জন্য লড়াই করছে নারী-পুরুষ সকলে। শ্রম আইনে দীর্ঘ ১০ বছর লড়াই সংগ্রামের পর কৃষি খাতে নিয়োজিত কৃষি শ্রমিকদের শুধুমাত্র 'শ্রমিক' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি শ্রমিক আইন পেতে হলে তাদের যেতে হবে অনেক দূর। কৃষি শ্রমিকেরা যেমন লড়াই করছে পূর্ণাঙ্গ কৃষি শ্রমিক আইনের জন্য তেমন কৃষি নারী শ্রমিকেরা আরো একটু বেশী লড়াই করছে মজুরি বৈষম্য কমানোর জন্য। তাই আমরা দেখতে পাই গ্রামাঞ্চলের অনেক ক্ষেত্রে যেমন-

মজুরি বৃদ্ধির লড়াইয়ে নারীরা এক ধাপ এগিয়ে

রাজশাহীর তানোর উপজেলার ধুরইল ইউনিয়নের মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি কাজ। এই ইউনিয়নের অধিকাংশ নারী ও পুরুষ কৃষি শ্রমিক। কৃষি শ্রমিকদের অভিযোগ তাদের মজুরি ধরা হয় মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী। সামান্য মজুরিতে খেয়ে না খেয়ে তাদের জীবন চলে।

তবে নারী কৃষি শ্রমিকদের অভিযোগ কিছুটা ভিন্ন তারা পুরুষের সমান শ্রম দিলেও মজুরি সমান পায়না। ধুরইল মাস্টার পাড়ায় 'কর্মজীবী নারী' সংগঠনের একটি নারী কৃষি শ্রমিক সেল রয়েছে। এই সেলের সদস্যরা বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সম কাজে সম মজুরি এবং নারী ও পুরুষের সমান অধিকার বিষয়ে এখন অনেক সচেতন।

এই সেলের সদস্য রুমি ও নিলুফকে জমির মালিক আলু তোলার জন্য বলে। তারা জানিয়ে দেয় যে তাদের মজুরি বাড়াতে হবে এবং পুরুষের সমান মজুরি দিতে হবে। মালিক কোন সমাধান না করে চলে যান। এই সুযোগে রুমি সেলের বাকি সদস্যদের সাথে মজুরি বৃদ্ধির বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে এ বিষয়ে সবাই একমত হন। পরে জমির মালিক আবার এলে তারা এক হয়ে মালিককে জানায়, আমাদের ১০০ টাকা ও দু'বেলা খাবার দিতে হবে। তা না হলে কাজ করবে না। মালিক বিরক্ত হয়ে বলেন, 'সংগঠন করে তোমরা এক জোট হয়েছো তোমাদের সাথে আর পারছি না'।

জমির মালিক অন্য এলাকার শ্রমিকদের সাথে কথা বললে, তারাও মজুরি বৃদ্ধির দাবি করে। আর কোন উপায় না পেয়ে মালিক তাদের দাবি মেনে নেয়। রুমি বলেন, গত বছর আমরা এই একই কাজে খাবার ছাড়াই পেয়েছি মাত্র ৩০ টাকা। আমরা মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে অন্যদেরও সচেতন করছি। গত বছরের তুলনায় এ বছর মজুরি বৃদ্ধি হয়েছে। যেখানে আগে মরিচ তোলায় নারী কৃষি শ্রমিকেরা কেজিতে ২ টাকা পেত একই ভাবে এক মণ ধান সিদ্ধ করলে আধা কেজি চাল দিত। এখন শুধু ধুরইলেই নয় অন্যান্য এলাকার সেল সদস্যরাও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সচেতন হয়েছে। অন্যরাও তাদের সাথে একমত হয়ে মজুরি বৃদ্ধির লড়াইয়ে শরীক হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, সংগঠন ও সংগঠিত হওয়ার কারণে আজ তারা তাদের নায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। তাই সংগঠনের বিকল্প নেই।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নকে এক অনন্য রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় নিয়ে গেছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে রূপকল্প বাস্তবায়নে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করেছে। সেই পরিকল্পনায় বাংলাদেশের নারীরা পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়ে উঠবে। সেই ক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিক নারীরাও পিছিয়ে থাকবে না।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

শ্রম ও শিল্পভাবনায় মে দিবস ও বিকেএমইএ'র কার্যক্রম

এ.কে.এম সেলিম ওসমান এমপি
ও সভাপতি
বিকেএমইএ ও পরিচালক, এফবিসিসিআই

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের অব্যবহিত পরে যাত্রা শুরু করা পোশাক শিল্প ১৯৮০ এর দশকে এসে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি প্রায় ৮০ শতাংশ অর্জিত হয় পোশাক শিল্প থেকে। বিকেএমইএর গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের সাম্প্রতিক জরিপেও এ দিকটি উঠে এসেছে। বর্তমানে জাতীয় রপ্তানিতে নীট খাতের অবদান প্রায় ৩৯ শতাংশ এবং পোশাক রপ্তানিতে ৪৮.৮ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে শুধুমাত্র নীট পণ্য রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১৩.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং জাতীয় রপ্তানিতে পোশাক খাতের মোট অংশগ্রহণ ২৮. মার্কিন ডলার। সমসাময়িক সময়ে পোশাক শিল্পখাতে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান প্রায় ৫০ লক্ষ যার সাথে প্রায় ৩৬ লক্ষ শ্রমিক নীট কারখানায় নিয়োজিত। মোট শ্রমিকের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী শ্রমিক যা নারীর কর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়ন উভয়কেই বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও এই পোশাক খাতের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে অনেক পশ্চাৎশিল্প, ব্যাংক, বীমাসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কোনো একটি দেশের উৎপাদন প্রণালীতেও তিনটি প্রধান অর্থনৈতিক খাত যুক্ত থাকে। কৃষি, শিক্ষা ও সেবা খাত। উন্নত প্রাযুক্তিক সংস্থাপন একদিকে যেমন উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে আপেক্ষিকভাবে বহুগুণ বাড়িয়েছে তেমনি পরিপূরকভাবে উৎপাদন সম্পর্ককেও আরো বিকশিত করেছে । ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা, ক্রয়ক্ষমতা, কর্মসংস্থান এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো উন্নয়ন সূচকগুলোও বেড়েছে।

পোশাক খাত কৃষির আধুনিকীকরণ যান্ত্রিকীকরণের সাথে সাথে উদ্বৃত্ত ও প্রান্তিক শ্রম শক্তিকে অর্থনীতির মূল ধারায় সংযোজনের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পাশাপাশি শ্রমের পর্যায়গত বিভাজন প্রক্রিয়ায় সেবা খাতকেও সমৃদ্ধ করেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পোশাক শিল্পখাতের বৈচিত্র্যময়তা ও সুশৃঙ্খলতা আনয়ন এবং বাজার সম্প্রসারণকে ত্বরান্বিত করতে নীট শিল্পের জন্য একক সংগঠন হিসেবে বিকেএমইএ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের একান্ত সহযোগিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বিকেএমইএ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশের অর্থনীতির নীতি-নির্ধারণী ব্যবসায়ীক মহলের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বিকেএমইএ সভাপতি এ.কে.এম সেলিম ওসমান

নীট পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ এবং পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের পক্ষ থেকে দেশের অর্থনীতির বিকাশে নীট খাতের অবদানকে সমুন্নত রাখতে বিকেএমইএ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কার্যকর ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশের বাণিজ্য নীতিমালা প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে মতামত প্রেরণ, রপ্তানি-আমদানি নীতিমালার বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তন /সংশোধনে প্রস্তাবনা প্রেরণসহ বাণিজ্য সহজীকরণ কার্যক্রমে সরকারি সকল উদ্যোগের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে বিকেএমইএ যেমন উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে, তেমনি উৎপদিকা শক্তির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন সম্পর্কের আধুনিকায়নেও সচেতন উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। শ্রমিকদের দক্ষতার মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা, বেকার যুব সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবশক্তিতে পরিণত করে নীট খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সঠিক মজুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, অগ্নি সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতার মতো প্রতিটি বিষয়ে অগ্রসর ভূমিকা রাখছে।

বিকেএমইএ'র অবিরত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ নীট পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে জাপানসহ পৃথিবীর ৪৯টি দেশে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা (DFQF) প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ শিল্পের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি এবং চীনের শ্রমশক্তি নির্ভর শিল্প ব্যবস্থাপনা থেকে সরে এসে মূলধন নিবিড় শিল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনায় বিশ্ব পোশাক বাজারে বাংলাদেশে দ্রুত বাজার বিস্তৃতির সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্ভাবনার বাস্তবায়নে বৈশ্বিক পোশাক শিল্প বাজারে শিল্প মালিকদের ব্যবস্থাপনা কৌশলের আধুনিকায়নের পাশাপাশি শ্রমিকদের শ্রম দক্ষতা ও প্রচেষ্টা গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। পোশাক শিল্পের আর্ন্তজাতিক বাজারে বাংলাদেশের আজকের এই প্রতিযোগীতামূলক অবস্থান, সক্ষমতা, সম্ভাবনা ও সামগ্রিকভাবে এই শিল্পের বিকাশ মূলতঃ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের পারস্পারিক নির্ভরশীল গঠনমূলক শ্রম সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে শ্রমিকরাই মূল অনুঘটক হিসেবে প্রতীয়মান। মহান মে দিবসে শ্রমিকদের এই অবদানের প্রতি বিকেএমইএ অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে শুধুমাত্র কোনো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠির ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিকেই নির্দেশ করেনা বরং দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের উন্নতি, সামাজিক উন্নয়ন সর্বোপরিজীবন যাপন প্রণালীর মানোন্নয়নকে উপস্থাপন করে। আর এক্ষেত্রে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে উৎপাদনমূখী খাত। অর্থনীতিতে উৎপাদনমূখী খাত হিসেবে শিল্পখাত একদিকে যেমন সেবা খাতকে দ্রুত বিকশিত করে, তেমনি কৃষি খাতের আধুনিকীকরণ, যান্ত্রিকীকরণকেও প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক পোশাক রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগি সক্ষমতা অর্জনে সমর্থ হওয়ার পাশাপাশি যে বিপুল শ্রমশক্তি এই খাতের সাথে সম্পৃক্ত তাদের জীবনমানের উন্নয়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে রোল মডেল হিসেবে উপস্থাপিত। প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিকের জীবন যাপন প্রণালীতে পোশাক শিল্প খাত সরাসরি প্রভাব রাখার পাশাপাশি সহস্পন্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন পথের যাত্রায় প্রধান অংশীদারিত্বমূলক ভূমিকা রাখছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ থেকে আজকের নিম্নমধ্য আয়ের বাংলাদেশ গঠনে প্রধান শিল্পখাত হিসেবে পোশাক শিল্প খাতের যে ভূমিকা এর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি শ্রমিক। কারণ আপেক্ষিক বা তুলনামূলক সুবিধানীতির আওতায় মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও তার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরিতে প্রধান নিয়ামক ঐ পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত শ্রমশক্তি। শিল্পোৎপাদন প্রবাহে আধুনিক প্রযুক্তির সনিবেশন, কাঁচামাল ও শ্রমের সহজলভ্যতা শিল্পকে বিকশিত করে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা আবশ্যক যে, যুগোপযোগী প্রযুক্তির সন্নিবেশের পাশাপাশি শ্রমিকের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শ্রমের আধুনিকায়ন তথা দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব না হলে উৎপাদন সম্পর্কে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা সামগ্রিক উৎপাদন পরিকাঠামোকে প্রভাবিত করে। শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদনের উপকরণের বিকাশের পথে উৎপাদন সম্পর্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তরণের তারতম্য থেকেই মে দিবসের উৎপত্তি।

শিল্পের সুষম বিকাশের জন্য সুদূর প্রসারি সুশৃংখল পরিকল্পনা ও কৌশলকে বিস্তৃত পরিসরে বিন্যস্ত করার সম্ভবনা বিদ্যামান থাকার পরও আপেক্ষিক ভাবে আমাদের স্বল্পকালীন ভারসাম্য উৎপাদন স্তরে পৌছানোর উদ্দেশ্যমূখীন কর্মপদ্ধতি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার বাস্তবায়ণে ব্যতয় ঘটিয়েছে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে শক্তিশালি পশ্চাৎপদ শিল্পের দ্রুত বিকাশের ফলে নীট শিল্পের সামগ্রীক ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ঘাটতিগুলো সাধারণত অদৃশ্যমান থেকে গেছে। যদিও শিল্পোৎপাদনে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রায়োগিক সন্নিবেশনের সাথে সাথে যন্ত্রকৌশল এবং তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনার কাঠামোতেও বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে শিল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে বিষয়বস্তুগুলোর ঘাটতি পূর্বে দৃশ্যমান হয়নি অথবা আধুনিকায়ন করার আশু প্রয়োজন অনুভুত হচ্ছে তা নিয়ে বড় পরিসরে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বায়নের সাথে সাথে আধুনিক শিল্পব্যবস্থাপনার প্রায়োগিকতা এবং এ সম্পর্কিত সকল ধারণাগুলো কারখানা পর্যায়ে তথা শিল্পোৎপাদন পরিচালন পদ্ধতিতে প্রয়োগের প্রতি আমরা আরো বেশি মনযোগী হতে পেরেছি। ফলে নীট শিল্প বিকাশে এবং এর আধুনিকায়নে পরিচালন পদ্ধতিতে উন্নততর প্রযুক্তি, উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন কৌশল, শ্রমশক্তির দক্ষতার বিকাশে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মতো গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সক্ষমতা আমাদের উৎপাদকদের তৈরি হয়েছে।

বিকেএমইএ বাংলাদেশের নীট শিল্পের যুগোপযোগী আধুনিকায়নের পথে কারখানাগুলোর শিল্প পরিকাঠামোতে আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেকানিজমের প্রয়োগ ঘটাতে কাজ করছে। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে পদ্ধতিগত কৌশল প্রয়োগের সাথে সাথে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিজমের পরিপূরক শ্রমদক্ষতার সন্নিবেশ ঘটানো সম্ভব হলে উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের ধনাত্বক সংমিশ্রণ অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। কিন্ত উৎপাদিকা শক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে উৎপাদন সম্পর্কে ও ব্যবস্থাপনার বিকাশ সম্ভব না হলে কারখানার শিল্পোৎপাদন কার্যক্রমে অতিরিক্ত অপচয় সৃষ্টি হয়। যা উৎপাদন খরচ, সর্বোপরি মুনাফাসহ সামগ্রিক শিল্প কার্যক্রম এক কথায় পুরো অর্থনৈতিক উৎপাদন পরিকাঠামোকে প্রভাবিত করে। তাই বিকেএমইএ সদস্যভুক্ত শিল্প কারখানাগুলোতে সংগঠিত উপায়ে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাথে সাথে সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন প্রনালীতে উৎপাদন সম্পর্কের ধারাবাহিক মানোন্নয়নে মূল ভূমিকা পালন করছে। নীট খাতে প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে শিল্পোৎপাদন পর্যায়ে ফেব্রিড অপটিমাইজেশন, লীন ম্যানুফেকচারিং সিস্টেম চালুকরণ, প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রভমেন্ট প্রোগ্রাম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, স্যোশাল কমপ্লায়েন্স, ফায়ার সেফটিনেস প্রোগ্রাম, শ্রমনিরাপত্তা ও জনসম্পদ উন্নয়নে কারিগরী বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পরিবেশ বান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা, উৎপাদনে ব্যবহৃত রাসায়নিক উৎপাদনের ক্ষতিকর প্রভাবের মাত্রা হ্রাসকরণসহ সামাজিকদায়বদ্ধতার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা, ইত্যাদি বিষয়গুলো আধুনিক বৈশ্বিক শিল্প ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসা পরিচালনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশেও নীট শিল্পকারখানাগুলোতে শ্রম ও শ্রমিক দায়বদ্ধতা, পরিবেশ প্রতিবেশ সচেতনতা, এবং আধুনিক শিল্পব্যবস্থাপনাকে অনুসরণ করার জোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গ্রীন নীট শিল্পকারখানা, এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনায় বিকেএমইএ'র সদস্য কারখানাগুলো বিশেষভাবে মনযোগী। বর্তমানে বিশ্বের প্রথম ১০টি গ্রীন নীট ফ্যাক্টরীর মধ্যে বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত গ্রীন নীট ফ্যাক্টরী ৩টি এবং ২০২১ সালের মধ্যে সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোর অর্ধেক প্রতিষ্ঠানকে গ্রীন ফ্যাক্টরীতে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজ করছি। এছাড়াও ফ্যাক্টরী পর্যায়ে সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স মনিটরিং, ফায়ার সেফটি ট্রেনিং প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা প্রশিক্ষণ, শ্রমিকের জন্য মৃত্যুবীমা প্রচলন, কারখানা পর্যায়ে ইটিপি স্থাপনসহ বিভিন্ন সিএসআর কার্যক্রম বিকেএমই এ এর পক্ষ থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে। একই সাথে মালিক - শ্রমিক সম্পর্কোন্নয়নের জন্য কমপ্ল্যায়েন্স গাইড লাইন, কম বিনিয়োগ এবং সময়ে অধিক উৎপাদনের জন্য উৎপাদনের কৌশল শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ, বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নীট শিল্পের সম্ভাবনা এবং বাজার বিস্তৃতিকরণে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার, হেলফ কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেএমইএ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করছে।

বাণিজ্য সহজীকরণ বিষয়ক টাস্কফোর্সের বৈঠকে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে বিকেএমইএ'র সভাপতি এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি

যে শ্রমিকের শ্রম ও মেধার ওপর দাঁড়িয়ে নীট শিল্পখাত বর্তমানে বাংলাদেশে একক বৃহৎত্তম রপ্তানীখাত এবং বিশ্বে ২য় অবস্থান অর্জন করতে পেরেছে সেই শ্রম ও শ্রমিকের প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণ বিবেচনায় ২০০৫ সাল থেকে এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জীবন বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রতিটি শ্রমিকের জন্য গ্রুপবীমা চালুকরণের উদ্যোগ বিকেএমইএর একক অর্জন। পরবর্তীতে গ্রুপবীমা দাবীর টাকা সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৩ সালে দ্বিগুন (দুই লক্ষ) টাকা করা হয়। বাংলাদেশের শিল্প ও শ্রমবান্ধব সরকারের সহযোগিতা ছাড়া একক ভাবে এ উদ্দ্যোগের বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো না। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে গ্রুপবীমার ১৫৫টি অভিযোগ দ্রুত পর্যায়ে নিষ্পত্তিকরণের মাধ্যমে শ্রমিকদের বীমা দাবীর টাকা পরিশোধ করে বিকেএমইএ বাংলাদেশের ইতিহাসে নতুন এক মাইল ফলক রচনা করছে। এই জন্য শ্রম মন্ত্রনালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিকেএমইএ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে ।

উৎপাদন প্রণালীর বিভিন্ন পর্যায়ে মনুষ্য শ্রমের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযুক্ততা মানব সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস তৈরি করেছে। উৎপাদন কার্যক্রমের প্রধান উপাদান হিসেবে উৎপাদিকা শক্তির পর্যায়গত আধুনিকায়ন এবং উৎপাদন কার্যক্রমে অবস্থিত উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। আরও সরল কথায় বলা যায়, মানব সমাজও সভ্যতার আধুনিকায়নের ইতিহাস মূলতঃ মনুষ্য শ্রমের গুণগত ও পরিমাণগত বিবর্তণের ইতিহাস। প্রকৃতি প্রদত্ত যে কোন বস্তুকে মানুষ যখন তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য শ্রম নিযুক্ত করে তখনই একে উৎপাদন বলে। অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদানের সাথে শ্রম বা শক্তি যুক্ত হলেই কেবল বস্তুকে দ্রব্য বলা যায় যার উপযোগ বা ব্যবহারিক মূল্য বিদ্যমান। উৎপাদনের উপাদানের সাথে শ্রম শক্তির সমন্বয়কে অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদিকা শক্তি বলে। আর উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক /সংযুক্ততা তৈরি হয় তাকে উৎপাদন সম্পর্ক বলে। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান (শ্রম ব্যতিত) ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন যেমন একদিকে উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করেছে তেমনি উৎপাদন সম্পর্কগুলো প্রভাবিত করেছে।পণ্য উৎপাদন প্রণালীতে যন্ত্রপাতির আধুনিকায়ণ উৎপাদন কার্যক্রমকে বহুগুন বৃদ্ধি করেছে। ফলে শ্রমের ধরণগত পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রম সম্পর্ক বা উৎপাদন সম্পর্কও আর বিকশিত হয়। শ্রমিকের সাথে মালিকের বিভিন্ন স্তরের শ্রমিকের নিজস্ব সম্পর্ক, শ্রমিকের সাথে মালিকের সম্পর্ক ইত্যাদি।

আধুনিক শিল্পায়নের ইতিহাসে উৎপাদন সম্পর্ক বিকাশের পর্যায়গত ধারায় ইতিহাসের এরকমই একটি দিন ১লা'মে বিশ্ব শ্রমিক দিবস। ১৮৮৬ সালের ১লা মে ৮ ঘন্টা কাজের দাবীতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর সেই সময়ের পুলিশ বাহিনীর গুলিবর্ষণ এবং পরবর্তীতে আদালতের বিচারে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের অনেকের ফাঁসির ঘটনা বিশ্বের সর্বস্তরের শ্রমিকদের মাঝে অধিকার আদায়ের যে চেতনা উপস্থাপন করেছিল সেই ধারাবাহিকতায় শ্রমিকরা মে দিবসের স্মরণ রেখেছে বিশ্ব শ্রমিক দিবস হিসেবে। ১৩২ বছর পরেও শ্রমিকদের মাঝে শ্রমদিবসের সেই আকাঙ্খা বিদ্যমান।

বৃহদায়তন, বিশেষত শ্রম নিবিড় শিল্পসমূহের শ্রম ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা শিল্প বিকশিতকরনের প্রাথমিক বা নিয়ামক শক্তি। তাই এ সকল শিল্পের শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী তথা শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সমঝোতা তৈরি করা এবং শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে শ্রম আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন অতীব জরুরী বিষয়। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং শ্রমিক শ্রেনীর অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের স্বারক হিসেবে মে দিবস পালনের মাধ্যমে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের শ্রমিক তাদের জীবনমানের আধুনিকায়নের দাবীতে সোচার। ১৮৯৩ সালের মে দিবসে তারিখে অনুষ্ঠিত শ্রমিকদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে যে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল তাতে উল্লেখ করা হয়; '৮ ঘণ্টা শ্রম ঘণ্টা ও ন্যায্য মজুরীর দাবীতে ১৮৮৬ সালের ১লা মের শ্রমিক সমাবেশ শ্রমিক শ্রেনীর সুদৃঢ় সংকল্পের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দাবীতে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের ও পর্যায়ের শ্রমিক শ্রেনী প্রতিবছর এ দিবসটিকে স্বরণ করে নিজস্ব আঙ্গিকে।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে মে'দিবস সরকারিভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আইএলও কোর কোনভেনশন ২৯, ৮৭, ৯৮, ১০০, ১০৫, ১১১ ও ১৮২ ধারা বাংলাদেশে অনুসমর্থিত হয়েছে। নীট শিল্পের শ্রম ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বজায়ে রাখতে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ ও শ্রমিকের জীবন মান উন্নতকরণে আবশ্যকীয় প্রতিটি বিষয়গুলোর বাস্তবায়নে বিকেএমইএর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিকেএমইএ, বাংলাদেশে প্রথম এবং একমাত্র সংগঠন হিসেবে এই শিল্পে কর্মরত মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্প ব্যবস্থাপনা ও শ্রম সংক্রান্ত সমাধানে "দ্বন্দ্ব নিরসন ও শৃঙ্খলা নীতি" শীর্ষক কর্মশালার পরিচালনা করেছে। প্রায় সবগুলো শ্রমিক সংগঠন, নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে যে কোন ধরনের শ্রম বিশৃঙ্খলা নিরসনে মালিক শ্রমিক একত্রিত হবে কাজ করার অঙ্গীকার ও মতৈক্যে পৌছার মতো বিরল ঘটনা শুধুমাত্র নীট শিল্পেই সম্ভব হয়েছে। ফলে এই শিল্পে শ্রমিক অসন্তোষ শুণ্যের কোটায় পৌচেছে। যা বাংলাদেশের যেকোন অঞ্চলের যে কোন শ্রমিকদের জন্য একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। এটা সম্ভব হয়েছে মালিক-শ্রমিক ও বিকেএমইএ'র সুষম সহযোগিতামূলক সম্পর্কে মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিনির্মানকে প্রধান দৃষ্টি ভঙ্গি হিসেবে উপস্থাপনের ফলেই।

বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও শ্রম সমস্যা নিরসনকল্পে আলোচনায় শ্রম প্রতিমন্ত্রী ও বিকেএমইএ সভাপতি এ. কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি

উৎপাদন কার্যে শ্রমিকের শ্রম বিতরণের প্রক্রিয়ার গুনগত বিকাশের পথে শরীর নির্ভরতা বহুগুণ কমে গেছে। উৎপাদন পর্যায়ে শরীর নির্ভরতার আরো আধুনিকতম সংস্করণ বুদ্ধিবৃত্তিক নিয়ন্ত্রন সংযুক্ত হয়েছে। প্রথম শিল্প বিপ্লব থেকে ২য় শিল্প বিপ্লব (১৭৮৪-১৮৬৯) উৎপাদিকা শক্তির সর্বোচ্চ বিকাশের প্রায় শতবর্ষে উৎপাদন সম্পর্কের পরিপূরক বিকাশের কৌশলগত অন্তরায় ১৮৮৬ সালের শ্রমিক বিদ্রোহ, যা মে দিবস হিসেবে শ্রমিকরা আজও স্মরণ করে। দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব থেকে তৃতীয় শিল্প বিপ্লব (১৮৭০-১৯৬৮) শিল্পায়নের সর্বোচ্চ বিকাশের প্রথম শতবর্ষে উৎপদিকা শক্তির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন সম্পর্কের ধনাত্নক বিকাশ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। আজকের উন্নত বিশ্ব বলতে আমরা যেসব রাষ্ট্রকে অনুমান করি তারা সবাই উৎপদিকা শক্তির বিকাশের সাথে সাথে উৎপাদন সম্পর্কের বিষয়টিকে বহুগুণ প্রাধান্য দিয়েছে। ১৯৬৯ সালের পর থেকে প্রাযুক্তিক আধুনিকায়ন মানুষের জীবনযাত্রাকে অনেক সহজ করে তুলেছে যেমন সত্যি তেমনি এই প্রাযুক্তিক নির্ভরতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। উৎপাদন-বন্টন-বিনিময় ইত্যাদি দৈনন্দিন সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমে প্রযুক্তির সর্বাধুনিক ব্যবহার মানুষের শারিরীক পরিশ্রমকে লাঘব করেছে। জীবন প্রণালীকে প্রভাবিত করেছে, শ্রম বিতরণের প্রক্রিয়াকে পরিবর্তীত হয়েছে। শ্রম বিভাজনের আধুনিকতম সংস্করণের যুক্ত হয়েছে বুদ্ধিভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কার্যপ্রণালী যাকে বলা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও)। বিশ্বায়নের এই যুগে অও-এর ব্যবহার শিল্প ব্যবস্থাপনার অন্যতম অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পোৎপাদন পর্যায়ে অও-এর ব্যবহার উৎপাদন ক্ষমতাকে যে বহুগুণ প্রভাবিত করেছে তেমনি প্রাযুক্তিক উৎকর্ষে ব্যবস্থাপনা মাধ্যমের আধুনিকায়ন, পরিবেশ ভাবাপন্ন উৎপাদন কৌশল ইত্যাদি আমাদের শিল্পের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

বাংলাদেশের নীট শিল্পে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নীট পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানসহ সামগ্রিক কাঠামোতে ভূমিকা রাখছে। অর্থনৈতিক বিকাশের এই ধারায় মালিক-সরকার শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে পিছুপা হয়নি। নীট শিল্পের বিকাশের এই পর্যায়ে সরকার ঘোষিত মজুরি বিধিমালার আওতায় ২০০৫, ২০১০ ও ২০১৩ সালে মোট তিনবার শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিকেএমইএ অর্থনৈতিক বিকশের ইতিহাসে শ্রমশক্তির গুরুত্বের এই ধারাবাহিক পর্যালোচনা থেকে নীট শিল্পের আধুনিক উৎপাদন উপকরণ (যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ইত্যাদি) সংযোজনে নীট উৎপাদকদের সহযোগিতার পাশাপাশি শ্রমিকের মানোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে।

শ্রমিক কল্যণের জন্য বিকেএমইএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

ক)	শ্রম আইন পরিপূর্ণ প্রতিপালনে গুরুত্ব আরোপ এবং দক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
খ)	মে দিবস উদযাপনে শ্রম মন্ত্রণালয়কে প্রতি বছর আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।
গ)	নীট শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা করা এবং বাংলাদেশের একমাত্র সংগঠন হিসেবে নীট সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যুজনিত বীমা দাবীর পরিমান ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকায় উন্নীতকরণ।
ঘ)	নীট শিল্পে কর্মরত মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের শিল্প ব্যবস্থাপনা ও শ্রম অসন্তোষ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "দ্বন্দ্ব নিরসন ও শৃঙ্খলা নীতি" শীর্ষক ওয়ার্কশপের আয়োজন।
ঙ)	নীট শিল্পখাতে মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তা ঘাটতি মেটাতে "ইন্সটিটিউট অব এ্যাপারেল রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি (আই.এ.আর.টি)" চালু।
চ)	রানা প্লাজা ধ্বসের ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য বিকেএমইএ'র পক্ষ থেকে ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা অনুদান প্রদান।
ছ)	বিকেএমইএ বাংলাদেশ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় ''কর্মজীবি ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল - ১" এর আওতায় ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নীট শিল্পে কর্মরত বিভিন্ন মহিলা শ্রমিককে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদান।
জ)	নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা স্বাস্থ্য বিসিকে "সানি সাইড ডে-কেয়ার" সেন্টারের মাধ্যমে বিকেএমইএ'র প্রতিদিন কর্মজীবি মায়েদের কমপক্ষে ৬০ জন শিশুকে বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া ও পড়ালেখার (কর্মকালীন সময়ে) ব্যবস্থা করা।
ঝ)	নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা স্বাস্থ্য বিসিকে "বিকেএমইএ হেলথ সেন্টারের" মাধ্যমে প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ থেকে ৫০ জন শ্রমিককে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান।
ঞ)	২০১৩ সালে মোহাম্মদপুরের স্মার্ট ফ্যাশনের অগ্নি দূর্ঘটনায় নিহত ৮ শ্রমিকের প্রতিটি পরিবারকে ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা করে সর্বমোট ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকা বিকেএমইএ তহবিল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ট)	শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত যে কোন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য "লেবার এ্যাফেয়ার্স সেল" গঠন এবং এর আওতায় বিদ্যমান সমস্যাগুলোকে শ্রম আইনানুসারে সমাধান এবং প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান; এবং
ঠ)	বিকেএমইএ বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং ব্র্যাকের সহায়তায় "টি.বি প্রজেক্ট" এর মাধ্যমে কর্মরত নীট শ্রমিকদের যক্ষ্মা প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরীর কার্যক্রম পরিচালনা।

শিল্প খাতের উন্নয়নে বিকেএমইএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

ক)	কারখানায় অপচয় (ওয়েষ্টেজ) কমানোর জন্য ফেব্রিক্স অপটিমাইজেশন, লীন ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম, প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম, ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি কারিগরী কৌশলগুলো কারখানায় বাস্তবায়ন। এই লক্ষ্যে বিকেএমইএ প্রোডাক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট সেলের মাধ্যমে "প্রোডাক্টিভিটি ক্যাম্পেইন" চালু করেছে।
খ)	পরিবেশ বান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা, পণ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদানের ক্ষতিকর প্রভাবের মাত্রা হ্রাস করা, সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর ডিপ্লোমা কোর্স চালু।
গ)	কারখানাতে ইটিপি স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ প্রদান।
ঘ)	বিশ্ব অর্থনৈতিক চিত্র এবং আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদা তুলে ধরার জন্য গবেষনা কার্যক্রম।
ঙ)	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কাষ্টমস, বন্দর, বন্ড কমিশনারেট, বিকেএমইএ ও বিজিএমইএ'র সাথে ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে ইউডি অটোমেশন আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা। বিকেএমইএ'র সকল সদস্যবৃন্দ এখন তাই অনলাইনে ইউডি সাবমিশন করে।
চ)	বিশ্ব বাজার ব্যবস্থার পরিবর্তনশীল সময়ে বাংলাদেশের নীট শিল্পকে আন্তর্জাতিক বলয়ে টিকিয়ে রাখার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারের পাশাপাশি নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান এবং সেগুলোতে বাণিজ্য সম্ভাবনা সম্প্রসারণ এবং নীট শিল্পকে ইউরোপের মন্দার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এবং নীট পণ্যের বাজার বহুমূখীকরণের লক্ষ্যে "নতুন বাজার সম্প্রসারণ" কর্মসূচী গ্রহণ;
ছ)	নীট এক্সপোজিশন নামক বাৎসরিক নীট মেলাটি প্রথাগতভাবে দেশের মধ্যে আয়োজনের ধারনাটিকে বাদ দিয়ে বাস্তব এবং প্রায়োগিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে ২০১২ সাল থেকে দেশের বাইরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। উক্ত সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হলেও বিগত আয়োজনগুলোর কারনে জাপান ও রাশিয়ার বাজারে নীট পণ্য রপ্তানী পরিসংখ্যান উর্ধ্বমুখী হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে উক্ত পরিসংখ্যান যে আরো শক্তিশালী হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই ভবিষ্যতেও নীট এক্সপোজিশন দেশের বাইরে আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে ৪-৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে জাপানের টোকিওতে ৩৩টি স্টল নিয়ে নীটওয়্যার মেলার আয়োজন করে।
জ)	নীটওয়্যার আমদানীকারক দেশগুলোর পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, জাপান, ভারত, চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, পোল্যান্ড, মেক্সিকা, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, প্যারাগুয়ে, ভেনিজুয়েলা, উরুগুয়ে, ইকুয়েডর, পর্তুগাল, হন্ডুরাস ইত্যাদি দেশসমূহ হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের নীট পণ্য রপ্তানীর নতুন প্রানকেন্দ্র। এইসব দেশগুলোতে নীট পন্য রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান যে সব জটিলতা রয়েছে--- যেমন জিএসপি সুবিধা না থাকা, উচ্চ শুল্ক কাঠামো, ব্যাংকিং ও কাস্টমস্ সংক্রান্ত জটিলতা, পরিবহন সমস্যা--- তা দূর করার জন্য সেই সমস্ত দেশগুলোতে বিকেএমইএ'র বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ।
ঝ)	কারখানার অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং টীম গঠন এবং তাদের মাধ্যমে সদস্য কারখানাগুলোর কাঠামোগত উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।
ঞ)	বায়ারদের কমপ্লায়েন্স চাহিদা পূরণের জন্য আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিধিবিধান মেনে বিকেএমইএ কমপ্লায়েন্স সেলের মাধ্যমে কারখানাগুলোতে কমপ্লায়েন্স মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করা।
ট)	কারখানাতে অগ্নি নিরাপত্তা ও প্রতিরোধে বিকেএমইএ ফায়ার ফাইটিং সেলের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত ট্রেনিং প্রদান।
ঠ)	নারায়ণগঞ্জের চাঁনমারীতে ইন্সটিটিউট অব এ্যাপারেল রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি (আই.এ.আর.টি) নামক ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান তৈরী এবং সেখান থেকে নীট শিল্পখাতের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ পর্যায়, মধ্যম পর্যায় এবং জুনিয়র পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন টেকনিক্যাল এবং শিল্প উপযোগী কোর্সের উপর ট্রেনিং প্রদান।

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে বাণিজ্য সম্প্রসারণে জাহাজীকরণ প্রক্রিয়াকে সহজীকরণ করার বিষয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান ও বিকেএমইএ সভাপতি এ. কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি

বিকেএমইএ'র কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

- অবিকশিত নতুন বাজারে নীটওয়্যার রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা।
- গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে বিস্তৃত পরিসরে নীট শিল্পের বাজার সৃষ্টি।
- প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এই উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজন উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ কারিগরী জ্ঞান এবং আধুনিক শিল্প ব্যবস্থাপনার চর্চা। বিকেএমইএ সরকার ও দাতা সংস্থার সহযোগীতায় পরিবর্তীত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সদস্য কারখানাসমূহের উন্নত উৎপাদনের জন্য কাজ করে চলেছে।
- অধিক উৎপাদনশীলতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা, যা মোট উৎপাদন ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে। এক্ষেত্রে লীন ম্যানুফেকচারিং পদ্ধতি অন্যতম। বিকেএমইএ এই পদ্ধতিতে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যহত রেখেছে।
- নতুন বাজার তৈরি এবং বিদ্যমান বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রাহক ও আন্তর্জাতিক ক্রেতা এর সন্তুষ্টি অর্জনে পদক্ষেপ।
- নীট শিল্পের গতিশীলতাবৃদ্ধিতে উদ্দ্যোক্তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, যা তাদেরকে দক্ষ উদ্দ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
- ভিশন ২০২১ এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ নীট কারখানাকে সবুজ শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তর করে সমগ্র খাতকে পরিবেশবান্ধব খাত হিসেবে উন্নীত করা।
- নীট শিল্পের সামগ্রীক উন্নয়নে পণ্য ও বাজার গবেষণায় ব্যাপক গুরুত্বারোপ করা, যা স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী নীতি নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।
- প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে নীট পণ্যের নিরাপদ ও অগ্রসরমান বাজার নিশ্চিত করতে সরকারের সহযোগিতায় এফটিএ, পিটিএ ও আরটিএ সমূহ বাস্তবায়ন করতে তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা।
- বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বশীল নীট শিল্পের জন্য একটি নিরাপদ প্যাভিলিয়ন তৈরি করা।
- একটি যুগোপযোগী সেন্টার অফ এক্সিলন্স প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ গ্রহণ, যা নীট শিল্পের পণ্যের বহুমূখীকরণ ও বহুমূখী বাজারনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
- দেশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমহের সাথে নীট শিল্প সংক্রান্ত জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের জন্য মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা।
- নীট সেক্টরের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন ও যোগদান করে এখাতের ভূমিকা সবার সামনে তুলে ধরা।
- বর্তমানে এ খাতে ৩.৫ মিলিয়ন শ্রম শক্তি সরাসরি জড়িত, যেখানে ৮০% মহিলা শ্রমশক্তি।
- আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ২০২১সালের মধ্যে এই খাতে আরো ১ মিলিয়ন নতুন শ্রমশক্তি যুক্ত করা যার ৭০% হবে নারী।

নীট শিল্পের বাজারকে বিস্তৃত করার সার্বক্ষনিক কার্যক্রমের ফলাফল হিসেবে বিকেএমইএ'র অভিনব এক সৃষ্টি 'গ্লোবাল বায়ার্স ইনফরমেশন ডাইরেক্টরি' প্রকাশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিকেএমইএ পরিচালক বৃন্দের নিবিড় অংশগ্রহণ এবং গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল 'গ্লোবাল বায়ার্স ইনফরমেশন ডাইরেক্টরি' প্রকাশ। ২০১৪ সালে প্রকাশিত ২১৪৮ পৃষ্ঠায় সংকলিত এই বইটিতে পৃথিবীর ১৬০ টি দেশের ২৫,০০০ এর অধিক আন্তর্জাতিক ক্রেতার ঠিকানাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পণ্য রপ্তানির প্রক্রিয়া, শুল্ক- অশুল্ক বাঁধা, পণ্যের মূল্যের উপর আনুপাতিক প্রভাব বিশ্লেষণ এবং সম্ভাবনাময় অর্থনীতির চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। নীট পণ্য রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সর্বোচ্চ যোগান দেয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের আমদানি-রপ্তানি চিত্র, ঐ সমস্ত দেশের চাহিদা ও যোগানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ বইটিকে বিভিন্ন মহলে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে সমাদৃত করেছে। তথ্যবহুল এই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলাদেশের নীট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন নতুন ক্রেতার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্কস্থাপন অনেকাংশে বেড়েছে। নীট খাতের রপ্তানি বৃদ্ধি ও সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক বাজার বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটে বিকেএমইএ'র ধারাবাহিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের এই অনন্য সংকলনের প্রথম সংস্করণ খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ায় "GlobalMarket Information for Business Development" নামে নতুন করে আরও ৪৩ দেশের পুর্নাঙ্গ তথ্য সংকলন করে ২০১৫ সালে দ্বিতীয়ত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত এই সংকলন থেকে অনেক নীট শিল্প মালিকই পেয়েছেন নতুন নতুন বায়ার, বাজার এবং বিভিন্ন দেশের আমদানি- রপ্তানি বাণিজ্যের আন্তর্জাতিক অবস্থার সম্যক ধারণা।

বিকেএমইএ'র অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নীটওয়্যার খাতকে আন্তর্জাতিক মানের সর্বোচ্চ অবস্থানে নিয়ে যাওয়া, বাজার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় দেশের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিনতকরণে ভূমিকা রাখা।অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়ন সূচকের উর্দ্ধমূখী প্রবনতার সমীকরণের উপর সারা বিশ্বের বাজার ব্যবস্থাপনা নির্ভরশীল। নতুন কোন অঞ্চলে যে কোন পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য ঐ অঞ্চলের বাজার বিশ্লেষণ, প্রতিযোগী দেশ সমূহের সক্ষমতা, ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা এবং সর্বোপরি সম্ভাব্যতা যাচাই খুবই জরুরী। বিকেএমইএ এর মাধ্যমে গৃহীত নতুন বাজার সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন গুলোর মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে, জাপান, মালয়েশিয়ায় নীট বাজার বিস্তৃতির সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন অন্যতম। এখন পর্যন্ত আমরা উল্লেখযোগ্য যে সকল আন্তর্জাতিক মেলা ও মিশনে অংশগ্রহণ করেছি তা নিচে উপস্থাপন করা হলঃ

➨ মিশনে অংশগ্রহণ

- ২৬ তম আইএএফ, ওয়ার্ল্ড অ্যাপারেল কনভেনশন, হংকং, অক্টোবর ২০১০, হংকং
- স্পেন বার্সেলোনা (আইটিএমএ পরিদর্শন), সেপ্টেম্বর ২০১০, স্পেন
- অ্যাপারেল এবং হোম টেক্সটাইল সম্মেলন, নয়া দিল্লী, ভারত, সেপ্টেম্বর ২০১০
- এএফটি শো, কেপটাউন,সাউথ আফ্রিকা, নভেম্বর, ২০১০
- শিক্ষা সফর, ভিয়েতনাম, ২০১১
- যুক্তরাষ্ট্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ প্রতিনিধিদল প্রেরণ, সেপ্টেম্বর ২০১১
- প্রাইম সোর্স ফোরাম, হংকং কনভেনশন এবং এক্সিভিশন সেন্টার, হংকং , মার্চ ২০১১
- সৌদি আরব মিশন, জানুয়ারি ২০১১, সৌদি আরব
- সংযুক্ত আরব আমিরাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে উচ্চ ক্ষমতা সম্পূর্ণ প্রতিনিধিদল প্রেরণ, ২০১১
- তুরস্ক ব্যবসা - বাণিজ্য মিশন, মার্চ ২০১১
- চেক-রিপাবলিক এ ব্যবসা ভ্রমণ, চেক-রিপাবলিক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- লাস ভেগাসে ব্যবসা ভ্রমণ, ইউএসএ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ফেব্রুয়ারি, ২০১২
- জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিশনে অংশগ্রহণ, উজবেকিস্তান, মে, ২০১২
- ব্রাজিল, চিলি এবং কলোম্বিয়ায় ব্যবসা ভ্রমণ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মার্চ, ২০১৩
- ইউএসএ'তে ব্যবসা ভ্রমণ, ইউএসএ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মার্চ, ২০১৩
- ইইউ এবং আইএলও এর সাথে জয়েন্ট ডিসকাশন সেশন, জেনেভা, সুজারল্যান্ড, জুলাই, ২০১৩

➨ মেলায় অংশগ্রহণ

- বাংলাদেশ নীটওয়্যার সোর্সিং ট্রেড শো, নিউ ইয়র্ক, ইউএসএ
- বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফেয়ারে অংশগ্রহণ, ২০১০
- সিপিএম'তে অংশগ্রহণ, মস্কো, রাশিয়া, সেপ্টেম্বর, ২০১০

- হংকং ফ্যাশন সপ্তাহ'তে অংশগ্রহণ, জুলাই, ২০১০, হংকং
- ইউনাইটেড সোর্সিং এ অংশগ্রহণ, জার্মানি, জুলাই, ২০১০
- অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল সোর্সিং ফেয়ার এ অংশগ্রহণ, (এআইএসএফ), অস্ট্রেলিয়া, ২০১১
- ইন্টারন্যাশনাল টেক্সটাইল মেশিনারি এক্সিভিশনে অংশগ্রহণ, মাদ্রিদ, স্পেন, ২০১১
- মাদ্রিদ ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাশন ফেয়ার, স্পেন, সেপ্টেম্বর, ২০১০
- ম্যাজিক এক্সপোতে অংশগ্রহণ, লাস ভেগাস, ইউএসএ
- ৬তম নীট এক্সপো, টোকিও, জাপান-২০১২
- রাশিয়ায় ফেয়ার, মস্কো, রাশিয়া, ২০১২
- "লন্ডন গার্মেন্টস এক্সপো-২০১৩" বিজনেস ডিজাইন সেন্টার, লন্ডন
- "বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০১৫", সিঙ্গাপুর
- জার্মানিতে অনুষ্ঠিত সিপিডি মেলায় অংশগ্রহণ
- আইপিইউ মেলা-২০১৭
- বিআইআইডি এক্সপো ২০১৭
- ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড টোকিও-২০১৮, বিগ সাইট, টোকিও, জাপান

২০১৫ সালে ডেভেলপমেন্ট ফোরামের আয়োজিত মেলায় বিকেএমইএ-এর স্টল পরিদর্শনে এসে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে নতুন বাজার সম্প্রসারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উদ্যোগ গ্রহনের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। বিকেএমইএ সেই নির্দেশনা অনুসারে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যে বাজার সম্ভাবনা তৈরির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ২০২০ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিতব্য "ওয়ার্ল্ড এক্সপো" এবং ২০২২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিতব্য "ফিফা বিশ্বকাপ-২০২২" কে সামনে রেখে বাংলাদেশের নীট শিল্পকে মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে ছড়িয়ে দেয়ার প্রত্যাশায় আমরা সেখানে একটি বড় ধরনের নীট এক্সপোজিশন আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরদর্শী নির্দেশনাকে বাস্তবে পরিণত করতে সংযুক্ত আরব-আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, জর্ডান, ওমান সহ জিসিসি ভুক্ত সকল অঞ্চলে নীট পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা আনয়নে প্রথাগত বাজারের বাইরে নতুন নতুন বাজার সম্প্রসারণের জন্য সাম্প্রতিক সময়ে যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করা হয়েছে, তা এখানে উপস্থাপন করা হল-

মধ্যপ্রাচ্য এর দেশগুলো অর্থনৈতিক জোট, গালফ্ ইকোনমিক কাউন্সিলভূক্ত দেশ বা জিসিসি'র অধীন দেশ হিসেবে বিবেচিত। ২০১৬ সালে জিসিসি ভুক্ত দেশগুলো সমগ্রবিশ্ব থেকে মোট ৫ বিলিয়ন নীটপণ্য আমদানী করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ ০.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের নীট পণ্য রপ্তানি করেছে যা তাদের মোট নীট পণ্য আমদানীর ৭% (আইটিসি ট্রেড ম্যাপ-১৭)। এই অঞ্চলে বাজার সম্প্রসারণে গৃহীত উদ্যোগকে সফল করতে গত ২৯ শে মার্চ ২০১৭ বিকেএমইএ'র সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত এইচ ই ড. সাঈদ বিন হাজার আল শাহীর সাথে বৈঠক করেন এবং এই প্রক্রিয়া সহজ করতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের নীট পণ্য আমদানিকারক ও ক্রেতা গোষ্ঠির তালিকা আহ্বান করেন যাতে, বাংলাদেশি রপ্তানিকারকরা প্রতিযোগিতামূলক দামে উন্নত মানের পণ্য আমিরাতের বাজারে রপ্তানি করতে পারে। সে লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যে নীট শিল্পের বাজার বিস্তৃতি, যৌথ মূলধন সৃষ্টি, একক নীট প্রদর্শনী ও সহজ ভিসা প্রাপ্তির বিষয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত এইচ ই ড. সাঈদ বিন হাজার আল শাহীর সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন ।

বিশ্বের সপ্তম তেল সমৃদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বিস্তৃত অর্থনীতির দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। উল্লেখ্য, আগামী ২০২০ সালে দুবাই ওয়ার্ল্ড এক্সপোতে বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও উন্নত দেশ সমূহ অংশ নেবে। দুবাই এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের গেটওয়ে হিসেবে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। সংযুক্ত আরব আমিরাত সারা বিশ্ব থেকে প্রতি বছর প্রায় ৩.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের নীট পণ্য আমদানি করে। তার মধ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি করে প্রায় ১৩৩ মিলিয়ন। তাই সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশের নীটপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির বিশাল সুযোগ রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের নীট পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে আরব আমিরাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে বিকেএমইএ।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসী ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভায় এ.কে.এম সেলিম ওসমান, এমপি

মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমরা সাম্প্রতিক সময়ে নীট পণ্য রপ্তানির যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি তার সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা ইতিমধ্যেই বাস্তবে রুপ নিয়েছে। এই অঞ্চলে নীট শিল্পের বাজার বিস্তৃতিতে আমরা, বিকেএমইএ এবং এর সভাপতি মহোদয়ের একান্ত প্রচেষ্টায় বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এরই অংশ হিসেবে নতুন বাজার এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে গত ১৩ ও ১৪ অক্টোবর, ২০১৭ এশিয়ান প্যালেস হোস্টেলে বর্তমান ব্যবসা বান্ধব সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন ও নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আজমান প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় উপস্থিত থেকে বিকেএমইএ সভাপতি মহোদয় নীটওয়্যার পণ্যকে এই বাজারে বাজারজাতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন। সভাটিতে আজমান'র প্রায় সাত শতাধিক বাংলাদেশী প্রবাসী ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশের বাইরে ব্যবসায়ীদের নিয়ে কোন মতবিনিময় সভায় এবারই প্রথম এতো বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ব্যবসায়ীর সমাগম ঘটেছে। সেখানে তিনি বাংলাদেশের বাণিজ্য ও নৌপরিবহন মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে নতুন পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য একটি মেলা আয়োজনের ঘোষণা প্রদান করেন, যা নীট পণ্যের বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২০২১ সালের মধ্যে নীটখাত থেকে রপ্তানির পরিমাণ কমপক্ষে ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করার বিকেএমইএ'র কর্ম পরিকল্পনায় শ্রমিকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পণ্যের ব্র্যান্ডিং প্রক্রিয়াটির সাফল্য নির্ভর করে পণ্যের গুনগত মানের উপর এবং একটি গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য শুধুমাত্র শ্রমিকরাই তাদের শ্রম এবং মেধা দিয়ে উৎপাদন করতে পারে। বাংলাদেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় যখন শিল্প উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের কঠোর আত্মনিবেদন এবং আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে একটি সুষম শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে ঠিক তখনই মহান মে দিবস এর অন্তর্নিহিত গুরুত্ব আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের এই শিল্প উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অসাধারণ অবদান রাখায় মহান মে দিবসে তাই আমরা আমাদের শ্রমিকদের শ্রম, মেধা ও প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আগামী দিনগুলোতে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান, উৎপাদনশীলতার ব্যাপারে সঠিক কার্যক্রম গ্রহণ, কারখানার আর্কিটেকচারাল এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব শিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি অনেক বিষয়েই শিল্প উদ্যোক্তাদের নতুন করে কৌশল ও পরিকল্পনা প্রনয়ণ করতে হবে। কারণ ব্যবসা পরিচালনায় সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্ধারক এবং শিল্পোন্নয়নে সময়ের দাবিকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। আমরা সবসময়ই চাইবো নীট শিল্পের দ্রুতগতির বিকাশ ও বিবর্তন প্রক্রিয়া যেন কোন ভাবেই শ্লথ না হয়ে পরে। এজন্যই বাংলাদেশের নীট শিল্পের আন্তর্জাতিক শীর্ষ অবস্থানকে ধরে রাখার জন্যই শিল্প উদ্যোক্তা, শ্রমিক, সরকার তথা সংশ্লিষ্ট সকালের সহযোগিতা একান্ত জরুরি।

মহান মে দিবস: বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
সভাপতি, বিজিএমইএ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঐতিহাসিক মে দিবস অর্থাৎ ১লা মে হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের দিবস। শ্রমিক আন্দোলনের বহুমূখী সংগ্রামী অধ্যায়ের সাথে এ দিনটি ঐতিহাসিকভাবেই সংযুক্ত। ১লা মে, দিবসটি ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরের হে-মার্কেটে শ্রমিকদের রক্ত ঝড়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল। মহান মে দিবস আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিক সংহতি দিবস। বিরামহীন শ্রমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল কর্মকাল বা কাজের সময়সীমা। মে-দিবস পৃথিবী জুড়ে সকল শ্রমিক একাত্মতা প্রকাশ করে সংহতি প্রকাশ করে সেইসাথে প্রত্যাশা করে সুন্দর জীবনের, যেখানে নিরাপদ কাজের অধিকার, মর্যাদা, মজুরি ,বাসস্থানসহ সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা। আমি সকল পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শ্রমিক ভাইবোনদের এই প্রত্যাশার সাথে শতভাগ একাত্মতা প্রকাশ করছি।

এ বৎসরের মে-দিবস উদ্‌যাপন হচ্ছে একটি বিশেষ সময় যখন বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। এ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পেছনে কয়েকটি খাত অবদান রেখেছে। এরমধ্যে রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প অন্যতম। এই শিল্প ৮০ এর দশকে অপ্রচলিত পর্ণ্য হিসেবে যাত্রা শুরু করে আজ ২১.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। যেখানে সরাসরি ৪৪ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। জাতীয় আয়ের ৮০ শতাংশ অবদান রাখছে এবং পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরী পোশাক রপ্তানিকারক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের ৮০% ভাগই হচ্ছে সমাজের অবহেলিত দরিদ্র নারী শ্রমিক, যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুল্লেখযোগ্য। এরা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসে উৎপাদনের মূল ধারায় সংযুক্ত হয়ে আজ অর্থনীতির মূল চেহারাটা বদলে দিয়েছে। পোশাক শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী এদেরকে দক্ষ সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলে বেকার সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য না করলে নয় এ শিল্পের ৩৬ বৎসরের বন্দুর যাত্রাপথে অনেক প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। শিল্পে এসেছে অনেক ঝড়, যা কাটিয়ে উঠতে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে এবং হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের জনগণ, গণতান্ত্রিক সরকার, আই.এল.ও. বায়ারসহ বিভিন্ন সম্মানিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্নভবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তারা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। রানা প্লাজা, ভবন ধস এবং তাজরিন ফ্যাশনে সংঘটিত অগ্নিকান্ড পোশাক শিল্পের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দূর্ভাগ্যজনক অধ্যায়। তবে এ ঘটনাগুলো হলো শিল্পের টার্নিং পয়েন্ট, যার কারণে শিল্প ঘুরে দাড়াচ্ছে। গত ৫ বছরে কারখানা সংস্কার এবং শিল্পের সামর্থ্য বৃদ্ধিতে আমরা বিশাল উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে সংস্কার কার্যক্রমে প্রায় ৯০% সমাপ্ত হয়েছে এবং চলতি বছরের মাঝামাঝি সময়ে অবশিষ্ট কাজ শেষ হবে বলে আমি আশাবাদী।

বর্তমান সরকার শিল্প ও শ্রম বান্ধব সরকার সাম্প্রতিককালে মালিক শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে। শ্রম আইন সংশোধন, শ্রম বিধিমালা জারী, শ্রমিক কল্যাণ তহবিল এবং ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছে। আশা করা যাচ্ছে, ফলাফল শীঘ্রই পাওয়া যাবে। সরকার শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কারখানা পরিদর্শন দপ্তর ও শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রুপান্তরিত করেছে। যার ফলে ইতোমধ্যে শ্রমিক-মালিক এর সুবিধা পাচ্ছেন। এরজন্য বর্তমান সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রমিক ভাইবোনেরা যারা কি না এ শিল্পের প্রান, অবিচ্ছেদ্য আর শিল্পের পরিপূরক তারা ভাল থাকলে শিল্প ভাল থাকে আর খারাপ থাকলে শিল্প খারাপ থাকে। তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষে সরকারের গৃহীত সকল পদক্ষেপেই বিজিএমইএ সম্পৃক্ত হয়ে শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয় সংগঠনের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেছে।

এই শিল্পের প্রতিটি উদ্যেক্তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, শ্রমিক ভাই বোনেরা এ শিল্প পরিবারে সদস্য। এ শিল্প যে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে, তার দাবীদার শ্রমিক ভাই-বোনেরা। সুশৃঙ্খল শ্রমিক হিসেবে সাড়া বিশ্বে আমাদের কর্মী ভাই বোনদের সুনাম রয়েছে। কিন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, তাদের এ সরলতার সুযোগ নিয়ে একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্থ করার অপপ্রয়াস চালায়, যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

আমি একান্তভাবে আশা করি, শ্রমিক ভাই বোনেরা এ ব্যাপারে সজাগ থেকে শিল্পের বিরুদ্ধে সকল ধরনের ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করবেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কল্যাণ সেবামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গুলো হলো শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, হাসপাতাল নির্মান, ১২টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীদের বিশেষ চিকিৎসাসেবা প্রদান, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ৫টি স্কুল পরিচালনাসহ শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের জন্য বৃত্তি প্রদান ও দক্ষ কর্মীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ প্রভৃতি।

বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিক ভাই বোনেরা যাতে মানসম্মত জীবন যাপন করতে পারেন, সে ব্যাপারে ক্রেতাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। উদ্যোক্তা-ক্রেতা-শ্রমিক মিলে একটি নিরাপদ অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সুদৃষ্টি ও শিল্প সমাজের উন্নয়নে সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন। পরিশেষে বলতে চাই মহান মে-দিবসের শিক্ষা শুধু শ্রমিকদের কল্যান ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য অঙ্গীকার বন্ধ হওয়ার জন্য নয় বরং মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে আগামী ২০৪১ সাল নাগাদ দেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশের অংশীদার হওয়ার বিষয়টিও এ মহান দিবসের অঙ্গীকার হওয়া উচিত।

আল্লাহ হাফেজ।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান

কামরান টি রহমান
সভাপতি
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন

পৃথিবীর সব দেশেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নয়ন ও প্রসার ঘটছে। সরকারও এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে আর্থিক ও অবকাঠামোগত সহযোগিতা করে আসছে। সম্পদ গতিময় করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের সৃজনশীলতা এবং বাহ্যিক বৈরী পরিবেশকে উপযোগী কৌশল দ্বারা অভিযোজিত করার দক্ষতা উদ্যোক্তাদের সাহায্য করে থাকে। তবে এরূপ পরিস্থিতিতে সমস্যা থেকেই যায়। এসব শিল্পের অবকাঠামো যেহেতু ক্ষুদ্র, সেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এরূপ শিল্পের অবদান কিছুটা সীমাবদ্ধ। ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে মাঝারি শিল্পকে সংযুক্ত করে সম্পদের ব্যবহার এবং প্রসার উন্নতর হতে পারে। প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহিত হয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা প্রসারিত করতে পারে। সাথে সাথে আন্তঃখাত সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার প্রয়াস পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সরকার অবশ্য নির্মাণ কাঠামোর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি খাতের উন্নয়ন ঘটাতে পারে, যাতে এসব শিল্প খাত দৃঢ়তার সাথে অব্যাহত থাকতে পারে। লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশ শিল্পোদ্যোক্তাদের ৮০ শতাংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের। জিডিপিতে এরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে না পারলেও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রেখে আসছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে এখন একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিত, সরকার শিল্প ক্ষেত্রের প্রসার ও উন্নয়নে অবদান রেখে আসছে। ভূমির স্বল্প পরিসর, জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি (১.৩৭%, ২০১৫), বিপুল বেকার শ্রমিক অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম জনসংখ্যা বৃদ্ধি (৬ কোটি ৭ লাখ, ২০১৩), অথচ কর্মসংস্থানের অভাব, দরিদ্রসীমার নিচে জনসংখ্যার স্তর অনেক বড় (১২.৯%, ২০১৬), শিক্ষার নিম্নহার, রোগ, অপুষ্টি, দারিদ্র্য, চিকিৎসা ও বাসস্থনের সংকট ইত্যাদি বিরাজমান। কিন্ত এসব সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়ন এবং সেই সাথে বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সার্বিক উন্নয়ন ও প্রসারের মাধ্যমে। সরকার অবশ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থ সহযোগিতা ও উৎসাহ অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও আর্থিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছে। কিন্ত কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা রয়ে যাচ্ছে। যদিও সরকার দৃঢ়তার সাথে বলছে, ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে সত্যতা পাওয়া যায় না। এ কথা সত্য সরকারের উদ্যোগ ও উৎসাহের ঘাটতি নেই। দেশের জিডিপি যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কর্মসংস্থান সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বিবিএস জরিপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ২০১১ থেকে ২০১৩ সালে দেশে ৪০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্ত এ কর্মসংস্থনের পরিমাণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের বিচারে অপ্রতুল, যদিও বাংলাদেশে ৭ শতাংশের অধিক প্রবৃদ্ধি রয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, তাতে বেকার জনমানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে অর্থাৎ শ্রম বাজারে বেকার মানুষের আধিক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ (২০১৩) ১৫ কোটি ৪১ লাখ এবং তথ্য অনুযায়ী ১৫ থেকে ৬৫ বছর বয়সের কর্মক্ষম মানষের সংখ্যা ৬ কোটি ৭ লাখ। অথচ ২০১০ সালে এ সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬৭ লাখ। এ পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়, দেশে কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কর্মসংস্থান সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে যুবসম্প্রদায়কে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন করে বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকার সমস্যা লাঘব করা যেতে পারে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে এবং দেশের সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

সত্য বলতে কী, দেশের ভূমির সীমাবদ্ধতার কারণে শিল্প খাতের উন্নয়ন অর্থাৎ পুঁজির সঠিক বিনিয়োগ এবং এ বিনিয়োগের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের জন্য কাঠামোগত সহযোগিতা, অর্থায়ন, বিদ্যুৎ বা গ্যাস সরবরাহ, বাজার সুবিধা, বন্দর সুবিধা, উদ্যোগী ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি একান্ত অপরিহার্য। এরূপ শিল্প কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বিপুলভাবে পূরণ করে থাকে।

গ্রাম বাংলায় কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করে কৃষি ক্ষেত্রে আমূল উন্নয়ন সাধন করা যায়। বাংলাদেশ সরকার এরূপ শিল্পোন্নয়নে উৎসাহী বলে দেশে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বর্তমান সরকার এ খাতের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ অন্যান্য তফসিলি ব্যাংক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের অপর দেশগুলোর সঙ্গে টিকে থাকতে হবে। বিষয়টি উদ্যোক্তাদের উপলব্ধি করতে হবে এবং পূর্বের গতিধারা, আচার-আচরণ, কর্মতৎপরতা পরিবর্তন করে এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রত্যয় গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়ন এর উপর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ও উৎকর্ষ বিপুলভাবে নির্ভর করে। কারণ দেশে ও বিদেশের বাজারে পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান নির্ভর করে পণ্যের গুণগত মান ও উৎপাদন ব্যয়ের ওপর। এটি স্থিতিশীল রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্ভর করে শ্রমিকের দক্ষতা, নিপুণ কারিগর, প্রায়োগিক বা ফলিত জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের সদিচ্ছা, আগ্রহ ও নিরঙ্কুশ শ্রমের ওপর। সুতরাং শ্রমশক্তিকে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষা প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর করতে হবে। গুণসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে দক্ষতার বিকল্প নেই।

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশে উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সঠিক মানসম্পন্ন পণ্য তুলনামূলক স্বল্প ব্যয়ে উৎপাদন করা অপরিহার্য। অবাধ বাণিজ্যের ফলে বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমেই সমন্বিত হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সনাতন কর্মধারা পরিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করে কর্ম প্রেরণা ও কর্মোদ্যোগে প্রয়াসী হওয়ার সময় এসেছে। বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে নিতে হবে, যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও উন্নততর জীবনব্যবস্থার বিধান স্থাপন করা যায়। এ জন্য প্রয়োজন কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার, অপচয় হ্রাস, দক্ষ ও নিপুণ কারিগর সৃষ্টি, শোভন কর্ম পরিবেশের সূচনা, কৌশলগত ব্যবস্থাপনার উন্মেষ ঘটানো, সুষ্ঠু মালিক-শ্রমিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিল্পের প্রতি অঙ্গীভূত অনুভব করা সর্বোপরি স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আমরা বিশ্বাস করি অনাগত দিনগুলোতে বাংলাদেশ এমন সুন্দর পরিবেশ পাবে, যা আমেরিকা, জাপান, মালয়েশিয়া, ইতালি প্রভৃতির মতো একটি দেশ হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পাবে।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন দেশে শিল্পোন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য সকল মালিক ও শ্রমিক সমাজকে উৎসাহ দিয়ে থাকে। দেশে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে এবং সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ উপযোগী হলে আপামর জনসাধারণ এর সুফল ভোগ করতে পারবে, শ্রমজীবী মানুষ কর্মসংস্থান পাবে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ ও জাতি দারিদ্র্যের বিষফোঁড়া থেকে রক্ষা পাবে, শান্তি স্থাপিত হবে।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

শিবনাথ রায়
মহাপরিচালক (অতি: সচিব)
শ্রম অধিদপ্তর, ঢাকা

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে মে দিবসকে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালনের স্বীকৃতি প্রদান করেছিলেন। এ স্বীকৃতির অন্তরালে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের ও সংঘবদ্ধ হওয়ার সংগ্রামের অনন্য এক ইতিহাস। বিশ্বের কোটি কোটি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ১৮৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটের শ্রমিকরা উপযুক্ত মজুরি আর দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবিতে পহেলা মে ধর্মঘট আহবান করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। প্রায় তিন লাখ মেহনতি মানুষ ঐ আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে এক সমাবেশে অংশ নেয় এবং পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়, আহত এবং গ্রেফতার হয় আরো অনেকেই। পরবর্তীতে মালিকপক্ষ ও সরকার আন্দোলনরত শ্রমিকদের দাবি মেনে নেয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে পহেলা মে-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৯০ সাল থেকে পহেলা মে বিশ্বব্যাপী "মে দিবস" হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সু-সম্পর্কের মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অগ্রগতি সাধন, কর্মদক্ষ জাতি ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে মর্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও শ্রম আদালত দেশে শ্রম আইন বাস্তবায়নসহ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তাসহ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের নিশ্চয়তা প্রদান, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন, শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের প্রশিক্ষণ প্রদান, চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন, নাবিকদের জন্য মেরিটাইম আইন সংশোধন, শিশু-শ্রম নীতি-২০১১ প্রণয়ন, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১০, ব্যক্তিমালিকানাধীন সরকারি সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। তাছাড়া বর্তমান সরকার ব্যক্তি মালিকানাধীন ৪২টি সেক্টর চিহ্নিত করে গার্মেন্টসসহ ১৮টি সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করেছে। বর্তমানে সরকারের শ্রম নীতিমালা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণে চিকিৎসা সেবা, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ, পরিবার পরিচর্চার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও শ্রমিকদের বিনোদন সেবা প্রদানসহ শ্রমিক-মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়াধীন শ্রম অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করবে। এজন্য চাই শিল্পের বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি সচল রাখা। এ লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তর সার্বক্ষণিকভাবে তৎপর রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক শ্রম পরিদপ্তরকে শ্রম অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে, যাতে করে শ্রম অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করেছে। শ্রমক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক সুসম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বের সহিত তাল রেখে শ্রম অধিদপ্তর শিল্প ক্ষেত্রে যে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে অংশীজনদের (Stake Holder) মধ্যে সামাজিক সংলাপ আয়োজন করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন ও শিল্পের উৎপাদনশীলতা অটুট রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। শ্রমিক তাঁর দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত হওয়ার যে অধিকার আইএলও কনভেনশন-৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী লাভ করেছে। শ্রম অধিদপ্তর তা বাস্তবায়নের পথ করে দিচ্ছে। বর্তমানে দেশে শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারকে গুরুত্ব প্রদান করে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন লাভের বিষয়টি শ্রম আইনে অধিকতর সহজ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে, দেশে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শ্রম অধিদপ্তরের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি করা শিল্পক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিকের মধ্যে কোন শিল্প বিরোধ দেখা দিলে এবং তা দ্বি-পাক্ষিকভাবে সমাধান না হলে শ্রম অধিদপ্তর সালিশকারক হিসেবে দেশের প্রচলিত শ্রম আইন অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে।

প্রশিক্ষিত শ্রমিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত এ লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তর দেশের ৪টি বিভাগীয় শহর ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও খুলনায় ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের মাধ্যমে মালিক-শ্রমিক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী/ কর্মকর্তাগণকে শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা, ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, উৎপাদনশীলতা ও শ্রম প্রশাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ উৎপাদনশীল জাতি গঠনে ভূমিকা পালন করছে। শ্রম অধিদপ্তরের অধীন ০৬টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। আঞ্চলিক অফিসসমূহ ট্রেড ইউনিয়ন ও সমিতিসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, মালিক শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সালিশী কার্যক্রম পরিচালনা এবং সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ শ্রমিকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ ও বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদান, শ্রমিকদের পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে কাউন্সিলিং ও বিনামূল্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহসহ সর্বোপরি শ্রমিক এর উন্নয়নমূলক ও বিনোদনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের উন্নয়নে দেশের ১৬৫টি চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য "দি প্লান্টেশন এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড" চালু আছে। যার সঞ্চিত মূলধন কয়েক কোটি টাকা । এ অর্থ শুধুমাত্র চা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকই মহিলা, আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে নারী ও পুরুষ সমানভাবে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকা আবশ্যক। মহিলা শ্রমিকদের প্রতি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাসহ পুরুষ ও মহিলা শ্রমিককের জন্য সমকাজ সমমজুরি প্রদান সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন (কনভেনশন-১০০) বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে তার প্রতিফলন হয়েছে। বর্তমান সরকার রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠন করে। কমিশনের সুপারিশের আলোকে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৬ (ষোল)টি ধাপে মজুরি স্কেল ও ভাতা/প্রান্তিক সুবিধাদি নির্ধারণ করেছে। মোট ৪২টি বেসরকারী শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৩৮টি বেসরকারী শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প তৈরী পোষাক শিল্পের জন্য মজুরি পূনঃনির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড ঘোষিত হয়েছে।

মালিক ও শ্রমিক উভয়ের লক্ষ্য হতে হবে শিল্পে লাভ জনক উন্নয়ন আর শিল্পে লাভ জনক উন্নয়ন হলেই মালিকের মূলধন বৃদ্ধি পাবে , বিনিয়োগ বাড়বে , নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে, সরকারের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্নয়ন সাধন হবে। শ্রমিক ও মালিকের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও যুক্তিসংগত মনোভাবের উপর আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নির্ভর করে। এ জন্যই শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতির উপর সরকার অধিক গুরুত্ব আরোপপূর্বক সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

বাংলাদেশ সম্প্রতি এলডিসি (LDC) ভুক্ত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে দক্ষ শ্রমিক, নিরাপদ কর্মস্থল ও কর্মস্থলে সহযোগিতা বজায় রেখে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিশ্চিতপূর্বক বহিঃর্বিশ্বে দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। সততা,দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সাথে সকলকে শিল্পের উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। তবেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

Policy Implications for Work and Employment of Persons with Disabilities

Md. Anwar Ullah, FCMA, PhD
Additional Inspector General (Joint Secretary)
Department of Inspection for Factories and Establishment

Introduction

Employment is for all persons in working age a key element towards combatting poverty and to achieve social inclusion and participation in the society. This applies equally to persons with disabilities. Unfortunately the available statistics indicate that the employment levels of persons with disabilities are drastically lower than those of non-disabled people. Many issues affect the capacity of persons with disabilities to obtain employment and to be able to progress in their employment. Barriers to education, lack of reasonable accommodation, lack of accessibility to infrastructures and to information, limitations related to legal capacity, as well as attitudinal barriers in society are some of the areas that have a significant impact on the employment of persons with disabilities. Often disability is seen as inability to work.

Article 27 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) is one of the most detailed articles of the CRPD, which clearly reflects that States need to undertake a large variety of measures to ensure that persons with disabilities have equal opportunities to find an employment and to have a professional career. In the Goal 8 of Sustainable Development Goals (SDGs), it is stated that by 2030, country has to achieve full and productive employment and ensure decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value.

However, in this write up, I have identified some of the key issues faced by persons with disabilities and to make policy recommendations on what government bodies and other stakeholders should do to improve the current situation.

The Role of the Public Sector

The public sector is in all countries the largest employer and has a special responsibility to lead by example in the employment of persons with disabilities. The situation of the public sector employment of persons with disabilities should be measured with indicators. Need to have affirmative actions for Quota implementation Bangladesh has established quotas for the employment of people with disabilities, but the way in which the public sector recruits new employees, is not always disability-friendly. For instance, in many places, government online recruitment systems, job websites, and written and online application forms, are not accessible for persons with disabilities. Application forms do not have diversity and nondiscrimination statements, and voluntary information provided about applicants' disability is not collected, stored or used appropriately. In addition in some places persons with disabilities are expressly prohibited from holding government positions and medical examinations are used to enforce this discrimination. Sometimes the applicant is required to use a specified doctor to provide a medical certificate. More efforts need to be done in general to adapt the recruitment processes of the public sector, so that people with disabilities have effective equal opportunities to obtain employment.

Governance and rule of law issues are relevant for employment of persons with disabilities in the public sector. In some places the consent of a person's supervisor is required in order to file a complaint against someone, which, for example, makes it difficult for a person with a disability to file a complaint against his or her supervisor.

Government need to increase public sector employment of persons with disabilities in a significant way and serve as a model to the private sector, and should collect statistics on persons with disabilities in public sector employment; improve their recruitment, hiring, retention and promotion policies; and provide training to all employees; and ensure good accountability mechanisms and fair processes in public sector employment to create a safe and healthy work environment for persons with disabilities.

Need to have Good Employment Laws, Healthy and Safe Working Environment

Different relevant ministries of Government of Bangladesh (GOB) need to ensure that nondiscrimination legislation, policies and actions extends to employment settings (hiring, retention and promotion), and need to enact employment laws that will require employers to create healthy and safe working environments for persons with disabilities among all others. Good family and medical leave, sick leave, personal days, and other employment policies are needed that will benefit all employees and employees with disabilities in particular. In this regard government should enact legislation specifying that employers are required to provide reasonable accommodation, healthy and safe working environments, fair wages, and good working conditions for persons with disabilities among all others.

Need to Complement Non-discrimination Legislation with Positive Action Measures

Government of Bangladesh (GOB) has enacted Persons with Disabilities Rights and Protection Act 2013, Persons with Disabilities Rights and Protection Rules 2015. Proper implementation of this act and rule can ensure and protect persons with disabilities from discrimination and can make an important contribution towards the employment of persons with disabilities. Experience has however shown that non-discrimination while being quite effective for persons with disabilities who are in the labour market, is not enough to promote the entry into the labour market. Government should implement to promote the employment of persons with disabilities. Promotional measures may take different names in different places where these exist- affirmative action, positive measures, positive action, etc. The most often used positive action measures in the context of work and employment are financial incentives; quota systems; pro-active targeted recruitment and outreach; good hiring, retention and promotion policies; employee and management development, including skills and leadership development, and training; and mentoring.

Financial incentives, which should go beyond the coverage of the costs of reasonable accommodations, and may include provision of lump sums for all persons with disabilities is a system which is easier to apply, but usually leads to giving preference to those persons with disabilities whose disability is less severe or has less impact on the performance of the person with a disability. Some financial incentives are given in the form of direct allocation or as tax credits (such as for small to medium enterprises, to make accommodations for workplace accessibility, transportation or provision of sign languages).

Another form of financial incentives are the incentives designed to benefit businesses that are wholly or partly (at least 51%) owned by persons with disabilities or that are jointly owned by persons with disabilities, (other) women and persons belonging to minority groups). These sometimes take the form of tax breaks or loans. Tax breaks can be provided to them and to other businesses that use these businesses (these are called for example supplier diversity programs, disadvantaged business programs, small business programs, etc.). Specific loans can be provided to businesses owned by persons with disabilities.

Positive action measures can include training programs, pro-active and targeted outreach and recruitment, employee and management development, and employee support programs. Nondiscrimination laws should make it clear that positive actions are permitted, encouraged and in some cases required.

Employer policies regarding hiring, retention and promotion should take disability into account as a positive criterion that increases the diversity of the staff, and that recognize **the** value of diversity. For example, if two qualified candidates both apply for the same position, one with a disability and one without a disability, favourable consideration is given to the person with the disability because she or he would add to the diversity of the staff. In addition, strategies and plans for job retention are needed for when people become disabled during their working lives, a large group. Whenever possible, the relationship with the current employer should be kept, as the experience shows that once people are out of the labour market, it is very difficult to get them back.

The Role of the Private Sector

Both public and private sector should have to take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability by any person, organization or private enterprise. Concerted efforts are needed to set targets and indicators for the private sector, make incentives for positive action measures, and raise awareness of the relevant issues included in CRPD, SDGs, and Seventh Five Year Plan. Representative DPOs should be involved in these efforts. GOB needs to be more proactive in encouraging the private sector to employ persons with disabilities. Financial incentives and other positive action measures have already been mentioned in previous sections. Awareness raising campaigns highlighting the contributions that employees with disabilities can make, and that are aimed at eliminating stereotypes, take some time to generate an impact and should be complemented with more targeted actions, preferably done in co-operation with organisations of persons with disabilities.

While there are an increasing number of companies that have realized that it is in their benefit to have employees with disabilities, there is still much to be done to increase the hiring, retention and promotion of people with disabilities in the private sector. National employer organisations have a particularly relevant role to raise awareness among their members on the need to increase the employment of people with disabilities.

There is not only an ethical and human rights case, but also a business case for employing people with disabilities, part of which is related to the need for companies to have a diverse workforce, which largely reflects the diversity of consumers. It also has positive effects in rooting the business within the community. More and more companies include the employment of people with disabilities in their sustainability and/or corporate social responsibility (CSR) reporting.

A partnership approach between the private sector and organisations of persons with disabilities, especially those that are actively promoting the hiring, retention and promotion of their members has provided good, although still limited, outcomes. Organising targeted training programmes for people with disabilities with the supervision of one or more private companies, if possible combined with apprenticeship schemes, can lead to positive outcomes for all involved.

So far, the UN Global Compact, a strategic policy initiative for businesses who have committed to the Global Compact's 10 Guiding Principles, has done little to promote non discrimination of persons with disabilities as part of the non-discrimination provision on employment and occupation foreseen in the Global Compact (UNGP Principle 6).

The Role of Trade Unions

The promotion of the employment of persons with disabilities is usually not a top priority among trade unions and more needs to be done to ensure that they protect persons with disabilities who are already in the labour market and also support measures promoting the entry into the labour market both in the private sector and in the public sector.

Trade unions also have a special role in protecting the rights of persons with disabil

Trade unions also have a special role in protecting the rights of persons with disabilities who work in supported employment schemes. Many are well equipped to advocate for fair wages and good working conditions, being experts in this and having a good knowledge of relevant authorities. Trade / labor unions should be included among the key sectors to be given priority in training on rights as per Disability right and Protection Act 2013 and they should liaise with organisations of persons with disabilities to do cross- awareness raising; they should ensure that they are accessible and should enact positive action measures to increase representation of persons with disabilities as representatives where such measures do not already exist.

Conclusion

As a cross cutting issue stated in SDGs, all stakeholders should increase national and international co-operation promoting the hiring, retention and promotion of persons with disabilities, and women with disabilities in particular, including building capacity of representative organisations of persons with disabilities.

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিকের নিরাপদ কর্মস্থল

মোঃ শাহজাহান মিয়া
যুগ্ম সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

দেশে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দেশের জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করা শ্রম ও কর্মসংস্থন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা বাণিজ্যেও সম্প্রসারণের অনুকুল পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কাজ।

শোভন কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবন' এই রূপকল্পে পৌঁছার পরিক্রমায় শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অভিলক্ষ্য নিয়ে জাতীয় উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন কথা বলেছেন মেহনতি মানুষের পক্ষে, শ্রমিকের পক্ষে। তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশে এবং ২০৪১-এ উন্নত দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে শিল্প কারকাখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থন মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। তবে এ জন্য প্রয়োজন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ প্রতিষ্ঠানটিকে ২০১৪ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত করে এর সক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ পরিদর্শকগণ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান নিয়মিত পরিদর্শন করে নিরাপদ কর্মস্থলের বিষয়টি নিশ্চিত করার নিমিত্ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির ওপর গুরুত্ব প্রদান করে ২৮ এপ্রিলকে 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি' দিবস ঘোষণা করা হয়েছে। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে। ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে শ্রমিক ও তার পরিবারকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে, ফলে কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। শ্রমিকের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হলে কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, যা জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখবে।
দেশের বিদ্যমান সম্পদ এবং সার্বিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে দেশের শিল্প সেক্টরে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন ও সম্পর্ক উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন করা হয়েছে। তৈরী পোশাক শিল্প এ দেশের একক বৃহত্তম শিল্পখাত এবং এই খাত থেকে রপ্তানি বাণিজ্যেও ৮২% অর্জিত হয়ে থাকে। শ্রমঘন এই খাতের যথাযথ গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতীয় পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের অনুরূপ আলাদা একটি আরএমজি বিষয়ক ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করা হয়েছে। যা কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছে।

দেশে এবারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৭.৩ এরা কাছাকাছি থাকবে বলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ধারণা করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেই সামাজিক সূচকের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন হয়না। আমাদের দেশে এখন পাঁচ হাজারের বেশী মাঝারি ও বড় কারখানায় প্রায় ৪৫ লাখ মানুষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। জাতীয় বার্ষিক গড় আয়ের ১০ ভাগেরও বেশি আসে এই খাত থেকে। এসব কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরিভাবে বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

এজন্য সব শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকদের নিরাপদ, ঝুঁকিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর নয় এমন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। যদি এ দিকটায় গুরুত্ব দেয়া হয় তাহলে অব্যাহতভাবে উৎপাদন বাড়বে, আয় বাড়বে এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। এজন্য অবকাঠামোগুলো সুষ্ঠু ও নিয়মমাফিক নির্মাণসহ অধিকতর নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ এবং কারখানা পরিদর্শনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

নিরাপদ কর্মস্থল কর্মপরিবেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমরা দেখতে পাই নিরাপদ কর্মস্থলের অভাবে আমাদের দেশে বহুতলবিশিষ্ট ভবনে যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক হতাহত হন। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর এ দেশের কর্মস্থলগুলো ছিল বেশীর ভাগ একতলা, যেমন পাটকল, সুতাকল এমনকি ভারী শিল্প রি-রোলিং এগুলো সবই ছিল একতলা বা দোতলা। ফলে অগ্নিকান্ড ঘটলেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমান এবং হতাহত হতো কম। নির্গমন পথ ছিল সুগম, ফলে শ্রমিকরা দ্রুততার সঙ্গে বের হয়ে যেতে পারতেন এবং অপেক্ষাকৃত সহজে আগুন নেভানো যেত। তাই যখন কোন কারখানা গড়ে তোলা হবে, তখন অবশ্যেই তার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি কারখানায় যথাযথ অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। জরুরী নির্গমনের পথ থাকতে হবে। যে ভবনে কোনো কারখানা গড়ে তোলা হবে, সে ভবনটি ইমারত এবং শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করা গেলে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

যে বিষয়টির ওপর বেশি নজর দিতে হবে তা হল নিরাপদ কর্মস্থল। অর্থেও বিনিময়ে জীবন কেনা যায় না। টাকার মূল্য কমে গেলেও শ্রমিকের জীবনের মূল্য বাড়েনি। এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে যে দাবি উঠেছে তা আইএলও কনভেনশন ১২১ এবং 'লস অব ইয়ার আর্নিং এন্ড পেইন এন্ড সাফারিং' এর ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দিলে তবু চাকরির সময়কালটা কিছুটা হলেও মূল্যায়ন হবে। শ্রম কোনো সময়ই পণ্য নয়। তাই নিরাপদ কর্মস্থল সুষ্ঠু কর্মপরিবেশের জন্য একটি পূর্বশর্ত। নিরাপদ কর্মস্থল ও কর্মপরিবেশের মাধ্যমেই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্ভব। নিরাপদ কর্মস্থল ও কর্মপরিবেশের মাধ্যমেই টেকসই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং শ্রমিককে আস্থায় নিয়ে তাঁদের মর্যাদাবোধ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে শিল্পায়নকে বিকশিত করা।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মহান মে দিবস ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

আলহাজ্ব শুক্কুর মাহামুদ
সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ

মহান মে দিবস ২০১৮ আমাদের সামনে সমাগত। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সেই সকল পূর্বসূরীদের যারা ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে বেঁচে থাকার দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল। আমি তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, যে সকল শ্রমিকরা সিকাগো শহরের হে মার্কেট চত্বরে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন।

সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা এই বাংলা ১৮৮৭ সাল থেকে বৃটিশ বেনিয়া এবং ১৯৪৭ সাল থেকে পকিস্তানী শাসকদের হাতে নির্যাতিত নিপীড়িত হয়ে আসছিল। পাকিস্তানী শাসক সরকারের দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঙালিদের শোষণ বঞ্চনাহীন সুখী সমৃদ্ধশালী জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন বাংলার এক মহান পুরুষ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের দাবীসমূহ স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে চুড়ান্ত রূপ দিয়ে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে এদেশের শ্রমজীবী মানুষ দেশ গড়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের পথ সুগম করেন এবং বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর তৎকালীন ৭টি কোর কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অকৃতিম বন্ধু। তাই তিনি উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ নিশ্চিত করতে এদেশের সকল কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় খাতে অধিগ্রহণ করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করেছিলেন। তিনি এদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার সমূহ সুনিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন। সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তারই লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর জাতীয় শ্রমিক লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বর্তমানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে সর্বকালের সেরা নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ার কাজ হাতে নিয়েছেন। দুর্বার গতিতে দেশ উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করেছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রম, দূরদর্শী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের এখন স্বপ্ন দেখান উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার।

জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে ইতোমধ্যে ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম আইন সংশোধন করে আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী ২০১৩ সালে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করেছেন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরপর দুইটি পে-স্কেল প্রদান করে তাদের বেতন-ভাতা দ্বিগুণ করে দিয়েছেন। শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরির বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছর করেছেন। দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসংস্থানের কাজ শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে ৪১টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরি বোর্ড মজুরি ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রয়াত্ব খাতের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন- ২০১৫ গঠন করেছেন। বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য সরাসরি কৃষকদের সার-ডিজেল-বীজে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। প্রবাসে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং প্রবাসে গমন ইচ্ছুক শ্রমিকদের অধিক আয়ের লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানীর জন্য ইতোমধ্যে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যে সকল সেক্টরে বিদেশে শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে সে সকল সেক্টরে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার জন্য ট্রেড কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশের বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বনির্ভর করার জন্য প্রতিটি জেলা পর্যায়ে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। এমনকি প্রতিটি উপজেলা ও থানা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি বার্গেনিং এজেন্ট হয়ে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন ১৬৬২.৫০ থেকে ৫৩০০ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। গার্মেস্টস শ্রমিকদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষে ডরমেটরী তৈরীর কাজ চলমান আছে।

অন লাইন পদ্ধতির মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ করেছেন, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর এবং শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে রূপান্তর করেছেন এবং প্রায় ৪৫০ জন দক্ষ পরিদর্শক নিয়োগ দিয়েছেন। শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন করেছেন এবং বর্তমানে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ফাউন্ডেশনে শ্রমিকদের কল্যাণে জমা রয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। ইতোমধ্যে সমুদ্রগামী নাবিকদের জন্য নৌ আইন ও আভ্যন্তরী নৌন শ্রমিকদের জন্য নতুন পে-স্কেলের গেজেট প্রকাশ করেছেন। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষের টেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন, জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন, শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, শ্রমিকদের জন্য আলাদা হাসপাতাল নির্মান, ২০১১ প্রণয়নের কাজ চলছে। ব্যক্তিমালিকাধীন বেসরকারী সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যাক শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করেছেন।

দেশকে এগিয়ে নিতে, দেশের মানুষের ভাগ্যউন্নয়নে এবং শ্রমজীবী মানুষের চাহিদা পূরণে সরকার-মালিক-শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে গঠনমূলক, দায়িত্বশীল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী আদায়ের প্রশ্নে আপোষহীন ও জাতীয় শিল্প রক্ষায় অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। আলোচনা ও সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত, নিয়মতান্ত্রিক ও আইনানুগ পথ হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া ও যৌথভাবে দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা। অর্থাৎ আই,এল,ও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এবং দেশের প্রচলিত শ্রম আইনের দ্রুত ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত হতে হবে।

সকল কলকারখানাসহ গার্মেন্টস শিল্পকে আরো উৎপাদনমুখী করতে কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের সহঅবস্থানে থেকে আরো সচেতনভাবে কাজ করতে হবে এবং টেড ইউনিয়ন অধিকার সকল কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে কোন মিল-কলকারখানা বন্ধ না রাখার জন্য শিল্পমালিকদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

মহান মে দিবস ২০১৮ এর পাদমূলে এসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আবেদন, অসংগঠিত ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত গামেন্টস শ্রমিক, নির্মান, রিকসা-ভ্যান, সড়ক পরিবহন, নৌ-পরিবহন, জাহাজী, দর্জি, কুলি, নৌকা মাঝি, গৃহ শ্রমিক, দোকান-পাট, হকার্স সেক্টরে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য বীমার সুবিধা প্রদান, দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকদের বিনামূল্যে যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, কর্মক্ষম এবং বার্ধক্যকালীন শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ভাতার ব্যবস্থা চালু করা সময়ের অপরিহার্য আবেদন।

শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষুধা-দারিদ্র্য মুক্ত, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদমুক্ত উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ গড়ে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করব এবং ঘোষিত কর্মসূচী ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কাজ বাস্তবায়ন করে ২০৪১ সালে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করবে। তবে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা নানাভাবে আজ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শ্রমজীবী মানুষের সচেতন সংগঠিত শক্তি দিয়ে দেশের বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রতিহত করতে জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রতিটি নেতাকর্মী রাজপথে আছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে পুনরায় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ– এই হোক মহান মে দিবসের অঙ্গিকার।

দুনিয়ার মজদুর এক হও
জয় বাংলা- জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

পহেলা মে'র তাৎপর্য ঃ বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা

আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
বীর মুক্তিযোদ্ধা
সাধারণ সম্পাদক,
জাতীয় শ্রমিক লীগ

একটি দেশের উৎপাদন, উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অপরিসীম। কারণ, তারাই তাদের মেধা ও কায়িক শ্রম দিয়ে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখেন। কিন্ত দু:খজনক হলেও সত্য তারাই বঞ্চিত, শোষিত, নিগৃহীত। এমন একটা সময় ছিলো, যখন শ্রমিকরা মালিকের ইচ্ছের পুতুল হয়ে কাজ করতো। কাজের নির্দিষ্ট কোন সময় ছিল না, শ্রমের ন্যায্য মূল্য ও দেয়া হতো না, এমন কি নির্যাতনের কবলেও পড়তে হতো শ্রমিকদের। নিজ অধিকারের কথা বলা ছিল, অলিক কল্পনা। হ্যাঁ, এমনই এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রত্যয়ে ১৮৮৬ সালের পহেলা মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা আত্মাহুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিল শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার। কর্মক্ষেত্রে মানবিক পরিবেশ, শ্রমের উপযুক্ত মূল্য ও দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে রক্তক্ষয়ী এ আন্দোলনের দিনটি সময়ের ব্যবধানে হয়ে গেল শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে মুক্তির দিন-বিশ্ব শ্রমিক দিবস। বিশ্বের সব শ্রমিক এক কাতারে দাঁড়িয়ে নিজেদের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

অধিকারহারা বাঙালি জাতির শোষণ-বঞ্চনার আন্দোলনের দিক নির্দেশক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথার্থই শ্রমিক বান্ধব ছিলেন। আর তাই তিনি জাতিসংঘে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, "বিশ্ব আজ দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত- আমি শোষিতের পক্ষে"। সত্যি বলতে কি তিনি আজীবন শোষিত-বঞ্চিত ও মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর সেই আন্দোলন সংগ্রামকে সফলতার দিকে নিয়ে গেছেন দেশের শ্রমিক শ্রেণি। তিনি তাদের সে অবদানের কথা ভুলেননি। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে পহেলা মে-কে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয়ভাবে মে দিবস পালনের মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ বছরই তিনি শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি পরিত্যাক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষক, শ্রমিক ও আপামর জনতাকে সাথে নিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেন তখনই স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের মদদে তাঁকে স্ব-পরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে সকল উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকা স্তব্ধ হয়ে যায়। অভাগা যে দিকে তাকায়, সাগর শুকিয়ে যায়। বিশ্বকবির এ বাণীর মতোই দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণ যে তিমিরে ছিলো, সে তিমিরেই রয়ে যায়। জগদ্দল পাথরের মতো জাতির ওপর চেপে বসে উর্দ্দিপরা তথাকথিত গণতন্ত্র। যার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা আন্দোলন সংগ্রাম করে গণমানুষের নেত্রী হয়ে ওঠেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানে আত্মপ্রত্যয়ী হন।

তিনি বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়তে 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'রূপকল্প-২০৪১' ঘোষণা করেন। দেশের জনগণ তার এ রূপকল্প বাস্তবায়নে তাকে সমর্থন জানায় এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহৎ ঐতিহ্য সব সময় সমুন্নত রেখেছেন, ঠিক তেমনি তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদার কথা কখনো ভোলেননি। তিনি বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানা গুলো পর্যায়ক্রমে চালু করে বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করেছেন। সহজ করেছেন বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ ও তাদের রেমিটেন্স দেশে পাঠাবার পথ। দেশের পোশাক শিল্পসহ ৪১ টি শিল্পখাতের শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরি নির্ধারণ করেছেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ আধুনিক ও যুগোপযোগি করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন-২০১৩ প্রণয়ন করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করেছে শেখ হাসিনার সরকার। দেশের শিশু শ্রম নিরসনে জাতীয় শিশু শ্রম নীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছেন। শুধু তাই নয় নারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক নিরাপত্তারও যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুধু কল-কারখানার শ্রমিক নয়, কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে কৃষি শ্রমিকদের জন্য তার উদ্যোগও ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে।

কৃষক শ্রমিক তথা ভূমিহীনদের বিনা জামানতে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ও মাত্র ১০/- (দশ) টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা, শ্রমজীবী ও দরিদ্র দুঃখী মানুষের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করতে সামাজিক নিরাপত্তার আওতা জোরদার করা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রভৃতি অব্যাহত রাখা, দরিদ্রদের ঘরে ঘরে বিনা মূল্যে সোলার বিদ্যুৎ বাতি সরবরাহ, কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা এবং বিনামূল্যে বই সরবরাহ করে শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন।

জননেত্রী দেশরত্ন বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন চিন্তা ও গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তার 'ভিশন-২০২১' আজ বাস্তবে রূপ লাভ করতে যাচ্ছে। তার যথাযথ পরিকল্পনা ও সঠিক বাস্তবায়ন আজ বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে এসেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) উন্নয়ন নীতি কমিটি (সিডিপি) তাদের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশকে উত্তরণের যোগ্য বলে ঘোষণা দেয় আমাদের অহংকারের মার্চ মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিনে। মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এ তিন সূচকের যে কোন দু'টিতে উত্তীর্ণ হলে যে কোন দেশ এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। আর বাংলাদেশের জন্য সুখবর হলো, বাংলাদেশ তিনটি সূচকেই এগিয়ে রয়েছে। আশা করা যায়, 'ভিশন ২০৪১' আমাদের উন্নত দেশের তালিকায় নিয়ে যাবে। দেশের জনগণ পাবে অর্থনৈতিক মুক্তি, দেশ হবে স্ব-নির্ভর।

এখন প্রয়োজন নতুন নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন ও আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সার্থক ব্যবহার। সেই সাথে সমৃদ্ধ শক্তিশালী অর্থনীতি গড়তে শিল্পোদ্যোক্তা, মালিক-শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রয়াসও খুব জরুরী। আর মে দিবসের সাথে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, স্বার্থ ও কল্যাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আসুন, মহান মে দিবসের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মালিক-শ্রমিক পরস্পর সু-সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা ঘোষিত উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার মাধ্যমেই শিল্প বিকাশ সম্ভব

ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম খান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

মহান মে দিবস-যুগ যুগ ধরে শ্রমজীবী মানুষের কাছে অমর হয়ে থাকবে। মে দিবস প্রকৃত পক্ষে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণীর শোষনমুক্তির বা বঞ্চনার অবসানে সুদীর্ঘ যাত্রাপথে প্রথম পদক্ষেপের দিন। ১৮৬১ সালের ১ মে আমেরিকার শ্রমিকরা হে মার্কেটে সে যুগের বৃহত্তম শ্রমিক ধর্মঘটের আয়োজন করেছিল মূলত ৮ ঘন্টা শ্রম, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম ও ৮ ঘন্টা বিনোদনের দাবীতে। তৎকালীন মার্কিন সরকার এবং শিল্প মালিকপক্ষ শ্রমিকদের এই দাবী দাওয়া, এই আন্দোলনকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। পুলিশ এবং মালিকদের পেটোয়াবাহিনী নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর নৃশংসভাবে আক্রমন চালিয়েছিল, রক্ত ঝরিয়েছিল। হে মার্কেটের শ্রমিকদের রক্তরাঙ্গা পতাকা হাতে নিয়ে ১৩২ বছর ধরে পৃথিবীব্যাপী শ্রমিকরা শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগ্রামের নতুন নতুন অধ্যায় রচনা করে চলেছে।

নানা উত্থান-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন আজ এক বিশেষ সন্ধিক্ষনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজও শ্রমিকরা প্রায় সময় তাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের শ্রম থেকেই মালিকরা মুনাফা ভোগ করে। তবে শ্রমিকেরা কোন কিছুতেই হার মানেনা। বরং ন্যায্য মজুরি এবং অধিকার আদায়ে সংগ্রামের পথ ছাড়া তাদের সামনে বিকল্প কিছু থাকেনা। তারা ধুকে ধুকে মরে, কিন্তু মৃত্যুভয়ে লড়াই সংগ্রামের কাফেলা থেকে দূরে সরে যায়না। এটাই শ্রমিক শ্রেণীর বড় বৈশিষ্ট্য। শ্রমিকদের এই অকুতোভয় অভ্যন্তরীন শক্তির দিক টাই মে দিবসে প্রবলভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের শ্রমিক শোষণ-বঞ্চনার যাতাকলে কোথাও পিষ্ট হলেও দেশে সেভাবে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছেনা। যদিও আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য রয়েছে, আমাদের দেশের শ্রমিকরা তাদের দাবী দাওয়ার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও বিরাট ভূমিকা পালন করে এসেছে। ১৯৬৬ সালে স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় মনু মিয়ার আত্মাহুতি স্বাধীনতার আন্দোলনের সুচনায় একটি মাইলফলক।

১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে শহরে যেমন মানুষের ঢল নেমেছিল ঠিক তেমনি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরাও ঘেরাও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের দাবী আদায়ে বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। এই ঘেরাও আন্দোলন তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। এটাও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা ধারা হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে।

শ্রমিক বাঁচাও, শিল্প বাঁচাও দেশ বাঁচাও এই শ্লোগান নিয়ে শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সুস্থ ধারার শ্রমিক আন্দোলনে যারা বিশ্বাসী তারা সব সময় সচেতন। বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনের একটি ঐতিহ্য আছে। তারা শ্রমিকদের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি একটি উন্নয়ন এবং প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে আসছে। বিগত ৮০'র দশকে উগ্র মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ব্যতিত গণতান্ত্রিক এবং বামধারায় বিশ্বাসী প্রথমে ৬টি পরে শ্রমিক আন্দোলনের মূল স্রোতধারার ১১টি জাতীয় ভিত্তিক শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা হিসেবে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) গঠিত হয়েছিল। ক্ষমতা জবরদখলকারী সামরিক স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলে স্বপ্নের নেতৃত্বে একাধিক ঐতিহাসিক ও সফল শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।

শ্রমিকদের অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে হবে। আদর্শিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ছাড়া শ্রমিক আন্দোলনকে সঠিক সুস্থ ধারায় পরিচালিত করা যেমন সম্ভব নয়। পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হলে শ্রমিকরা তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। তবে রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে নয় অর্থাৎ নিরঙ্কুশ দলীয় প্রভাব মুক্ত থাকা বাঞ্চনীয়। মননে আদর্শিক রাজনৈতিক চিন্তা কিন্তু কর্মে দলীয় প্রভাবমুক্ত শ্রমিক আন্দোলন, এটাই হওয়া উচিত শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য।

একথা ঠিক যে, স্বাধীনতার আগে ১৯৬৬-৬৯ সালে এবং স্বাধীনতার পরে ১৯৮৪-৮৫ সালে এমনকি ১৯৯৪ সালে যেভাবে শ্রমিক আন্দোলন চলছিলো, এখন তা নেই। অনেকে মনে করেন, এটা বর্তমান শ্রমিক নেতৃত্বের দুর্বলতা। আমি মনে করি, এটা ঠিক নয়। শ্রমিক আন্দোলনে সব সময় সুবিধাবাদী ধারার কিছু নেতা থাকেন। এদের কারণে শ্রমিক আন্দোলনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সত্য কিন্তু সার্বিক বিবেচনায় শ্রমিকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে উক্ত সুবিধাবাদী ধারার শ্রমিক নেতারা আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয় না যা ১৯৮৪-৮৫ সালে ও বাংলাদেশে উত্তাল শ্রমিক আন্দোলনের ফলে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে তদানিন্তন স্বৈরশাসক শ্রমিকদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয় যার ধারাবাহিকতা চলে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। তখন বাংলাদেশে শিল্পাঞ্চলগুলো ছিল মূলত রাষ্ট্রায়ত্ত খাত নির্ভর। কিন্তু পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংক আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশনে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত হ্রাস পেতে থাকায় সংগঠিত সেক্টরের শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পাশিপাশি অসংগঠিত সেক্টর গড়ে উঠার কারণে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে।

শ্রমিক আন্দোলনের গতি সঞ্চারের জন্য প্রয়োজন অধিকার সম্পর্কে ধারণা ও সচেতন করে তোলা। এজন্য সংগঠন করতে হবে। আইএলও-র '৮৭ ও ৯৮ সনদ মোতাবেক দাবি আদায়ে শ্রমিকদের সচেতন করতে হবে। শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন হলো শ্রমিক আন্দোলনের প্রাণ বা পূর্বশর্ত। একইভবে এই ইউনিয়ন শিল্প বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইউনিয়ন কোন সময়ই শিল্প উন্নয়নের অন্তরায় নয়। মালিক ও সরকারের কাছে আমাদের দাবী থাকবে শিল্পের স্বার্থেই ইউনিয়ন গড়ার সুযোগ দিন। এক্ষেত্রে শিল্পকে ইতিবাচক পথে পরিচালনা এবং শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবির বিষয়ে একটা ফয়সালা খুঁজে পাওয়ার জন্য মালিক বা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বৈধ প্রতিনিধি পাবে, যারা শিল্প ও শ্রমিক স্বার্থ উভয় দেখবে।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

"মহান মে দিবস - শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদার স্বীকৃতি দিবস "

এ্যাডভোকেট মো: দেলোয়ার হোসেন খান
সাবেক এম.পি
সাধারন সম্পাদক
বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন-বিএলএফ

মহান মে দিবস আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস। ইতিহাসে এটি মে দিবস হিসাবেই চিহ্নিত। এই দিবসটি দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য আনন্দের তথা সার্বজনীন প্রাপ্তির দিন। কারণ, অনেক রক্তাক্ত সংগ্রাম ও ত্যাগ তিতিক্ষার তিমির অধ্যায় পেরিয়ে শ্রমজীবী মানুষ তাদের অধিকার ও মর্যাদার যে আইনগত স্বীকৃতি লাভ করেছে ,এটি তারই স্মারক দিবস। তাই এটি একটি ঐতিহাসিক দিবস সারা বিশ্বের শ্রমের প্রতি মর্যাদার স্বীকৃতি ও বিশ্ব মানবতার স্মরণীয় ইাতহাস। ১৮৯০ সালথেকে প্রতিবছর পহেলা মে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। "দুনিয়ার মজদুর এক হও" দিনের আন্তর্জাতিক শ্লোগান ।১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো নগরীতে শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘন্টা কর্মসময় নির্ধারণ এবং ন্যায্য মুজুরির দাবিতে শুরু করেন সর্বাত্নক ধর্মঘট। শ্রমিকদের এ আন্দোলন ৩ ও ৪ মে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ,এই দুই দিন শিকাগো নগরীতে ১০ শ্রমিক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। গুলিতে আহত হয় বহু শ্রমিক। বহু শ্রমিককে পাঠানো হয় জেলে। গ্রেপ্তারকৃত শ্রমিকদের ৬ জনকে পরে ফাঁসি দেয়া হয়। একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় কারাগারে। শ্রমিক শ্রেনীর গৌরবময় সংগ্রামেরই স্মারক এই মে দিবস। একই সংগে তা শ্রমিকদের সংগ্রামের বিজয়োৎসব ও নতুন শপথ গ্রহনের দিন। সকল দেশে এ দিবস পালিত হচ্ছে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে। ইউরোপ-আমেরিকায় সেকালে শ্রমিকদের খাটানো হতো ১০-১২ ঘন্টা। তবে,তখনও কোথাও কোথাও শ্রমিকদের ১৫ থেকে ২০ ঘন্টা পর্যন্তও কাজ করতে হতো । ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের দাবি শ্রমিকদের অনেক দিনের। পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর ৮ ঘন্টা কাজের দাবি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এই দাবী আইএলও সনদেরও অনুমোদন পেয়েছে । আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণী উন্নত দেশগুলোর শ্রমিকদের মতো কাজের পরিবেশও পায় না ,তেমন উন্নত সুযোগ-সুবিধাও তারা পায়না। আমাদের শ্রমিকদের সামগ্রিক অবস্থা ভাল না। ভাল নয় তদের অর্থনৈতিক অবস্থা। অন্যদিকে ,বহু শ্রমিক বেকারত্বের শিকার , অনেক শ্রমিকের মজুরী সামান্য। অনেককেই অসুস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হয়। আইএলওর বিধান অনেক স্থানেই পালন করা হয়না। বিশেষ করে নারী ও শিশু শ্রমিকদের প্রসঙ্গে এ কথা বলা যায়। আমাদের দেশে এখনও অগণিত শিশু নানা ধরনের কষ্টকর শ্রমের কাজে নিয়োজিত। দু'মুঠো অন্নের জন্য ওদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে। শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত আইএলও' র সনদ আজ পর্যন্ত বহু দেশে পূর্ণরূপে কার্যকর হয়নি। আমাদের দেশে শ্রমিকদের অধিকার সকল ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, অস্থায়ী শ্রমিক এবং দিনমজুর পর্যায়ের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তো বটেই পোশাকশিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । অনেক পোশাক শিল্পকারখানায় আট ঘন্টার অধিক সময় কাজকরানোর এবং ওভারটাইম না দেয়ার অভিযোগ রয়েছে । অথচ এই পোশাক শিল্প আমদের প্রধান একটি রফতানিমুখী শিল্প,এই শিল্পই আমাদের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। এই শিল্পকে সচল রাখেন যাঁরা তাদের অনেকেই বিশ্বস্বীকৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত। শ্রমিকরা প্রত্যেকে ন্যায্য মজুরি পেলে , তাদের জীবনমান উন্নত হলে একদিকে যেমন কমে আসবে শ্রমিক- অসন্তোষ,অন্যদিকে, তেমনি শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে, যার জন্য সামগ্রিকভাবে বাড়তে পারে শিল্পোৎপাদন। আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও ক্রমান্বয়ে অবক্ষয়ের শিকার হয়েছে। অসৎ ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব। এই ধারাটিকে বর্জন করতে হবে । গড়ে তুলতে হবে সুস্থ্য ও সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মহান মে দিবসে মেহনতি মানুষকে এই অঙ্গীকারই নিতে হবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে , আমরা সবাই শ্রমিক ,কারণ শ্রমের কর্ম কৌশলের আদলে শ্রমের প্রকার ভেদ থাকতে পারে। তবে পার্থিব জগতে আমরা নানাবিধভাবে অবশ্যই শ্রমিক। তাই এই মহান মে দিবসে আমাদের সবারই উচিত একে অন্যের শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করা। তাহলেই আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে এই ঐতিহাসিক মে দিবসের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবো।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

ঐতিহাসিক মে দিবসের প্রত্যয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে

আবদুল মতিন মাষ্টার
সাবেক সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি
সদস্য, শ্রম আদালত -১, ঢাকা
উপদেষ্টা- BILS

উন্নয়ন শব্দটির সাথে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রথমতঃ যে মানুষদের ত্যাগ ও শ্রম জড়িত, নিঃস্ব-অবহেলিত সে সকল মানুষেরা ইতিহাস হয়ে থাকেনা। তবে তারা ইতিহাস রচনা করে। মে দিবসের ইতিহাস তাই মূলতঃ উন্নয়নের ইতিহাস। বর্তমান বছরটি যেহেতু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের বছর, তাই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় বর্তমান শ্রমবান্ধব সরকারের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। ২০১৮ সালের মে দিবসে এটাই হবে এ দেশের শ্রমজীবী মানুষের অঙ্গীকার।

এটা স্বীকৃত সত্য যে, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নিয়ে প্রতি বছরই মে আসে নতুন সব সম্ভাবনা নিয়ে। নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমিকের বছরটা তাই যেন মে মাসকে ঘিরে আবর্তিত হয়। নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন এক বাংলাদেশ। শ্রমিক বান্ধব রাষ্ট্র, শ্রমবান্ধব রাষ্ট্র ব্যবস্থা, শ্রমিক বান্ধব সরকার, শ্রমিক বান্ধব সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্বপ্নসব প্রতিফলিত হয়ে থাকে এই মে কে ঘিরেই। বিশেষতঃ সময়ের ক্যানভাসে জনসংখ্যা অনুপাতের সুবিধা (Demograhic Dividend) নিয়ে বাংলাদেশ আজ সেই দিনক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একই সাথে বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার সুনিপুণ নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর জন্য আশার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। রূপকল্প ২০২১' কে সামনে রেখে ২০৪১' এ একটি উন্নত বাংলাদেশ এ শুধুমাত্র শ্রমিকের স্বপ্ন নয়, পুরো জাতি তাই নেতৃত্বের সঠিক নিশাণা পেয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনার পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আরোহন, সেই সাথে প্রথম মেয়াদে নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং শ্রম আইন ও শ্রম বিধান প্রণয়ন ও ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণের মধ্য দিয়ে এবারের মে দিবসটিও বাংলাদেশের নিপীড়িত শ্রমিক-জনতার জন্য একটি সুখকর সংবাদ নিঃসন্দেহে এবং এটি খুবই সংগত এই কারণে যে, শতাব্দী উন্নয়ণ লক্ষমাত্রা পেরিয়ে আজ আমরা টেকসই উন্নয়ণ লক্ষমাত্রার দিকে ধাবিত হচ্ছি। ২০২০ সালে আমরা উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী, এবং ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। এই আনন্দঘন বছরগুলোকে মহিমান্বিত করতে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিকে সংগে রেখে শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা অর্জন একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ঐতিহাসিকভাবে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে সংঘটিত হে-মার্কেট ঘটনার স্মরণে মে দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। হে-মার্কেট ঘটনাটি শুধুমাত্র একদিনের কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সুদীর্ঘ উনিশ শতাব্দী ধরে ঘটে আসা শ্রমিক আন্দোলনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে এ দিনটাতে। দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে বীর বাঙালীর দীর্ঘ সংগ্রামের সর্বব্যাপি অধ্যায়টি যেমন পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছিল ৭১-এ। একইরকমভাবে উনিশ শতকের নিপীড়িত-নির্যাতিত, শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর দাবি আদায়ের গৌরবপূর্ণ অধ্যায় হয়ে আছে হে-মার্কেট আন্দোলন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব উদাহরণ তৈরী হয় ১ মে ১৮৮৬ তে। দাবি আদায়ের জন্য শিকাগোর শ্রমিক শ্রেণী কর্ম বিরতি পালন করে পরবর্তী দিনগুলোতে যা শ্রমিক আন্দোলনে গভীর রেখাপাত করে। ৩ মে', বুধবার, পুলিশ শিকাগোর মেক' কমিক রিপার কোম্পানিতে দাবি আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর গুলি চালালে ছয়জন শ্রমিক মারা যায়, আহত হয় অনেকে। সংঘটিত এ বর্বর ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন ৪ তারিখ বৃহস্পতিবার হে-মার্কেট স্কোয়ারে আয়োজিত এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশে পুলিশ আবারো বর্বরোচিতভাবে হামলা চালায়। পুলিশসহ এত সাতজন শ্রমিক নিহত হয়। আহত হয় অগুনিত। পরবর্তী বছরগুলোতে পুলিশ আন্দোলনকারি অসংখ্য শ্রমিককে গ্রেফতার করে। বিচারের নামে বিভিন্ন প্রহসনের মাধ্যমে পাঁচজন শ্রমিককে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটির স্মরণে ১ মে'-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষনা করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১ মে' কে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষনা করেন। পাকিস্তান আমলে মে দিবসের ছুটি ছিল না। ১৯৭২ সালের ২২ শে জুন বাংলাদেশ International Labour Organisation (ILO)'র সক্রিয় সদস্য পদ লাভ করে। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার এর ILO'র মৌলিক সাতটি কনভেনশনসহ মোট ৩৩টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। ILO 'র ঢাকা অফিসের কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৩ সালের ২৫ জুন। বাংলাদেশ আজ অবধি মোট ৩৫টি ILO Recommendation অনুসমর্থন করেছে। কোন প্রকার দাবিনামা পেশ করার পূর্বেই বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম মজুরি কমিশন ও বেতন কমিশন গঠন করে তাদের মজুরি ও বেতনভাতাদি পরিশোধ করেছিল। তারপর

বাংলাদেশের ইতিহাস বঞ্চনার ইতিহাস। তবে ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এলে সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ILO Convention বাস্তবায়নে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। মহাজোট সরকার তার মন্ত্রীসভা গঠন করার অব্যাবহিত পরই নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী 'সরকার, শ্রমিক ও মালিক' এই তিনের সমন্বয়ে ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শক কমিটি (Tri-partite Consultant Committee) পুনর্গঠনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন সংস্কারে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহন করে। শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় ১৯টি শ্রমিক ফেডারেশন থেকে ২০ জন, মালিক পক্ষ থেকে ২০ জন এবং ২০ জন সরকারি প্রতিনিধি সদস্য সমন্বয়ে ৬১ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি (TCC) শ্রমিকদের স্বার্থ ও শিল্প উৎপাদনে নিরলসভাবে কাজ করে। কমিটি শ্রম আইন, শ্রমনীতি ও বিধি এবং শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাসময়ে সরকারকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে যায়। সরকার ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে শ্রমিক পক্ষের ১২ জন, মালিক পক্ষ থেকে ১২ জন এবং ১০ জন সরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট শ্রম আইন সংশোধন কমিটি গঠন করে।

২০০৬ সালের শ্রম আইনকে Ratify (সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন) করে একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন বিলটি 'সংশোধিত শ্রম আইন -২০১৩' নামে ২০১৩ সালের ১৫ জুলাই সংসদে পাশ হয়। এরই মধ্যে TCC এর সুপারিশ অনুযায়ী ২০১২ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার মহান জাতীয় সংসদে শ্রমিক স্বার্থের অনুকূলে নতুন শ্রমনীতি পাশ করে এবং 'বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা-২০১৪' চুড়ান্ত করণের লক্ষে কাজ করে। ১৯৮১ সালের পর সময় ও বাস্তবতা বিবর্তিত হলেও আর কোন নতুন শ্রমনীতি ও বিধি প্রণীত হয়নি। বর্তমান সরকারই এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই মধ্যে আহত-নিহত শ্রমিক কর্মচারীদের সহায়তার জন্য শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সমন্বয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন' পূণর্গঠন হয়েছে। মহান জাতীয় সংসদে এ বিষয়ে একটি আইন পাশ হয়েছে যে প্রত্যেক মালিক তার লভ্যাংশের ৫ শতাংশ কল্যান ফাউন্ডেশনে অনুদান দিতে বাধ্য থাকবে। এভাবে 'শ্রমিক-মালিক-সরকার' এ তিনের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়া বর্তমান সরকার চালু রেখেছে। উল্লেখ্য, মহাজোট সরকারের সময়েই ২০০৯ সালের জুন মাসের ৩ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ILO র ৯৮তম Central Council এ বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতির আসন অলংকৃত করার সৌভাগ্য অর্জন করে।

বাংলাদেশের পক্ষে তৎকালিন শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশারফ হোসেন এম.পি সভাপতিত্ব করেন। সভায় ILO সদস্য ১৮৩ টি দেশের শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিক প্রতিনিধি ও সরকারি প্রতিনিধি (শ্রমমন্ত্রী / প্রতিমন্ত্রী পদ মর্যাদা সম্পন্ন) ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৭টি দেশের রাষ্ট্রপতি, ৯টি দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ৫টি দেশের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। দেশের দক্ষিন বঙ্গে সে সময় প্রলয়ংকারী ঘুর্নিঝড় আইলা'র কারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত থাকতে পারেন নি। তবে সভায় জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের পাশাপাশি জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি ভিডিও বক্তব্য প্রচার করা হয়। ILO -এর সেই সভায় শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যকার ত্রি-পক্ষীয় আলোচনার ভিত্তিতে শ্রমিক ও মালিকদের ন্যায়সম্মত স্বার্থ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির ঘোষনা দেয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা'র স্ব-উদ্যোগে তাঁর সরকার শ্রমিক-কর্মচারীদের কোন প্রকার আন্দোলন বা দাবি-দাওয়া ব্যতিরেকেই সরকারি কর্মচারিদের জন্য পে-কমিশন ঘোষনা করেছে যেটি ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়ে বর্তমান রয়েছে। একই সাথে সরকার 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠন করে জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের জন্য মজুরি নির্ধারণ করেছে যা উল্লেখিত ২০১৫ সালের ১ জুলাই থেকেই কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া বর্তমান মহাজোট সরকার বিগত সরকারসমূহের আমলে জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের বিভিন্ন বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ করেছে। সরকার এরই মধ্যে কয়েকটি জুট মিলসহ বিভিন্ন বন্ধ শিল্প-কারখানা চালু করেছে এবং পানির দামে যে সমস্ত মালিক এসব সরকারি সম্পত্তি ক্রয় করে বন্ধ রেখেছেন, তাদের ব্যর্থতার কারণে বন্ধ এসব কল-কারখানা সরকারি খাতে ফেরত এনে চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে। শ্রম-বান্ধব বর্তমান সরকার বিশ্বাস করে অসৎ মালিকদের হাত থেকে শিল্প-কারখানা রক্ষা করতে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে উৎপাদন বন্ধ রেখে যে সমস্ত শিল্প মালিকরা অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে শ্রমিক-স্বার্থ নষ্ট করেছেন এবং করছেন, তাদেরকে উপযুক্ত বিচার ও শাস্তির আওতায় আনা সরকারের সুস্পষ্ট বিবেচনায় রয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন ৪৩টি শিল্প সেক্টর চিহ্নিত করে সরকার ইতোমধ্যে গার্মেন্টসসহ ৪১টি সেক্টরের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষনা করেছে। ৫টি সেক্টরের জন্য ন্যূনতম মজুরি পূন: নির্ধারণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে National Productivity Committee (NPC) কে আরো সক্রিয় ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়তা করে আসছে। উৎপাদন সম্পৃক্তিতে বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে এ কমিটি একাগ্রভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে বিদ্যমান ৭ টি শ্রম আদালত পূনর্গঠিত হয়েছে। সরকারের বিজ্ঞ ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে এই শ্রম আদালতগুলো সূচারুভাবে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে কাজ করে চলছে। শ্রমিক ও মালিকদের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে এবং বিচার প্রার্থীদের কোর্টে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজনে শিল্পঘন এলাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে এ ধরণের আরো আদালত প্রতিষ্ঠার ব্যাপক চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বিশেষতঃ নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর,বগুড়া এবং কুমিল্লার মতো শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান করা প্রয়োজন। ইতোমধ্যে বিভাগীয় শহর সিলেট, রংপুর ও বরিশালে শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কোন নির্দিষ্ট এলাকায় বিরাজমান শ্রমিক অসন্তোষ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে নিরসনকল্পে সরকার এরই মধ্যে শিল্পঘন এলাকায় স্থানীয় সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টা করে জেলা পর্যায়ের নেতৃত্বে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বয়ে Crisis Management Committee (CMC) গঠন করেছে। শিল্পঘন এলাকায় শ্রমজীবীদের জন্য আবাসন (Dormitory), হাসপাতাল, কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের সুবিধার্থে শিশুদের জন্য ডে--কেয়ার সেন্টারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিতে আরো নজরদারি প্রয়োজন।

শিল্প-কারখানাগুলোতে যথাযথভাবে বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার জন্য ETP স্থাপনসহ পরিবেশ সুরক্ষার মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া চামড়া শিল্প (Tannery), গার্মেন্টস ও ঝুঁকিপূর্ণ সকল কল-কারখানা শহর থেকে সরিয়ে যাবতীয় অবকাঠামোগত সুবিধাসহ যথা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, টেলিফোন, ইন্টারনেট ও যাতায়াত এবং আবাসনের সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট শিল্প-পার্ক গড়ে তুলতে হবে। হাজারিবাগ ট্যানারি শিল্পকে সাভারে স্থানান্তরের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার এরই মধ্যে নগরীর পরিবেশ সমুন্নত রাখার প্রত্যয় দেখিয়েছে। এছাড়া সরকার শিল্প পুলিশ গঠন করে ইপিজেডসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এই ক্ষেত্রে সরকারকে আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে শিল্প পুলিশ যেন শিল্প ও উৎপাদন সহায়ক হয়, কখনোই যেন মালিক শ্রেণীর শোষন-নিপীড়নের হাতিয়ার না হতে পারে। সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তি-মালিকানাধীন অন্যান্য সেক্টর চিহ্নিত করে সেগুলোর জন্যও ন্যুনতম মজুরি ঘোষনা সরকারের বিশেষ বিবেচনায় রয়েছে।

শ্রম আইন' ২০০৬ অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকুরির বয়স সীমা ছিল ৫৭ বছর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ মে ২০০৯ সালে শ্রমিকদের চাকুরির বয়সসীমা ৬০-এ উন্নীত করার ঘোষনা দেন যা ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে। কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এ বয়সসীমা ৫৯ করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাসহ তাদের পরিবার ও পোষ্যদের চাকুরির বয়সসীমা পূর্বেকার ৫৭ থেকে ৫৯ ও পরবর্তীতে আরো এক বছর বাড়িয়ে ৬০-এ উন্নীত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষতঃ এ সীমা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। শুধুমাত্র ন্যায্য মজুরি (Proper Wage), শোভন কাজ (Decent Work) এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার (Trade Union Rights) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিল্প-কারখানায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। ২০০৯ সালে গঠিত 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনে'র সুপারিশ অনুযায়ী পে কমিশন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়। আর তাই ২০১৫ সালের জুলাই থেকে মজুরি কমিশনের সুপারিশও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের দাবি রাখে। আগামি নির্বাচনী ইশতেহারে বর্তমান সরকার এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ঘোষনা রাখবে আশা করা যায়।

সরকার ইতঃমধ্যে সরকারি চাকরিতে যোগদানের বয়স সাধারণের জন্য ৩০ ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩২ করেছে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় সেশনজটসহ নানাবিধ কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী সরকারি-বেসরকারি চাকরি কিংবা বি.সি.এস -এ অংশ গ্রহন করতে পারছেনা। এতে করে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। চাকরির বয়স সীমা তাই ৩৩-এ উন্নীত করা এখন সময়ের দাবি। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এ বিষয়ে ২০১২ সালে সংসদেও আলোচনা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ০৬ লক্ষাধিক সরকারি চাকরির পদ শূন্য রয়েছে। চাকুরির বয়সসীমা ৩৩-এ উন্নীত করার মাধ্যমে এ সকল শুন্যপদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব। ২০১২ সালে মে দিবসের এক আলোচনায় এ বিষয়ে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে চাকুরির বয়সসীমা ৩৩ করার দাবি জানিয়েছিলাম। সরকারি চাকুরিতে কোটা প্রথার সংস্কারও আজ একটি সময়ের দাবি। বর্তমান বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে সরকারি-বেসরকারি সকল পর্যায়ে ন্যুনতম জাতীয় মজুরি নির্ধারণ সরকারের একটি অত্যাবশ্যক কর্ম।

মজুরি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পাঁচ বছর পরপর পে কমিশন ও মজুরি কমিশন গঠন না করে স্থায়ী পে ও মজুরি কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। বাজার দর বিবেচনায় উভয় কমিশনকে প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য মজুরি ও বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ এবং পূণঃ নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিতে হবে। মজুরি নির্ধারণে উভয় কমিশনের সুপারিশ একই সময়ে দাখিল ও বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক।

সরকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ এবং ক্রমান্বয়ে শিশুশ্রম বন্ধে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারিদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার ২৩,০০০ রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ সহ মোট ৩৭৬৭২ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি বেতন কাঠামোর আওতায় এনেছে। ফলতঃ প্রায় ৩,৫০,০০০ শিক্ষকের চাকুরি সরকারি হয়েছে। সরকার ৩৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশ প্রহরী নিয়োগ করবে পর্যায়ক্রমে যারা সরকারি বেতন কাঠামোর আওতায় আসবেন। সংবাদমাধ্যমসহ বিভিন্ন পেশাজীবিদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সরকার এরই মধ্যে সংবাদপত্র শিল্পের জন্য নবম ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়নের তাগিদ দিয়েছে।

২০১৩ সালের নভেম্বরে সরকার পোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম মজুরি ঘোষনা করে। পোষাক শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশ ও উন্নয়ন বজায় রাখার স্বার্থে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পোষাক শিল্পের জন্য ৭টি ধাপে নির্ধারিত বেতন কাঠামো (সর্বনিম্ন ১নং গ্রেডে ৫৩০০ টাকা- ৭নং উচ্চ গ্রেডে ১৩৪০০ টাকা বেসিক) ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই কার্যকর করা হয়। পূণরায় পোষাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। তবে পোষাক শিল্পের অধিকতরঃ উন্নয়নের স্বার্থে সরকারগৃহীত অন্যান্য শ্রম আইনগুলোর বাস্তবায়ন অতি প্রয়োজন।

এ জন্য শ্রম দপ্তর ও ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্টের জনবল বৃদ্ধি করা আবশ্যক এবং শ্রমঘন অঞ্চলে এদের আরো শাখা অফিস খুলতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুযায়ী বিকল্প চাকুরির ব্যবস্থানা করে শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করতে ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংরক্ষণে সরকারি এই প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। গতিশীল নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে শ্রম আইন অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন আয়োজনে সরকারি এ প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সরকার বিশ্বাস করে, দেশের শিল্প আয়ের সবচেয়ে বড় খাত পোষাক শিল্পের ধারাবাহিক অগ্রগতি অত্যাবশ্যক। এই শিল্পে আমাদের দেশ গণচীনের পর ২য় অবস্থান রয়েছে। আমাদের প্রতিযোগি হিসেবে চীনের পরেই রয়েছে ভারত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়া। তবে আশার কথা, চীন এরই মধ্যে ভারি শিল্পে মনোনিবেশ করায় পোষাক শিল্পের বিদেশী ক্রেতারা ক্রমান্বয়েই বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছেন। তাই গার্মেন্টস শিল্পকে ঘিরে যেকোন দেশী-বিদেশী নাশকতামূলক আত্মঘাতি চক্রান্ত প্রতিহত করতে সরকারকে আরো সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের বৃহৎ এই খাতটিতে ৮০ ভাগই নারী। জিএসপিসহ অন্যান্য সুবিধাদি অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বার্থেই বেপজাসহ সকল ইপিজেড -এ এইসব অবহেলিত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারী শ্রমিকদের সুবিধার্থে এ সকল শিল্পে শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার, দুধ, বিস্কিটসহ বিনামূল্যে শিশু খাবার নিশ্চিত করা আবশ্যক। গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের জন্য রেশনিং প্রথা চালু করা বর্তমান মহাজোট সরকারের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল। এই সেক্টরের ক্রম-বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখতে সরকার এরই মধ্যে কিছু কিছু গার্মেন্টসে এ প্রথা চালু করেছে। পর্যায়ক্রমে এ সেক্টরের প্রতিটি ফেক্টরিতে রেশনিং প্রথা চালুর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তবে সকল শিল্প সেক্টরে যথাযথ উৎপাদন ও শ্রমিক স্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে সকল শিল্প-কারখানায় রেশনিং প্রথা চালু করা অতীব আবশ্যক হয়ে দাড়িয়েছে। সরকার শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Technical Training Centre (TTC) গুলোকে বিশেষ সক্রিয় করে তুলেছে। বর্তমানে দেশে মোট ৩৭ টি TTC রয়েছে। এগুলোর মধ্যে শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২৬ টি সেন্টারের ১৪টিতে ট্রেড কোর্স চালু রয়েছে। এগুলোকে আরো কার্যকর করে তুলতে শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, নতুন নতুন কোর্স চালু এবং জনবল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রবাসী শ্রমিকদের চাহিদা বিবেচনায় রেখে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেন্টারগুলোকে আরো সক্রিয় ও কার্যকর করে তুলতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিকদেরকে ইংরেজী, শ্রমিক আমদানিকারক দেশগুলোর স্থানীয় ভাষা ও মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজারকে বিবেচনায় রেখে আরবী ভাষায়ও প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন।

শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান ও ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রবাসী কল্যান মন্ত্রণালয়ের আওতায় আরো প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন করা সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন। বর্তমান প্রায় ৮৭ লক্ষ বাংলাদেশী শ্রমিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে। এ সকল শ্রমিকদের স্বার্থে এবং একই সাথে বিদেশ গমনে"ছু নতুন শ্রমিকদের সুবিধার্থে সরকার 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' এর কার্যক্রম শুরু করেছে। এ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশগামী শ্রমিকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের সু-ব্যবস্থা হয়েছে। যার ফলে এখন থেকে দালালদের প্রতারণায় জমি-জমা সব হারিয়ে বিদেশগামী কোন শ্রমিকের নিঃস্ব হবার সম্ভাবনা লুপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। শ্রমিকরা যাতে স্বল্প খরচে শুধুমাত্র বিমান ভাড়া দিয়ে বিদেশ যেতে পারে, সরকার সে প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে। মালয়েশিয়ায় মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫০,০০০ শ্রমিক পাঠানোর জন্য দেশব্যাপী রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মাত্র ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকায় বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যেজ্য শ্রমিক রপ্তানির জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, এর মাধ্যমে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাতীয় আয় রেমিটেন্স আরো বাড়বে। বাংলাদেশী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিদেশে প্রতিটি বাংলাদেশ মিশনে লেবার সহায়ক ডেস্ক চালু করা এবং নতুন নতুন শ্রম বাজার সৃষ্টি সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। গৃহ শ্রমিকদের (Domestic Worker) অধিকার সুনিশ্চিত করতে সরকার ২০১২ সালে ILO General Council-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন প্রণয়ণ করেছে। ILO-এর ধারা ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী Domestic Worker সহ সকল শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও স্বাধীনভাবে নেতা নির্বাচনের সুযোগ দেয়া সরকারের বিশেষ বিবেচনাধীন। দেশের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য উদীয়মান শিল্পখাত হচ্ছে ঔষধ শিল্প ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প । ঔষধ শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত ও দূরীভূত করে এ খাতটিকে পোষাক শিল্পের মতো বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরেকটি সুবিশাল খাত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে

এই সকল বিবেচনায় বলা যায়, বঙ্গবন্ধু তনয়া জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়নে বিশ্বাসী শ্রমিক-বান্ধব সরকার। ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিটি কল-কারখানায় ন্যায্য মূল্যের দোকান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঞ্চিত-অবহেলিত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংস্থান নিশ্চিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে এ প্রথাকে পূণরুজ্জীবিত করা আজ আমাদের সকলের সুমহান দায়িত্ব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসুরী জননেত্রী শেখ হাসিনা এই লক্ষ্যে নিরলসভাবে দিবা-রাত কাজ করে যাচেছন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি শ্রমবান্ধব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলা এখন আর নিছক শুধু স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ন্যায় এ আজ দিবালোকের মতোই দেদীপ্যমান হতে চলছে । একইভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আস্থাশীল বাংলার মেহনতি-শ্রমিক জনতা আশায় বুক বেঁধে আছে বর্তমান শ্রমিক-বান্ধব মুক্তিযুদ্ধের সরকার পদ্মা সেতুর মতই শ্রমিক স্বার্থে সুষ্ঠু পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

শোষনমুক্ত সুখি-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে। বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিগণিত করতে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যাবশ্যক এবং এর মধ্য দিয়েই 'ভিশন- ২০২১' এবং ২০৩০ সালের মধ্যে Sustainable Development Goal (SDGs) অর্জন সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণীকেও এ উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার সংগ্রামে একই কাতারে দাড়াতে হবে। আসছে একাদশ সংসদ নির্বাচনে শ্রমবান্ধব বর্তমান এই সরকারকে তাই পূণরায় নির্বাচিত করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় শ্রমিক শ্রেণী বরাবরই জননেত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিল। আগামী নির্বাচনেও শ্রমিক শ্রেণী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে, শোষিত-বঞ্চিত নিপীড়িত জনতার অধিকার আদায়ে বর্তমান এই সরকারকে আবারো পূণঃ নির্বাচিত করবে এই আশাবাদ রাখছি।

বাংলার মেহনতি জনতার জয় হোক
জয় বাংলা।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মে দিবসের চেতনা বাস্তবায়নে দেশরত্ন শেখ হাসিনা

ফজলুল হক মন্টু
বীর মুক্তিযোদ্ধা
কার্যকরী সভাপতি, জাতীয় শমিক লীগ

দৈনিক ৮ ঘন্টা কর্মদিবস এবং উন্নত কর্মপরিবেশের দাবিতে ১৮৮৬ সালের পহেলা মে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের ১১ হাজারেরও বেশি শিল্প কারখানার তিন লক্ষাধিক শ্রমিক শিকাগো শহরে জড়ো হয়ে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। ৩ মে রিপার কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়ে ৬ জন শ্রমিককে নিহত করে। এর প্রতিবাদে ৪ ঠা মে হে মার্কেট স্কোয়ারে বিশাল সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে পুলিশ গুলি চালালে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ জন শ্রমিক ও ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী শ্রমিক নেতাদের পুলিশ গ্রেফতার করে। প্রহসনমূলক বিচারে ৪ জন শ্রমিক নেতার ফাঁসি হয়। শ্রমিক নেতাদের এই বিসর্জন শ্রমিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে এক পর্যায়ে মালিকরা শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৮৮৯ খ্রি. প্যারিসে অনুষ্ঠিত ফেডারিক এঞ্জেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন ১৮৯০ খ্রি. হতে প্রতি বছর মে মাসের প্রথম দিনকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত না হলেও ১৮৯০ সাল থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শ্রমিক শ্রেণি পহেলা মে 'মে দিবস' পালন করে আসছে। রুশ বিপ্লব পশ্চিমা দেশগুলোতে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের ফলে প্রথমে গুটিকয়েক দেশ পহেলা মে-কে শ্রমিক দিবস হিসেবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ পহেলা মে-কে সার্বজনীন শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসক- শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তঝরা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে পহেলা মে রাষ্ট্রীয়ভাবে মে দিবস পালন শুরু করেন। একই সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় দিবসটিকেও সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত বঞ্চিত ও মেহনতি মানুষের পক্ষে লড়াই করেছেন। তাই তিনি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দম্ভভরে উচ্চারন করেছেন, 'বিশ্ব আজ দু'ভাবে বিভক্ত একদিকে শোষক, আরেক দিকে শোষিত- আমি শোষিতের পক্ষে'। তিনি ভুলে যাননি, ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ছ'দফা দাবীতে আহুত প্রথম হরতালে আদমজী, টঙ্গী ও তেজগাঁওয়ের সংগঠিত শ্রমিকরাই প্রথম লাল পতাকা হাতে ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে ঢাকার দিকে আসতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ দিয়েছেন। বাঙালির স্বাধিকার ও মুক্তির জন্য প্রথম আত্মদান করেছিলেন শ্রমিক মনু মিয়াসহ অন্তত: ১০ জন শ্রমিক। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানেও ছাত্রদের পাশাপাশি শ্রমজীবি মানুষই ছিলেন চালিকাশক্তি। একারণেই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেন নি, মুক্তির আহবানও জানিয়েছিলেন। তিনি প্রথমেই বলেছিলেন, তার ডাকে সাড়া দিয়েই বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণি-অসহযোগ আন্দোলনে দেশের সব কল-কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিল। তাঁর ডাকেই হাজার হাজার শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি মানুষ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পরিত্যাক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনৈতিক শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি একটি দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি। বাংলার আপামর শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ করতে প্রয়োজন অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন। তাই তিনি International Labour Organization (ILO) এর মৌলিক ৭টি কনভেনশনসহ মোট ৩৩টি কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে শ্রমিকদের জন্য মজুরি কমিশন ও সরকারি চাকুরি জীবীদের জন্য বেতন স্কেলকে ১০টি বেতন গ্রেডে পুর্নবিন্যাস করেন। বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষক, শ্রমিক ও আপামর জনতাকে সাথে নিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম শুরু করেন তখনই স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের মদদে তাঁকে স্ব-পরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। দেশে জগদ্দল পাথরের মতো জেকে বসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী রাজনৈতিক অপশক্তি, বিএনপি-জামায়াত ও স্বৈরাচার খ্যাত এরশাদ শাহী।

দেশের অর্থনীতিতে দেখা দেয় মন্দাভাব। কাগজী উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলেও বন্ধ হয়ে যেতে থাকে একের পর এক কারখানা। ক্ষমতাসীনরা সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভুয়া উন্নয়ন ফিরিস্তি নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে থাকে। দূর্নীতি আর স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অনিয়মই হয়ে যায় নিয়ম। বন্ধ করে দেয়া হয় প্রাচ্যের ডান্ডি নামে খ্যাত আদমজী জুট মিল। গোল্ডেন হ্যান্ড শেকের মাধ্যমে বেকারত্বের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত করা হয় শ্রমিক শ্রেণিকে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে শুধু অঙ্গিকার বদ্ধ নন, তিনি তা বাস্তবায়নেও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জাতির পিতার আদর্শ অনুকরণে তিনি দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যাস্ত। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার আমলে বন্ধ হয়ে যাওয়া কল-কারখানাগুলো চালু করেছেন। বেকারের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করেছেন। বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ এবং তাদের রেমিটেন্স দেশে পাঠানোর পথ সহজ ও সুগম করেছেন। পোষাক শিল্পসহ ৩৮টি শিল্পখাতের শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম মজুরি ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ যুগোপযোগী ও আধুনিক করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ প্রনয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ ও প্রণয়ন করেছেন জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার সরকার। শুধু তাই নয়, তিনি বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়তে 'রূপকল্প-২০২১' ও 'রূপকল্প-২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এ পরিকল্পনা মতে প্রতিদিন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.২৮ শতাংশ। দারিদ্রের হার ২২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। আমাদের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার। রিজার্ভ ৩৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। স্বাক্ষরতার হার ৭২ শতাংশের বেশি হয়েছে। দেশের ৮০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দোরগোড়ায়। দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে ঔষধ পাচ্ছে। গড় আয়ু বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১ বছর ৮ মাস। সারদেশে সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, ফ্লাইওভার, পাতাল সড়ক এলিভেটেড এক্সপ্রসওয়ে, রেল, নৌ ও যোগাযোগ অবকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে নতুন নতুন শিল্প কারখানা। কমছে বেকারত্ব, যা দেখে দেশের উন্নয়ন সহযোগী, দাতা ও উন্নত বিশ্বের নেতারা বিস্মিত-হতবাক। যোগ্য নেতৃত্ব দেশকে কতটা মর্যাদাশীল করতে পারে; তার যথার্থ প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার দূরদর্শীতা, সাংগঠনিক বিচক্ষনতা, মেধা ও কর্মদক্ষতা গণমানুষের কল্যাণে নিবেদিত এবং সফলভাবে বাস্তবায়িত। তাই তাকে এখন বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মে দিবসের চেতনায় শিল্প বিপ্লব, টেকসই অর্থনীতি ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রত্যয়

মোঃ জহিরুল ইসলাম চৌধুরী
সহ-সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ ও
সভাপতি
জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক লীগ, বি-১৯০২, সিবিএ
কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ঐতিহাসিক মে-দিবস অর্থাৎ ১ মে তারিখ শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যের দিবস হিসেবে পলিত হয়ে আসছে। ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে জুতার কারখানায় ধর্মঘটটি শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে মহান মে দিবসের ইতিহাস। সৃষ্টি হয়েছিল শ্রমজীবী মানুষের দাবীর মাধ্যমে অধিকার আদায়ের ইতিহাস। বিরামহীন শ্রমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল কর্মকাল অর্থ্যাৎ সাপ্তাহিক বা দৈনিক কর্মঘন্টা। মালিক পক্ষ উপলব্ধি করেছিল দাবীর বাস্তবতা এবং এতদসম্পর্কে নিয়মনীতি ও আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা। পরবর্তীকালে ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা গঠিত হয় এবং কাজের সময়সীমা নির্ধারণের বিষয়ে কনভেনশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ কনভেনশন পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই অনুসমর্থন লাভ করে এবং কনভেনশনের বিধান মোতাবেক স্ব-স্ব দেশে কাজের সময়সীমা আইন প্রণীত হয়।

শ্রমিকদের বিক্ষোভ বা আন্দোলনের ফলে শ্রমিক সংগঠন স্বীকৃতি পায়, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, দাবী আদায়ের অবকাঠামো গড়ে উঠে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। মজুরি নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড ও মজুরি কমিশন গঠিত হয়। চাকুরির শর্তাবলীর বিধান নির্দিষ্ট হয়, প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার স্বীকৃতি পায় এবং সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এছড়া বিভিন্ন ফোরামে প্রতিনিধিত্ব কারার অধিকার স্বীকৃতি পায়। এসবই শ্রমিক আন্দোলনের প্রতিফলন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
বর্তমনে বিশ্বজুড়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সুতরাং পূর্বের মত শ্রমিক সংগঠনগুলোর বিক্ষোভ বা আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কমে যাচ্ছে। কারণ অর্থনীতির বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মালিক বা শ্রমিক আলাদা কোনা দল বা গোষ্ঠী নয়, এ হচ্ছে সমন্বিত গোষ্ঠী। এ পরিবেশে সমন্বিত গোষ্ঠীর উপর অধিকতর দায়িত্ব এসে পড়েছে। কেবল দেশের জন্য নয়, তাদের নিজেদের স্বার্থেও উৎপাদিত পণ্যের পরিমান বৃদ্ধি নিশ্চিত করা , পন্যের গুনগতমান অন্য সব দেশের পণ্যের গুনগতমানের তুলনায় কোনক্রমেই যাতে কম না হয় সে সম্পের্কে প্রতিযোগিতা করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা আবশ্যক। কারণ, এ প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে উৎপাদিত পন্য কেবল গুদামজাত হয়ে থকাবে। এ বিষয়গুলো শ্রমিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে উপলব্দি করতে হবে। মালিকদেরকে বিশ্বায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিযোগিতায় টিকা থাকার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করত হবে।

বর্তমান সরকারের সুদূর প্রসারী চিন্তার কারণে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত হতে যাচ্ছে। এছাড়া প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্ব শ্রমবাজারে আসছে। বর্তমানে বেকার শ্রমিক এর সংখ্যা নগণ্য। বার্ষিক জিডিপির হার ৭.২৮%। মাথাপিছু আয় ১৬০২ ডলার, টাকায় প্রায় ১,৩৬,১৭০/-। ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য সময়ের চেয়ে অনেক ভাল। জনসংখ্যার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ পূর্বের তুলনায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ ইতোমধ্যেই বাস্তবায়নের পথে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মধ্য আয়ের দেশ এবং কার্যক্রমে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ যুগোপযোগি ও আধুনিক করে সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা-২০১৫ প্রণয়ন করেছেন জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০ প্রণয়ন করেছেন। নারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, কৃষি শ্রমিক তথা ভূমিহীনদের বিনা জামানতে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা মাত্র ১০/- টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা, শ্রমজীবী ও গরিব দুঃখী মানুষের জীবন-জীবিকার ব্যবস্থা করতে সোস্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক জোরদার করা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রকৃতি অব্যাহত রাখা, গরিব মানুষের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে সোলার বিদ্যুৎ ল্যাম্প সরবরাহ, কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং সরকারি হাসপাতালগুলোয় বিনা খরচে চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থাএবং বিনা মূল্যে বই সরবরাহ করে শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের প্রার্থমিক শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ভূমিহীনদের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেমি পাকা বাসস্থান নির্মাণ করে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা জারি করে শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারদের জন্য বাস্তবমূখী সর্বজন গৃহীত জাতীয় পে-কমিশন/২০১৫ এবং শ্রমিকদের কল্যাণসহ নিম্নরূপ যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ-

১) আর্ন্তজাতিক শ্রম বাজারে বিপুল পরিমাণে জনশক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
২) সরকারিভাবে স্বল্প খরচে শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
৩) জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন-২০১৫ গঠন
৪) বেসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় শ্রমিকদের দ্বিগুনেরও বেশী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ;
৫) কর্মরত অবস্থায় মৃত শ্রমিক/কর্মচারীদের গোষ্ঠী বীমার টাকা ১,০০,০০০ থেকে ৮,০০,০০০ টাকা প্রদান;
৬) কর্মরত অবস্থায় কোন শ্রমিক/কর্মচারী আহত বা পঙ্গু হলে ৪,০০,০০০ টাকা প্রদান;
৭) সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশনের হার প্রতি টাকায় ২০০ টাকা থেকে ২৩০ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮) অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন মূল বেতনের ৮০% থেকে ৯০% এ উন্নীত করা হয়েছে।
৯) অবসরে যাওয়ার সময় সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এককালীন ১২ মাসের পরিবর্তে ১৮ মাসের ছুটি নগদায়নের সুযোগ সৃষ্টি;
১০) সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিতসহ সকল সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরির মেয়াদ ০২(দুই) বছর বৃদ্ধি;
১১) ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্বের হার কমিয়ে আনা;
১২) বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদ্যুৎ ভাতার প্রবর্তন;
১৩) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চল তথা মফস্বলসমূহের সকল কার্যক্রম কম্পিউটারাইজড ও ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে দেয়া:
১৪) শ্রমিক/কর্মচারীদের কর্মের পাশাপাশি খেলাধূলার পরিবেশ সৃষ্টি।
১৫) নারী শ্রমিকদের জন্য ডরমিটরি নির্মান করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে চলমান সময়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে ২০১৪ সালে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, গ্রামীন অবগাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্রের হার ১৩% এ নামিয়ে আনা, সারাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩২০০ গেগাওয়াট হইতে ১৬,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণসহ ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। সিস্টেম লস সিংগেল ডিজিটে নামিয়ে আনা হয়েছে, রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার অতিক্রম করে বিদ্যুৎ সেক্টরে সর্বক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যখন বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিনত হতে চলেছে, ঠিক সেইসময় অর্জিত সাফল্য বিনষ্ট করার জন্য ১৯৭১ সালের পরাজিত শত্রুরা অর্থাৎ বিএনপি-জামাতসহ ২০ দলীয় জোট বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এবং বহিঃ বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা ও দেশকে জঙ্গিরাষ্ট্রে পরিনত করার জন্য গভীর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেই মূহুর্তে বিউবোর্ডকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিএনপি-জামাত জোটের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এক শ্রেণীর উচ্চাভিলাসী কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সৃষ্ট লাভজনক প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে ভেঙ্গে কোম্পানীতে রুপান্তরের পায়তারা করছে। ইতোপূর্বে যে সকল কোম্পানী করা হয়েছে, সেই সকল কোম্পানীগুলি লোকসানে পরিনত হতে যাচ্ছে। কোম্পানী করা হলে বিদ্যুৎ সেক্টরে সর্বক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য বিনষ্ট হতে পারে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডেও এহেন কর্মকান্ডের কারনে বিদ্যুৎ বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করছে।

মে-দিবসের আদর্শ ও চেতনা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, শ্রমিকের সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন মালিকের দায়িত্ব, তেমনিভাবে মে-দিবসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিক দায়িত্বশীলতার সাথে নিয়ম-শৃংখলা অনুসরণ করে শ্রম প্রদান করা শ্রমিকের কর্তব্য।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মহান মে দিবস ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার

মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন(বি-২১৪২)
মহা-সচিব (কল্যাণ ও পুনর্বাসন)
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

পহেলা মে, মহান মে দিবস। শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ের ঐতিহাসিক সংগ্রামের দিন। শ্রমিক শ্রেণির জন্য আজকের এই দিনটি দৃপ্ত শপথে বলীয়ান হওয়ার দিন, শেকল ছেড়ার দিন, উৎসবের দিন, একইসাথে শোকেরও দিন। পৃথিবীর সব দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শ্রমজীবী সংগঠনগুলো প্রতিবছর এইদিনে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদার সাথে ঐতিহাসিক মহান মে দিবস পালন করে থাকে। যাদের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে আজকের আধুনিক বিশ্বের এ যান্ত্রিক বিশ্বায়ন সেই যান্ত্রিক বিশ্বায়নের নির্মাতা দুনিয়ার সব শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

জুলুমের বিরুদ্ধে মজলুমের জয় একদিন হবেই। এই প্রত্যাশায় দুনিয়ার মজদুর শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। লড়াইয়ের শুরুটা হয়েছিল ১৮৮৬ সালের পহেলা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকদের ন্যায্যমূল্য ও আট ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ করার দাবি আন্দোলনের মাধ্যমে। মানবের প্রতি দানবীয় শ্রমঘন্টার বিরুদ্ধে ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে সেই দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ ন্যায্য অধিকার আদায়ে সমবেত হয়েছিল। আন্দোলন দমনে সেদিন শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানো হয়েছিল। ১০ জন শ্রমিকের আত্মত্যাগে গড়ে ওঠে বিক্ষোভ। শ্রমিকের তাজা রক্তে রাঙা রাজপথ ধরে লাল ঝান্ডা উড়িয়ে মেহনতি মানুষ নিজের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। প্রবল জনমতের মুখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার শ্রমিকদের আট ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণ করতে বাধ্য হয়। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফ্রান্সের প্যারিসে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে শিকাগোর শ্রমিকদের সংগ্রামী ঐক্যের অর্জনকে স্বীকৃতি দিয়ে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস ঘোষণা করা হয় এবং ১৮৯০ সাল থেকে সারা বিশ্বে শ্রমিক সংহতির আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে মে মাসের ১ তারিখ মে দিবস পালিত হয়ে আসছে। দিনটি সারা বিশ্বের অগণিত মেহনতি-শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, রক্তক্ষয়, আত্মত্যাগ ও তাঁদের বিজয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মে দিবসের সেই সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণিকে উপহার দিয়েছে সংগ্রামী লাল পতাকা ও মুষ্টিবদ্ধ হাত।

দেশের উৎপাদন, উন্নয়ন ও সামগ্রিক অগ্রগতিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। সুখী, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্প উদ্যোক্তা, মালিক-শ্রমিক সকলের প্রয়াস একান্তভাবে আবশ্যক। শ্রমিককে মনে রাখতে হবে মালিক বা শিল্প উদ্যোক্তা না থাকলে শিল্পের বিকাশ হবেনা। শিল্পের বিকাশ না হলে কর্মসংস্থান হবেনা। পাশাপাশি মালিক বা শিল্প উদ্যোক্তাকে মনে রাখতে হবে শ্রমিক ব্যতীত তার শিল্প অচল। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও আইনানুগ অধিকার না দিলে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হবে। সুতরাং শিল্প পরিচালনায় মালিক ও শ্রমিকদের সুসম্পর্ক স্থাপন ব্যতীত শিল্পের বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিবেশ স্থাপন করা সম্ভব নয়। শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডকে দ্রুত এগিয়ে নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন মালিক-শ্রমিক ঐক্য এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা। জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন বঞ্চিত ও মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের নির্যাতিত নিপীড়িত মানষের কণ্ঠস্বর। আওয়ামীলীগ দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিত। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে আওয়ামীলীগের প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য নেতাকর্মী জেল জুলুম ও অত্যাচার সহ্য করেছেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু সরকার পহেলা মে কে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেন এবং তাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২২ জুন আইএলও এর সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। আওয়ামী লীগ যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন তখনই শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য কাজ করেছেন। কারণ আওয়ামীলীগ বিশ্বাস করে শ্রমিকরাই একটি দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি। বর্তমান সরকার শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'রূপকল্প ২০২১' বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর।

সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় হয়েছে। শ্রমিক মালিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, সুন্দর ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি প্রণয়ন করেছেন। শ্রমিক বান্ধব প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সময়কালে ৩৬টি সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। পোশাক শিল্পে দু'বার ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রতিবার প্রায় দ্বিগুণ মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শ্রম আইনকে আরও যুগোপযোগি ও বাস্তবমুখী করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিএনপি জোট সরকারের আমলে যেসকল শিল্প ও কারখানাসমূহ বন্ধ করে দিয়েছিল তারমধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালু করেছেন। সর্বোপরি জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

দেশের শিল্প-কারখানার সামগ্রিক উন্নয়নে প্রয়োজন মালিকের সদিচ্ছা, শ্রমিকের একাগ্রতা এবং পারস্পরিক আন্তরিকতা। সকল পক্ষের ইতিবাচক ও সৌহার্দপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে 'রূপকল্প ২০২১' ও 'রূপকল্প ২০৪১' বির্নিমাণে বদ্ধপরিকর। এ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শ্রমিক-মালিকের মধ্যকার বিদ্যমান আন্তরিক সম্পর্ক অব্যাহত রেখে নতুন নতুন শিল্প স্থাপন ও আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমেই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কারণ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে তুলতে শিল্পোদ্যোক্তা, মালিক ও শ্রমিকের সম্মিলিত প্রয়াস একান্তভাবে প্রয়োজন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ন্যায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল মেহনতি শ্রমিক জনতা আজ ঐক্যবদ্ধ। মহান মে দিবসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রমক্ষেত্রের সকল সমস্যার বাস্তব সম্মত সমাধানের মাধ্যমে নিরাপদ ও আন্তরিক কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ পূর্বক শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

''গৃহ কর্মী এক সম্মানজনক কাজ''

রওশন জাহান সাথী
সভাপতি
মহিলা শ্রমিক লীগ
সাবেক সংসদ সদস্য

গৃহ শ্রমিক। একটি পেশা। চাকুরী, সমাজের, মানুষের অস্থিরতা কমিয়ে স্থিরতার দিকে নিয়ে যায় যেসব কাজ, যেসব কর্মীরা, তাদেরই একটি হলো গৃহ শ্রমিক। তাঁরা একাগ্রতায়, মমতায়, আন্তরিকতায় হাত বাড়িয়ে দেয় প্রত্যেক পরিবারের প্রতি। নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে। মানুষের জীবনকে আনন্দময় ও নির্বিঘ্ন করে। বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরী করে। নাগরিক জীবনে শান্তি এনে দেয়। গড়ে তোলে মানুষে মানুষে কাজের সম্পর্ক। তাই সকলেই নিজ নিজ কাজে মনোযোগী হতে পারে। সকল পেশায় সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। গৃহ-শ্রমিকরা এক বড় ধরনের দায়িত্ব পালন করে। নিম্নবিত্ত এই মানুষরা শ্রেণীচরিত্র অনুযায়ী অনেক ভাল কাজ করে, আবার কিছু ভুলও করে। সেই সব ভুল এবং অন্যায়কে যদি আমরা আপন হয়ে বুঝিয়ে দিই, সংশোধন করে দিই, তাহলে তারা নিজেদের মর্যাদাটা বুঝতে পারবে। তাকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে আমরা যারা সমাজে এগিয়ে আছি তাদের সচেতনতা দরকার। নিম্নবিত্ত মানুষকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, তুই তুই করে ডাকা, অপমান করা এবং হেনস্তা করা অমানবিক। আমরা অহরহ দেখছি, শুনছি গরম খুন্তীর ছ্যাঁকা দেওয়া, চুল কেটে দেওয়া, চাকু দিয়ে শরীর ক্ষতবিক্ষত করা, খেতে না দেওয়া, তেল-সাবান না দেওয়া, ঔষধ না দেওয়া, এমনকি হত্যা করা, কখনও কখনও যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তারা। কোন কোন বাড়ীতে শোবার জায়গা থাকে না। আলাদা ঘর না থাকলে নিজেদের ঘরে তাদের শোবার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে তারা নিরাপত্তা পাবে। তাদের প্রতি সদয় হতে হবে। নিরাপত্তাহীনতা নারী-পুরুষ কোন মানুষকেই কাজে মনোযোগী হতে দেয় না। আর নারী আজও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অংশ। প্রতি পদে পদে বাধা অতিক্রম করে তাকে পথ চলতে হয়, কাজ করতে হয়। গৃহ-শ্রমিকরা অহরহ নির্মম নিষ্পেষনে চাকরীর অনিশ্চতায় পড়ে যায়। উচ্চ বিত্ত,উচ্চ মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে সবারই উচু ধারনা, এ সব শিক্ষিত মানুষদেরকে আমরা বড় করে দেখি। উদার মনে করি। মনে করি মানুষ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এদের অনেক অবদান। জীবনের মৌলিক দাবীগুলো পূরণের লক্ষ্যে এই মানুষেরা ব্যক্তিপর্যায়ে অনেক কিছু করে থাকেন, অথচ যখন শুনি তাদেরই কেউ কেউ গৃহ-শ্রমিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে। এমনকি হত্যা করে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে রেখেছে, অথবা লাশ গুম করেছে। অথবা কেউ হাসপাতালে মৃত্যুর দিন গুনছে। কেউবা চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছে। দাসযুগ, সামন্তযুগ পার হয়ে এসেও আমাদের মনের মধ্যে জমিদারী মুর্তির প্রকাশ ঘটে। মানুষকে অধস্তন ভাবতেই সবসময় আনন্দ বোধ করে। তাতে আনন্দের চাইতে কী সংকীর্ণতা প্রকাশ পায় না?

অনেকে আছেন জীব-জানোয়ারের প্রতি দরদী, পশুভক্ত, প্রকৃতি-ভক্ত, মানুষ তো প্রকৃতির সেরা জীব, তাহলে তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের প্রতি ভালবাসা, দরদ তো বাস্তব সম্মত নয়। গৃহকর্মীদেরকে নিজেদের মত মানুষ মনে করতে হবে, তবেই 'জীবে দয়া' করা মানাবে। মানবিক সমাজ গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের আকাঙ্খিত পরিবেশ ও জীবন খুঁজে পাবো। সুন্দর স্বাভাবিক সমাজ গড়তে পারবো।

এ সব নিয়ে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা, সংগ্রামের ফসল হিসেবে আমরা পেয়েছি- ''গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি,২০১৫'' যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রণীত হয়েছে। এই নীতিমালা থেকে কিছু অংশ আমি তুলে ধরতে চাই। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা একজন মানবদরদী মানুষ, তিনি নারীবান্ধব, শ্রমিক বান্ধব, তিনি প্রকৃতি বান্ধব এবং তাঁর স্পর্শকাতর একটি মন রয়েছে। তাঁর কাছে কোন সমস্যা নিয়ে গেলে, কেউ খালি হাতে ফিরে আসেনা। রাষ্ট্রনায়কোচিত দৃঢ়তা এবং উদারতা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গৃহ শ্রমিকদের এই নীতিমালা অনুমোদনের জন্য তাঁকে আন্তরিক ভালবাসা জানাই।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধানে শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রতিফলন ঘটানোর মাধ্যমে জাতির পিতা তাঁর আদর্শের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করেছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্মক্ষম প্রতিটি নাগরিকের জন্য কর্মের অধিকার হচ্ছে তার অধিকার, কর্তব্য, মর্যাদার বিষয় এবং শ্রমিকের প্রাপ্য পরিশোধের মূলনীতি হল ।

শ্রমিকের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন এবং সম্পাদিত কাজ অনুযায়ী শ্রমের মূল্য পরিশোধ। অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের আশ্রয় লাভে সম অধিকারী। অনুচ্ছেদ ৩৪-এ সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন গৃহ, মেস ও ডরমেটরি প্রভৃতি কর্মস্থলে গৃহকর্মীরা পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন গৃহ কর্মে নিয়োজিত থাকেন। এ নীতি বিশেষভাবে গৃহকর্মী, নিয়োগকারী ও তার পরিবারের সদস্য, সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

গৃহকর্মী বলতে এমন কোন ব্যক্তিকে বোঝাবে যিনি নিয়োগকারীর গৃহে মৌখিক বা লিখিত ভাবে খন্ডকালীন অথবা পূর্ণকালীন নিয়োগের ভিত্তিতে গৃহকর্ম সম্পাদন করেন। এ ক্ষেত্রে মেস বা ডরমেটরিও গৃহ হিসেবে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ আইএলওর শোভন কাজ কর্মসূচীর সক্রিয় সমর্থক ও অংশীদার। গৃহকর্মীদের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মসূচীর প্রযোজ্য অংশের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ নীতি বাস্তবায়নের কাজ সমন্বয় করবে। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিটি কর্পোরেশন সমূহের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় কিংবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, সেনানিবাস এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এ নীতির আলোকে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এ ছাড়াও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সকল পৌরসভার মেয়র ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কার্যালয় গৃহকর্মীদের তথ্য সংরক্ষণ এবং নীতিমালার আলোকে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণের লক্ষ্যে দায়িত্ব পালন করবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কর্তৃক স্বতন্ত্র রেজিষ্টার সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা বাঞ্চনীয় হবে। উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচানার ভিত্তিতে মজুরী নির্ধারিত হবে। পূর্ণকালীন গৃহকর্মীর মজুরী যাতে গৃহকর্মীর পরিবারসহ সামাজিক মর্যদার সাথে জীবন যাপনের উপযোগী হয় নিয়োগকারী তা নিশ্চিত করবেন, গৃহকর্মীর ভরণ পোষণ, পোশাক প্রদান করা হলে তা মজুরীর অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে। নিয়োগকারী গৃহকর্মীকে প্রতিমাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধ করবেন।

প্রত্যেক গৃহকর্মীর কর্মঘন্টা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে তিনি পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম, চিত্তবিনোদন ও প্রয়োজনীয় ছুটির সুযোগ পান। গৃহকর্মীর ঘুম ও বিশ্রামের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর অনুমতি নিয়ে গৃহকর্মী সবেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন। সন্তান সম্ভবা গৃহকর্মীকে তার প্রসূতিকালীন ছুটি হিসেবে মোট ১৬ সপ্তাহ (প্রসবের পূর্বে ৪ সপ্তাহ এবং প্রসবের পরে ১২ সপ্তাহ অথবা গৃহকর্মীর সুবিধা অনুসারে) স্বেতনে মাতৃত্ব ছুটি প্রদান করতে হবে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত ভারী কাজ থেকে বিরত রাখা এবং মাতৃস্বাস্থ্যের পরিচর্যায় সরকারি হাসপাতালের সাথে যোগযোগ করতে গৃহকর্তা সহায়তা করবেন। অসুস্থ গৃহকর্মীকে কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিয়োগকারী নিজ ব্যয়ে তার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। গৃহকর্মীকে নিজের ধর্ম পালনের সুযোগ করে দিতে হবে।

গৃহকর্মীর প্রতি কোন প্রকার অশালীন আচরণ অথবা দৈহিক আঘাত অথবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। গৃহকর্মীর উপর কোন রকম হয়রানী ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকারের উপর বর্তাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী প্রদান করবে।

গৃহকর্মী তার কর্মরত পরিবারের সদস্য বিশেষ করে শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধ বা অন্য কোন সদস্যের প্রতি কোনরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বা পীড়াদায়ক আচরণ করতে পারবে না। এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলে নিয়োগকারী তার নিয়োগ বাতিল করতে পারবে এবং তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। নিয়োগকারী পূর্ণকালীন নিয়োগের ক্ষেত্রে ছবি সহ সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করতে পারবেন।

নীতিতে যাই থাকুক না কেন গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোন বাধাঁ কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না। নিয়োগকারী রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক গৃহকর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিয়োগ করতে পারবেন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন,২০০৬ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে গৃহকর্মীদের যৌক্তিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

নিয়োগকারী গৃহকর্মীর প্রতি মানবিক আচরণ করবেন। তার প্রতি সদয় থাকবেন, এটা সবাই প্রত্যাশা করে। গৃহকর্মী আইন সম্মত সকল বিষয়ে সব সময় গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর বিশ্বাসভাজন থাকবেন এবং এমন কোন কাজ করবেন না যাতে পারস্পারিক বিশ্বাস নষ্ট নয়। গৃহকর্মী নিয়োগকারী বা নিয়োগকারীর গৃহের প্রাপ্তবয়স্ক ও দায়িত্বশীল সদস্যের অনুপস্থিতিতে বাড়ীঘরের সার্বিক দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবেন এবং কোন ধরনের অনভিপ্রেত বা নীতি বহির্ভূত কাজে জড়িত হবেন না। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে চাকরি থেকে অপসারণ বা অবসানের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে ন্যূনতম একমাস আগে পরস্পরকে জানাতে হবে যদি তাৎক্ষণিকভাবে গৃহকর্তা গৃহকর্মীর চাকরির অবসান ঘটায় তাহলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মজুরি প্রদান করে চাকরির অবসান ঘটাতে হবে।

আমরা সবাই যদি সহনশীলতার সাথে নীতিমালা মেনে অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে আসি, তাহলে তা বেশ সহজ হয়ে উঠবে। 'মন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে না। আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করবো। এই চর্চাটি আমাদেরকে এক ধরনের প্রশিক্ষণ দেবে। যার মাধ্যমে আমরা নিজেকে অতিক্রম করতে পারবো বলে আমার বিশ্বাস। মানুষ পারে না এমন কোন কাজ নেই। মানুষই পারে সমাজ ও দেশকে সুন্দর ও সাবলীল করে তুলতে, অর্থনৈতিক পার্থক্য থাকলেও মানুষের প্রতি ভালবাসা ও জীবের প্রতি দরদ মানব জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। সবার জন্য শুভ কামনায় শেষ করছি।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মে দিবসের ভাবনা ঃ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজন "শ্রমিকের অধিকার, নিরাপদ কর্মস্থল/শোভন কাজ এবং সমমজুরী" নিশ্চিত করা;

জেড.এম.কামরুল আনাম
সভাপতি- বাংলাদেশ বস্ত্র ও পোশাক শিল্প শ্রমিক লীগ
চেয়ারম্যান- সোনাগাজী উপজেলা পরিষদ, ফেনী।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (SDG) জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১২ সালের জুন (২০-২২) মাসে রিও সামিট এর মাধ্যমে ঘোষিত হয়। যা ২০১৬ সাল থেকে কার্যকর হচ্ছে। (Replacing the MDGS) জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় রয়েছে-১৭টি লক্ষমাত্রা (Goal), ১৬৯টি টার্গেট (Target), ২১২টি নির্দেশক (Indicators) যা বিভিন্ন মেয়াদে পালনীয়।

প্রসংগত লক্ষ্যমাত্রা ১ এবং ২ এর আলোকে "দারিদ্র বিমোচন এবং ক্ষুধামুক্তি" এই দুই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। তবেই শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে, পুষ্টিহীনতা, দারিদ্রতা হ্রাস পাবে। শ্রমিকদের অর্ধহারে অনাহারে থাকতে হবে না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, পুষ্টিহীনতার কারণে শ্রমিক দিনে দিনে উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

লক্ষ্যমাত্রা ৩'এ বলা হয়েছে "সকলের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার কথা"। শিল্পে উৎপাদন অব্যাহত রাখার স্বার্থে এবং উৎপাদন বাড়াতে হলে শ্রমিকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে এবং শ্রমিকদের কল্যাণে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা না গেলে শিল্পে শ্রমিকের অনুপস্থিতির হার বেড়ে যাবে এবং উৎপাদন হ্রাস পাবে। লক্ষ্যমাত্রা ৫'এ জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন এর কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমার "অপরাজিতা" কবিতাটিই যথেষ্ট ঃ

এখন নারী মানে পুরুষের ভোগের সামগ্রী আর করুণার পাত্র নয়,
এখন নারী মানে নিজের শরীরকে পণ্য করে বেঁচে থাকা নয়,
এখন নারী মানে নিজের শরীরের প্রতিটি বাঁকে আচ্ছাদিত করে রাখা নয়,
এখন নারী মানে নরপিশাচদের কাছে যখন তখন রক্তাক্ত হওয়া নয়,
এখন নারী মানে অন্ধকার জীবন কিংবা বেশ্যাবৃত্তি নয়।

নারী এখন যোদ্ধা, নারী এখন সাহসী
নারী এখন প্রতিবাদী, অধিকার আদায়ে তাঁরা প্রত্যাশী
নারী এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছে।

আমি নারীকে দেখি সচিবালয়ে, সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ পদে,
আমি নারীকে দেখি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে
আমি নারীকে দেখি সেনাবাহিনী পুলিশ কিংবা বৈমানিক রুপে।

নারী এখন খেলার মাঠে ফুটবল কিংবা ক্রিকেটে
নারী এখন এভারেস্ট করে জয়ী , আসে বিজয়ীর বেশে।
নারী এখন বুদ্ধিজীবী, ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, উকিল
নারী এখন নোবেল বিজয়ী, সাহিত্যিক, গবেষক, বিজ্ঞানী, সমাজসেবী।

নারী এখন রাজনৈতিক নেত্রী, নারী এখন প্রধানমন্ত্রী
নারী এখন স্বরাষ্ট্র-পররাষ্ট্র মন্ত্রী, নারী এখন কৃষি মন্ত্রী
নারী এখন স্পীকার, সংসদ নেতা, নারী এখন সংসদ উপনেতা
নারী এখন সরকার দলীয় নেতা কিংবা বিরোধী দলীয় নেতা।

কোথায় নেই নারী
নভোচারীও নারী, চাঁদে হেঁটেছে নারী
রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রনে নারী,
দেশের অর্ধেক ভোটার নারী
নারী এখন ফেলনা কিংবা খেলনা নয়
নারী ছাড়া উন্নয়ন শুধু স্বপ্নই রয়।
নারী মানেই অপরাজিতা, সুবাস ছড়ানো ফুল
নারী মানেই জীবনব্যাপী সুখের নদী কুল।

লক্ষ্যমাত্রা ৮ এ' দখা যায় - অন্তর্ভূক্তিমূলক টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদন ও শোভন কর্মস্থল নিশ্চিত করা। ৮(৫) এ' ২০৩০ সনের মধ্যে যারা তরুণ ও যারা শারীরিক প্রতিবন্ধী তাঁরাসহ সকল নারী ও পুরুষের জন্য সার্বিক ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও শোভন কাজ অর্জন।

৮(৭) এ'বলপূর্বক শ্রম, আধুনিক দাসত্ব ও মানবপাচার নির্মূলের আশু ও কার্যকর পদক্ষেপ এবং সেনাবাহিনীতে শিশুর নিয়োগ ও ব্যবহার বন্ধ করাসহ খারাপ ধরণের শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও নির্মূল করা এবং ২০২৫ সনের মধ্যে সকল ধরণের শিশু শ্রম বন্ধকরণ।
৮(৮) এ'অভিবাসী শ্রমিক বিশেষতঃ নারী অভিবাসী ও যারা খারাপ ধরণের কাজে নিয়োজিত তাঁরাসহ সকল শ্রমিকের অধিকার রক্ষা এবং নিরাপদ কর্ম- পরিবেশের প্রসার।

১৬ নং লক্ষ্য মাত্রায় বলা হয়েছে -"শান্তিপূর্ণ ও অংশীদারিত্ব মূলক সমাজ নির্মাণ, সকলের জন্য ন্যায় বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয় শ্রমজীবী গোষ্ঠীকে অংশীদারিত্ব না দিয়ে অধিকার বঞ্চিত রেখে শান্তি, ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত সম্ভব নহে।

পরিশেষে টেকসই লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে প্রয়োজন শ্রমিকের আইনানুগ অধিকার, মুনাফার ভাগ, শোভন কর্মপরিবেশ, সুস্বাস্থ্য সমমজুরি ও ক্ষুধা দারিদ্র দূরিকরণের লক্ষ্যে বাঁচারমত মজুরি এবং "নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে সকলের কর্ম সংস্থান, শিশু শ্রম নিরসন, বলপূর্বক শ্রম বন্ধ করণ, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, খারাপ কাজে নিয়োগ বন্ধকরণসহ সকল শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা আশু করণীয়।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মে দিবসের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে- শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হই।

শামসুন্নাহার ভূইয়া
মহিলা সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিকলীগ।

১লা মে আজ শুধু শ্রমিকের অধিকার আদায়ের দিন নয়, বিশ্বের সকল শোষিত, নিপীড়িত নারী পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামের দিন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তাই মহান মে দিবস যুগে যুগে শ্রমজীবী মানুষকে অধিকার আদায়ের প্রেরণা যোগায়। মহান মে দিবসের সংগ্রামের ইতিহাস শ্রমিকের শোষনের বিরুদ্ধে অধিকার আদায়ের ইতিহাস।

১৮৮৬ সালে ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে, মকরম্যাক রিপার ওয়ার্কস নামের শিল্প প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটে শ্রমিকদের রক্ত দানের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছেল মহান মে দিবস। সেদিন শ্রমিকেরা মূলত দীর্ঘদিন শোষন বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল ঐক্যবদ্ধভাবে লাখো শ্রমিক। তাদের দাবী ছিল ৮ঘন্টা কাজ, ৮ঘন্টা বিশ্রাম, ৮ঘন্টা বিনোদন। ঐতিহাসিক ঐ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন, আলবার্ট আর পার্সনস, আগাষ্টস্পাইজ, অ্যাউলফ-ফিশার ও জর্জ এঙ্গেল। আমি এই দিনে শ্রমজীবী সকল মানুষের পক্ষ থেকে তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। তাঁদের মৃত্যু নেই, তাঁরা চিরঞ্জীব, তাঁরা অমর।

আমেরিকায় শ্রমিকদের ন্যায়সংগত ঐ দাবির সমর্থনে সেযুগে সর্ববৃহৎ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। তৎকালীন মার্কিন সরকার শ্রমিকদের ঐ ন্যায়সংগত আন্দোলনে বল প্রয়োগের মাধ্যমে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। সেদিন পুলিশ ও মালিকের পেটুয়া বাহিনী নিরস্ত্র, নিরীহ শ্রমিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আহত হয়েছিল শত শত শ্রমিক, গ্রেফতার করেছিল অনেক নেতা কর্মীকে। মিথ্যা মামলা দিয়েছিল নেতৃত্বদানকারী শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে। ১৮৮৭ সালে ১১ই নভেম্বর প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল অকুতোভয়, নির্ভীক, শ্রমিকনেতা আলবার্ট, পার্সনস, অগাষ্ট স্পাইজসহ অন্যান্য নেতাদের, তাঁরা মরেনি। তাঁরা অমর। সারা বিশ্বের মানুষ তাদের স্মরণ করবেন যুগে যুগে। আমি এই দিনে আরও স্মরণ করছি ১৯৬৬ সালের স্বাধিকার আন্দোলনের তেজগাঁয়ের শ্রমিক নেতা মনু মিয়া, আদমজীর শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলামকে। যাকে ১৯৮৪ সালে নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল, মালিকের পোষা বাহিনী। আরও স্মরণ করছি ৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নিহত পরিবহন শ্রমিক নুর হোসেনকে।

হে মার্কেটের শ্রমিকেরা রক্তরাঙা পতাকা হাতে ১৩১ বছর ধরে দুনিয়া ব্যাপী শ্রমিকদের শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগ্রামের নতুন নতুন অধ্যায় রচনা করে চলেছেন। সংগ্রামের ইতিহাসের ধারায় যেখানে অন্যায়, অবিচার, শোষণ নিপীড়ন, সন্ত্রাস এবং যেখানে মানুষের ন্যায় সংগত অধিকার খর্ব করে, সেখানেই মানুষ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলছে।

আমাদের দেশের ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের অংশগ্রহণ ছিল স্মরণীয়। স্বাধীনতার পরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শ্রমিকের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কলকারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য ILO Convention- ৮৭,৯৮ অনুসমর্থন করেন। ১৯৭২ সালে ১লা মে কে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। ভারী শিল্প যেমন পাটকল, সূতাকল, চিনি কলসহ বিভিন্ন শিল্প জাতীয়করণ করে শ্রমিকদের মালিকানা দিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্য এদেশের শ্রমজীবী মানুষের, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা স্বপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সাথে সাথে হত্যা করল, দেশের খেটে খাওয়া মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে। ১৯৭৫ পরবর্তী সরকার, আর ৭৫ পূর্ববর্তী সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক নয়। শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি দরদ ও এক নয়। দীর্ঘ ২১ বৎসর অগণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় ছিল। তারা শ্রমিকের অধিকার হরণ করেছিল। দাবির কথা বলায় শ্রমিক হত্যা করেছিল, জাতীয়করণ করা আদমজী পাটকল, সূতাকল, চিনিকল পানির দরে বিক্রি করে দিয়েছিল। ফলে বেকার হয়ে পড়েছিল হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী। সেই সময়ে শ্রমিকেরা কিভাবে বঞ্চিত হয়েছিল, কিভাবে শোষিত হয় তার সামান্য চিত্র আমি উল্লেখ করছি

আমাদের দেশে বর্তমানে পোষাক শিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করেন। ১৯৮৪ সালে ২টি কারখানা নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। তখন এই শ্রমিকের ন্যূনতম মুঞ্জুরি ছিল ৫৭০ টাকা। ১০ বছর পর ১৯৯৪ সালে পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি হয় ৯৩০ টাকা। পরবর্তীতে ১২ বছর পর ২০০৬ সালে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেন ১৬৬২.৫০ টাকা।

জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর পোষাক শ্রমিকদের জন্য মজুরি বোর্ড গঠন করেন এবং ন্যূনতম মজুরি করেন ৩০০০ টাকা। বিগত ২২ বছর শ্রমিকেরা খুব কম মজুরি পেত সেই অবস্থা থেকে ৩০০০ টাকা যদিও শ্রমিকের প্রয়োজনের তুলনায় খুব বেশি না, তবুও এই মজুরি নির্ধারণ করতে কষ্ট হয়েছিল। আমি তৎকালীন বোর্ডের সদস্য হিসেবে বলতে চাই, জননেত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ ছাড়া ঐ মজুরি নির্ধারণ করা সম্ভব হতোনা।

পরবর্তীতে ২০১৩ সালে জননেত্রী শেখ হাসিনা পোষাক শিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি করেন ৫৩০০ টাকা। সরকার শ্রমিকদের জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় পূণরায় মজুরি বোর্ড গঠন করেন। শুধু পোশাক শিল্প নয় চাতাল, নির্মাণ, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পসহ বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকরা দীর্ঘদিন খুবই অবহেলিত ছিল। চাতাল সেক্টরে প্রায় ৫ লাখ শ্রমিক কাজ করেন যার মধ্যে বেশির ভাগই নারী শ্রমিক। দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ এই সেক্টরের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ছিল ৫৭০ টাকা। জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালে তাদের ন্যূনতম মজুরি করেন ৫৭০০ টাকা। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ এই সরকারের সময় ঔষধ, বিস্কুট, জুতা, স-মিল, নির্মাণ শ্রমিক সহ ৪০টি সেক্টরের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় ১০ লাখ গৃহশ্রমিক বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে কাজ করেন। এই গৃহ শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০১৫ সালে গৃহ শ্রমিক সুরক্ষা নীতিমালা প্রনয়ন করেছেন। এছাড়া জননেত্রী শেখ হাসিনা অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠনের মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিক, গৃহ শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক সহ বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকদের চিকিৎসা ও ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

শ্রমিক অধিকার রক্ষায়-আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন-

- বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ সরকার ২০০৯ সালের ৬ই জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন করেন।
- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করেন।
- শ্রমিকের অবসরের বয়স সীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছর উন্নীত করেন।
- শ্রম কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রনয়ন করেছেন।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্যের সেফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রনয়ন করেন।
- গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার এই পর্যন্ত ৩৫টি ILO Convention অনুসমর্থন করেছে। যার ৩২টি Convention আওয়ামীলীগ সরকারের সময় করা হয়েছে। বাস্তবতা কি? আমাদের দেশের সংবিধানে ILO Convention, মানবাধিকার ঘোষণায় এবং বাংলাদেশ শ্রমআইন (সংশোধন) ২০০৬ এবং বিধিমালা ও নীতিমালায় শ্রমিকের অধিকারের কথা থাকলেও সকল কলকারখানয় সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক খাত কমে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত প্রসারিত হচ্ছে। ৮০% শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে, যার ফলে বেশিরভাগ শ্রমিকই অসংগঠিত। এ জাতীয় ফেডারেশনের সদস্য সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। অন্য দিকে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে শ্রমিকরা বহুধাবিভক্ত হওয়ায় শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। শ্রমিকের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ডাকে যে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল তা হরতালে পরিণত হয়েছিল, এবং তৎকালীন এরশাদ সরকার স্কপের নেতৃবৃন্দের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিকের অধিকার আদায়ে লড়াই সংগ্রাম করতে হবে। বর্তমানে শ্রমিক বান্ধব সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আছেন। তিনি সর্বদা শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ যাতে ভালোভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে, তাদের ছেলে মেয়ে যেন চিকিৎসা পায়, লেখাপড়া করতে পারে, জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজ যেন উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। ২০২১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী মধ্য আয়ের দেশ গড়ে তুলতে শিল্পউদ্যোক্তা, মালিক, শ্রমিক সকলের প্রয়াস একান্তভাবে প্রয়োজন। শিল্প পরিচালনায় মালিক ও শ্রমিকদের সু-সম্পর্ক ব্যতিত শিল্পের বিকাশ ও সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শ্রমজীবীদের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করে সুখী ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে বিশ্বের দরবারে আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে দাঁড়াতে চাই। এজন্য প্রয়োজন শ্রমিক মালিক ঐক্য এবং তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা। বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের যে কোন ন্যায়সঙ্গত প্রত্যাশা পূরণে সদয় দৃষ্টি প্রদান করবেন। এটাই এ মে দিবসের প্রত্যাশা।

শ্রমিককের মুক্তির পথ

নইমুল আহসান জুয়েল
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিক জোট-বাংলাদেশ
যুগ্ম সমন্বয়ক, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হতে যাচ্ছে মহান মে দিবস। বাংলাদেশেও পালিত হবে এ দিবসটি। প্রায় ১৩২ বছর আগের ১লা মে ১৮৮৬ সালের এ দিনটি শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের আন্দোলন আর অধিকার আদায়ে রক্তাক্ত স্মৃতিবিজাড়িত এক ঐতিহাসিক দিন হিসেবে আজও সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়ে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

উপর্যুক্ত মজুরি ও দৈনিক ৮ ঘন্টা কর্মঘন্টার আন্দোলন সফল পরিণতি পেয়েছিলো ১৮৮৬ সালের ঐতিহাসিক মে দিবসে। কিন্তু শুরুটা তারও বেশ আগে। ১৮৩৪ সালে ইংল্যান্ডের সুতাকল শ্রমিকদের সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট, ১৮৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের একদিনের ধর্মঘট। ১৮৬২ সালে ভারতের হাওড়াস্টেশনে ১২০০ রেল শ্রমিকদের কয়েক দিনব্যাপী ধর্মঘট। এরপর ১৮৬৬ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্টের আন্দোলনটি গোটা বিশ্বেও নজর কাড়ে। ঐতিহাসিক মে দিবসের বিশ বছর আগে ১৮৮৬ সালের ২০ আগষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা বাল্টিমোরে সমবেত হয়ে ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সম্মেলনে একটা প্রস্তাব নিয়ে শুরু করেছিলেন আট ঘন্টার লড়াই। সেটা ছিল মার্কিন শ্রমিকদের প্রথম ঘোষণা। "এই দেশের শ্রমিককে পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্যে, প্রথম ও বিরাট প্রয়োজন ছিল এমন একটা আইন পাস করা, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলোতে আট ঘন্টাই যেন কাজের দিন হিসেবে গণ্য হতে পারে। যতদিন এই গৌরবময় ফল অর্জন করতে না পারি, ততদিন আমরা আমাদের শক্তি নিয়োগের সংকল্প নিচ্ছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আট ঘন্টার এ প্রস্তাব নিয়েই শুরু হয়েছিলো আন্দোলন এবং ক্রমশ তা ব্যাপ্তি ও তীব্রতা পেতে থাকে ধারাবাহিকভাবে ।

অবশেষে ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে শুরু হয় এক গুরুত্বপূর্ণ সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট। বঞ্চিত শ্রমিকের দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকার ধারণ করে ফেটে পড়েছিলো সেদিন আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে। কাজের সময় ৮ ঘন্টা নির্ধারণ, মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি ও কাজের উন্নত পরিবেশ তৈরী করাসহ শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ১৮৮৬ সালের ১লা মে হে মার্কেটের শিল্প শ্রমিকেরা ধর্মঘটের ডাক দেন। ধর্মঘটে যোগ দেন প্রায় ৩ লক্ষাধিক শ্রমিক। তাঁরা কলকারখানা বন্ধ রেখে নেমে এলেন রাজপথে। মালিকরা তখনও শ্রমিকের দাবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন না। প্রতিবাদে ৩রা মে শ্রমিকরা সমাবেশের ডাক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে এসে যোগ দেন সেই সমাবেশে। সেদিন হে মার্কেটের বিশাল শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন অগাস্ট স্পিজ সহ অন্যান্য শ্রমিক নেতারা। শ্রমিকদের সেই সমাবেশ পন্ড করে দেয়ার জন্য পুলিশ বাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ শ্রমিকদের ওপর। শুরু হয় সংঘর্ষ, নিহত হন ১১ জন শ্রমিক। কোনো প্রমাণ ছাড়াই অভিযুক্ত করা হয় অগাস্ট স্পাইজ-সহ ৮ শ্রমিক নেতাকে। প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর প্রকাশ্যে ফাঁসি দেয়া হয় ৬ জনের, ১ জন কারাগারে আত্মহত্যা করেন, আরো ১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়। সমস্ত ন্যায় নীতি ও বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করেই ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল শ্রমিক নেতাদের। শ্রমিক আন্দোলনে সেটা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তবে শেষ পর্যন্ত সত্য আর গোপন থাকেনি। প্রায় ৬ বছর পরে ১৮৯৩ সালের ২ জুন ইলিয়নসের গভর্ণর আলটগেলড বিচারালয়ের আগের রায়কে বাতিল করে মুক্ত করে দিলেন অন্যান্য বন্দি শ্রমিক নেতাদের। আর তীব্র সমালোচনা করলেন বিচারকদের, আদালতের জুরি সভ্যদের মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীদের। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ১লা মে 'শ্রমিক দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছরের ১লা মে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের এই গৌরবময় অধ্যায়কে স্মারণ করে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে "মে দিবস" বা "আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস"। শুধু পালন হয় না আজও আমেরিকা ও কানাডাতে।

সভ্যতা বিনির্মানের নেপথ্যের মূল কারিগর হলো এই শ্রমজীবী মানুষ। তাঁদের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতির চাকা সচল রয়েছে। সেই শ্রমজীবী মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করে, তাঁদের জীবনমানের উন্নয়ন না করে, সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত না করে কখনোই পৃথিবী এগিয়ে যেতে পারে না। এগিয়ে যেতে পারে না বাংলাদেশ। বাংলাদেশের শ্রম বাজারে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি শ্রমিক জড়িত, যার প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিকই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের।

বিশাল অংশের এই শ্রমিকদের জন্য অর্থাৎ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের এই শ্রমিকদের জন্য এখন পর্যন্ত তেমন আইনি সুরক্ষাই গড়ে উঠেনি। তাই প্রয়োজন একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন। যে শ্রম আইন দেশের সকল শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা দিবে এবং অধিকার নিশ্চিত করবে।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে নিয়ে যাওয়ার সরকারের যে লক্ষ্য, সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সকল শ্রমিকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, ন্যায্য মজুরি, শ্রমিকের অধিকার ও কল্যাণসহ সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আজ প্রায় ৪৭ বছর হতে চললো। এখ পর্যন্ত স্বাধীন এই দেশটিতে শ্রমজীবী মানুষের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। এখন-ই সময় একটি জাতীয় মজুরি বোর্ড গঠন করে দেশের সকল শ্রমিকের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা। যাতে প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক কোনো খাতের শ্রমিকই ন্যূনতম মজুরি প্রাপ্তি থেকে কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয়। এখন পর্যন্ত খাত ভিত্তিক ৪১টি খাতের ন্যূনতম মজুরি থাকলেও উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রেই তার বাস্তবায়ন নেই। এমনকি প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই মজুরি পর্যালোচনার কথা থাকলেও অনেকগুলো খাতের ক্ষেত্রেই ২০/৩০ বছর ধরে তা হয়নি। ফলে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরির বাস্তবায়ন এবং মজুরি পর্যালোচনা এখন সময়ের দাবি। পাশাপাশি যে ৫৭টি খাতের মজুরি বোর্ড আজ অবধি গঠন করা হয়নি, সেইসকল খাতের জন্যও খাত ভিত্তিক মজুরি বোর্ড গঠন করে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা প্রয়োজন।

২০১৮ সালে অর্থাৎ এ বছরেই তৈরী পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য নতুন করে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারন হতে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হলো সবচেয়ে কম ন্যূনতম মজুরির দেশ। অথচ বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাকের রপ্তানিকারক দেশ। এই দ্বিতীয় বৃহত্তম হওয়ার জন্য কি শুধু মালিকদেরই ভূমিকা ? শ্রমিকদের কোন ভূমিকা নেই ? শ্রমিকদের ভূমিকা ছাড়া কি পোশাক খাত আজকের এই জায়গায় যেতে পারতো ? পোশাক খাতের এই শ্রমিকরা ছাড়া কি দেশ মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জন করতে পারতো এই খাত থেকে? যদি তাই হয় তাহলে কেনো এদেশের পোশাক খাতের শ্রমিকরা সবচেয়ে কম মজুরি পাবে?

এশিয়ায় ন্যূনতম মজুরি

দেশ	মাসিক মজুরি (ডলার)	দেশ	মাসিক মজুরি (ডলার)
বাংলাদেশ	৬৬	ভিয়েতনাম	১৪৬.৯৮
পাকিস্তান	১০৬.২৯	ইন্দোনেশিয়া	১৫৯.৮৮
শ্রীলংকা	৬৮.৬৬	মালয়েশিয়া	২২৩.৫৫
নেপাল	৭৪.৪২	থাইল্যান্ড	২৬৫.২৯
ভারত	১৪৩.৭৪	মঙ্গোলিয়া	৮১.৯৫
আফগানিস্তান	৭৩.৬৬	চীন	২৩৪.৫৩
মিয়ানমার	৮০.৩২	দক্ষিণ কোরিয়া	১৩৬০.৯৯
কম্বোডিয়া	১৪০	জাপান	১৬৯৮.৮৫

তাই আজ সামগ্রিক বিবেচনা করে অর্থাৎ বাজার মূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা বিবেচনা ও শ্রমিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে দাবি উঠেছে ১৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির। পোষাক খাতের শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবি মেনে নিয়ে তা বাস্তবায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। সেটা করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন পোশক শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে সচল থাকবে দেশের অর্থনীতির চাকা।

কিন্তু খেটেখাওয়া শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়ন কি হচ্ছে! যদি তা না হয়, তাহলে উন্নয়ন কাদের জন্য হচ্ছে? কারা এই উন্নয়নে ফুলেফেঁপে উঠছে? কত সংখ্যা তাদের ১০, ২০, ৫০ লাখ কিংবা ১ কোটি। তাহলে ১৬ কোটি মানুষের বাকি ১৫ কোটিকে পিছনে ফেলে কি দেশের উন্নয়ন সম্ভব অবশ্যই না। মুষ্টিমেয় মানুষের উন্নয়নকে কখনই একটি দেশের সমগ্র মানুষের উন্নয়ন বলা যেতে পারে না, যদি' না সেটা সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানুষের কাছে গিয়ে না পৌঁছে কিংবা সমভাবে বন্টিত না হয়।

আর শোষণ থেকে শ্রমিককে মুক্তি দিতে না পারলে কখনোই একটি মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তাই শ্রমিকের মুক্তি তথা শোষণ-বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিরামহীন সংগ্রামই হোক গোটা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের মহান মে দিবসের শপথ।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত: শ্রম অধিকার বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ

এ আর চৌধুরী রিপন
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (বিএফটিইউসি)

কৃষি থেকে শিল্পে রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ক্রমশ বড় হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় দুই বছর ধরে ৭ শতাংশ অতিক্রম করেছে জিডিপি প্রবৃদ্ধিহার। যদিও বাংলাদেশের এ অগ্রযাত্রা শ্রমবাজারে গুণগত পরিবর্তন আনতে পারছে না। কারণ, শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সিংহভাগই এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)র 'ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট সোস্যাল আউটলুক ট্রেন্ডস ২০১৮' প্রতিবেদন বলছে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজার বড় হচ্ছে যা দারিদ্র্য কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারত, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও নেপালে প্রায় ৯০ শতাংশ শ্রমিকই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখা গেছে সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপেও। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৫-১৬ অনুযায়ী, দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৬ দশমিক ২ শতাংশই এখনো অপ্রাতিষ্ঠানিক। বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৯-২০০০ সালে বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের হার ছিল ৭৫ শতাংশ। ২০০৫-০৬ সালে এ হার বেড়ে হয় ৭৮ শতাংশ। ২০১০ সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ৮৭ শতাংশে। ২০১৩ সালে এ হার ছিল ৮৭ দশমিক ৪ শতাংশ। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৩ সালে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৮ লাখ। ২০১৫-১৬ অর্থবছর শেষে তা বেড়ে হয়েছে ৫ কোটি ২৩ লাখ। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা কিছুটা কমলেও বেড়েছে নারী শ্রমিকের সংখ্যা। ২০১৩ সালে ১ কোটি ৫২ লাখ নারী শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত থাকলেও সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৭২ লাখে। জরিপের খাতভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের তথ্য অনুযায়ী, কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের ৯৭ দশমিক ৯ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক। অন্যদিকে, শিল্প খাতের ১০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক হলেও বাকি ৯০ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী 'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত' হলো- 'এরূপ বেসরকারি খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরির শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।' বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে কৃষি, চিংড়ি ও মৎস্য চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ, চাতাল শিল্পে নিয়োজিত রয়েছেন অসংখ্য অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৮ দশমিক ১০ শতাংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত। কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতে দিনমজুর ও নিয়মিত নিয়োগকৃত কর্মীর হার যথাক্রমে ১৮ দশমিক ১৪ শতাংশ ও ১৩ দশমিক ৯২ শতাংশ। বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতের হার ২১ দশমিক ৭৩ শতাংশ। দেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ গরিব দিনমজুর শ্রেণির কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র কৃষি। শ্রমশক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবছর কৃষিমজুরের সংখ্যা প্রায় দুই শতাংশ হারে বাড়ছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে চাতালশিল্প অন্যতম। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে মোট রাইস মিলের সংখ্যা ১৬ হাজার ৩৫০টি। এরমধ্যে ৩৮১টি অটোম্যাটিক (স্বয়ংক্রিয়) রাইস মিল, ২৮৩টি সেমি-অটোরাইস মিল ও ১৫ হাজার ৬৮৬টি হাসকিং মিল (ছোট রাইস মিল)। চাতালশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি। আনুমানিক হিসাবে এ সংখ্যা প্রায় চার লাখ। এর মধ্যে প্রায় ৩ লাখ নারীশ্রমিক বাকি ১ লাখ পুরুষ। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে সরকারের তদারকি সীমিত। শ্রম আইনের রক্ষাকবচ সেখানে অনুপস্থিত। এ খাতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলছে শ্রম শোষণ। ন্যায্য মজুরি ও কর্মপরিবেশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শ্রমিকরা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোনো শ্রমিককেই নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না। মূল বেতন ছাড়া অন্যান্য সুবিধা অল্প ও অনির্ধারিত। মজুরিতে নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রকট যা আমাদের সাংবিধানিক নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৪ তে

বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে। কৃষক ও শ্রমিকের এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।' সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিকের ন্যূনতম সংখ্যা এক কোটি। এ সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নারীর শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার ধারা ক্রমবর্ধমান হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেই তাদের সংখ্যা বেশি। আর নিম্নবিত্ত পরিবারের নারীরাই এ খাতে যুক্ত হচ্ছে বেশি। বিভিন্ন অবহেলা উপেক্ষা করে নারী তার অস্তিত্ব রক্ষায় নিজ উদ্যোগে কর্মসংস্থান বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুযায়ী দেশের শ্রমবাজারে হস্তশিল্প এবং সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৪ লাখ ৩০ হাজার ৩৪৫ জন। এর মধ্যে রয়েছে ২০ লক্ষাধিক হোমবেইজড শ্রমিক যারা ঘরে বসে দেশের টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকের বোতাম তৈরি, এমব্রয়ডারি, ব্লক-বুটিক, পুথির কারুকাজ ও নকশা করেন যাদের প্রায় সবাই নারী শ্রমিক। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রায় ১০ কোটি হোমবেইজড শ্রমিক রয়েছে যার মধ্যে ৫০ শতাংশের অবস্থান বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। এদের ৮০ শতাংশই নারী শ্রমিক।

দেশের এসব নারীশ্রমিকের প্রাপ্য অধিকারের কথা আজ অনেকক্ষেত্রেই অনুচ্চারিত। অসংগঠিত হোমবেইজড শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা ও সামাজিক সংলাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারে মালিক, সরকার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কারো উদ্যোগ যথেষ্টে নয়। সরকার সম্প্রতি শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে। মূলত গার্মেন্টস শিল্পের কথা ভেবে এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে দেশের তৈরি পোশাক পণ্যের বাজারজাতকরণের ক্ষেত্র পাওয়া জিএসপি সুবিধা স্থগিত হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় শ্রম আইন সংশোধনে রাজি হয় সরকার। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আইএলও-র পরামর্শে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সহজতর করা, নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে ৩০ শতাংশ শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বের নিয়ম শিথিল করা, ইপিজেডে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার প্রদান, রেজিস্ট্রেশন পেতে হয়রানি দূর করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে নমনীয়তা দেখায় সরকার।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এসব উদ্যোগের সবকিছুই তৈরি পোশাক শিল্প এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কথা ভেবে করা হচ্ছে। তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজিএমইএ-র তথ্য অনুযায়ী সারাদেশের ৪ হাজার ৪৮২ টি গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করেন মোট ৪০ লাখ শ্রমিক। অন্যদিকে গার্মেন্ট সাপ্লাই চেইনে যুক্ত রয়েছে ২০ লাখের বেশি হোমবেইজড শ্রমিক। কিন্তু তাদের ব্যাপারে কেউ ভাবছে না। শুধু হোমবেইজড শ্রমিক নয়, দেশের ওয়েস্টপিকারদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ঢাকা নগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রেখে আসলেও তাদের অধিকারের কথা আমরা ভুলে গেছি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুটি বর্জ্য সংরক্ষণাগারে ময়লা কুড়ানোর কাজে নিয়োজিত কয়েক হাজার ওয়েস্টপিকারের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তার দায় এড়িয়ে গেছে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা। হকারদের ব্যাপারেও ঠিক একই রকম হতাশার চিত্র। ওয়েস্টপিকার, হকার এবং হোমবেইজড শ্রমিকসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অন্যান্য শ্রমিকদের শ্রম আইনে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত ও শ্রমিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য দেশে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন বা নীতিমালা নেই। শ্রমিক আন্দোলনেও এ বিষয়টি এখনো খুব জোরালো গুরুত্ব পায়নি। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসব খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য কোনো সহায়তা ছাড়াই নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বেশ কয়েকটি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত উন্নয়ন ও বিকাশের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। এখান থেকে অধিকতর উন্নয়নের বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে দাঁড়াতে হলে এসব খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে। উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রণোদনার পাশাপাশি অবশ্যই শ্রমিকদের সব রকম অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আরেকটি বড় সমস্যা হলো, সারা বছর কাজ না পাওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব খাতে শ্রমিকরা নিয়োগপ্রাপ্ত হননা। ফলে কাজ থাকা না থাকার ওপর নির্ভর করে তাদের বেতন বা মজুরি প্রাপ্তি। কৃষিতে বর্তমানে গ্রামীণ মজুরদের বছরে ১৫০ দিনের বেশি কাজ থাকে না। তাই বছরের বাকি অর্ধেক সময়ে তাদের গ্রামের অকৃষি খাতে অথবা অন্যত্র কাজের সন্ধানে ছুটতে হয়। নির্মাণ এবং চাতালশ্রমিকদেরও বছরের কিছু সময় কর্মহীন থাকতে হয়। এসব শ্রমিকের জন্য সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা জরুরি।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় এনে তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। সব খাতে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, ন্যায্য মজুরি, কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা, স্বল্প ব্যয়ে আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি উদ্যোগে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, সুদমুক্ত ব্যাংক ঋণ, দারিদ্র্য ব্যাংক চালু, কাজের উপযুক্ত পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশ সরকার প্রণীত জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২-তে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে - 'দেশের মোট শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। যার মধ্যে রয়েছে- কৃষি, নির্মাণ, গৃহ, পারিবারিক ব্যবসা, চাতাল, ইটভাটা, গ্যারেজ, স্থল ও নৌবন্দর, পরিবহন খাত, আসবাব তৈরি, সমিল, কাঠমিস্ত্রী, ঝালাই, অটোমোবাইল, দোকান, হোটেল-রেস্তোরা, মৎস ও গবাদি খামার, পোল্ট্রি, প্যাকেজিং, কেমিক্যাল কারখানা, প্লাস্টিক কারখানা, ঔষধ শিল্প, স্বনিয়োজিত ইত্যাদি ধরনের ক্ষুদ্র ও মাঝারী খাত। এ ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকার প্রয়োজনে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আমরা চাই, জাতীয় শ্রমনীতির আলোকে সরকার হোমবেইজড শ্রমিক, ওয়েস্টপিকার, হকার ও কৃষিশ্রমিকসহ সব অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের কল্যাণের কথা ভেবে নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করুক, শ্রম আইনে তাদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিক। শ্রমবাজারে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক মানেই পরিচয়পত্র ও নিয়োগপত্রবিহীন শ্রমিক যাদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত নয়, শ্রম আইনে স্বীকৃত নয় মৌলিক শ্রম অধিকার। কাজের নিশ্চয়তা, ন্যূনতম মজুরি এবং অবসরকালীন সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়াই যাদের দিন কাটে নিতান্ত অনিশ্চয়তায়। দেশের ৫ কোটি ২৩ লাখ অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিককে অনিশ্চয়তায় রেখে অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসংস্থানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছেনা।

আমাদের মনে রাখতে হবে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের কাজের কোনো নিরাপত্তা নেই, মজুরি কাঠামোও প্রযোজ্য হয় না। ডিসেন্ট জবের ধারণাটিই হলো কাজের নিরাপত্তা, অবসর ভাতা, পরিবেশের প্রাণপ্রাচুর্য সংরক্ষণ, জ্বালানি ও কাঁচামালের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রভৃতি। এ বিষয়গুলো ইনফরমাল জবের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের মাঝে শিক্ষার নিম্নহার এবং দক্ষতা উন্নয়নের অভাবে শ্রম উৎপাদনশীলতাও সীমিত,। ফলে এরা নিজেদের জীবনমানে পরিবর্তন আনতে পারছে না এবং অর্থনীতিতেও কার্যকর অবদান রাখতে পারছে না। আমরা যদি সকল ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের আইনি অধিকার, শোভন কর্মপরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি, তাহলে অর্থনীতির চিত্র আরও দ্রুত পাল্টে দেওয়া সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকদের যথাযথ এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও এর দ্রুত বাস্তবায়ন।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সম্ভাবনা

কাজী সাইফুদ্দীন আহমদ
শ্রম উপদেষ্টা
বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
(অবসরপ্রাপ্ত শ্রম পরিচালক)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব সংগ্রাম করে চলেছে। যেকোনো দেশের উন্নয়নের জন্য শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। বৃহত্তর ও গরীয়ান শিল্প স্থাপনের জন্য অর্থ, অবকাঠামো, জমি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, শ্রমশক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনার চাহিদা ব্যাপক প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য এসব সরবরাহের চাহিদা অনেকটা কম হলেও চলে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদণ্ড বলা যায়। এ খাতটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। দেশে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অপরিমেয় অবদান রেখে থাকে। জনবহুল দেশগুলোর জন্য এরূপ শিল্প-কারখানা বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বিশেষ উপযোগী। কারণ এ খাতটি প্রচুর পরিমাণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে থাকে, আর এরূপ খাত প্রতিষ্ঠার জন্য তুলনামূলকভাবে স্বল্প মূলধন প্রয়োজন হয়ে থাকে। এরূপ প্রতিষ্ঠান গ্রাম-গ্রামান্তরে, শহর-উপশহরে সহজে স্থাপন করা যায় এবং মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণ করে থাকে। দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে পর্যাপ্ত অবদান রেখে থাকে। আইএমএফ এর কান্ট্রি রিপোর্ট (২০১২) থেকে জানা যায় বাংলাদেশে ৯০ শতাংশের অধিক ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা মূলত বড় ধরনের বাধা বলে পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্যাটি বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রকট। অথচ এ শিল্পটি দেশে জিডিপিতে যথেষ্ট অবদান রেখে থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ৯৮ শতাংশের বেশি শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প শ্রেণীভুক্ত। কারণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প হচ্ছে নতুন ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং নতুন শিল্প বা বাণিজ্য উদ্যোক্তাদের প্রতিভার বিকাশ। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয় অর্থনীতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গতিশীলতা ও জীবনীশক্তির জোগান দিয়ে থাকে। সরকারের দারিদ্র্যবিমোচনের কৌশলগত কার্যক্রম স্পষ্টভাবে মূলতত্ত্ব ও স্থিতিমাপ চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে, যা বর্তমানের দারিদ্র্য অবস্থার স্তর হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দ্রুত এবং অব্যাহত উন্নয়নের গতিধারা স্থায়ীরূপ পেলে দেশের দারিদ্র্যবিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের পথ প্রশস্ত হবে। শুধু তাই নয়, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে বেকারত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে আনতে পারবে। এ শিল্পে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার, পুঁজির প্রবাহ এবং স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে পারলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথ সুগম হবে।

এখাতে বাংলাদেশে লাভজনক সমৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা প্রচুর রয়েছে। দৃঢ় প্রত্যয়, উপযুক্ত নীতিমালা, অর্থের জোগান, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ এবং দক্ষ মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ধারা ত্বরান্বিত করতে পারলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় স্থান করে নিতে পারবে। গত তিন-চার বছরে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশ অনুন্নত অবস্থা ও অস্বচ্ছলতা থেকে মুক্ত হয়েছে এবং এর মূল কারণ হচ্ছে শিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গুণগত ও মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন। পুঁজি ও কাঁচামালের যথাযথ ব্যবহার, সরকারি নীতিমালার দ্রুত সংস্কার, শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস তাদের উন্নয়নের পথে নিয়ে গেছে। অবিশ্বাস্য গতিতে এসব দেশ সমৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে। লক্ষ্য করা গেছে, এসব দেশের কোনোটিরও শিল্পে ব্যবহারের জন্য নিজস্ব তেমন কোনো কাঁচামাল নেই। আমদানীকৃত কাঁচামাল সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মূল্যসংযোজন করে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির কারণে তারা অতি দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং আমরাও ঐসব দেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে পারি। অনেক প্রয়োজনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের বিপুল ও সম্ভাবনাময় মানবসম্পদকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করে মুক্তবাজার প্রতিযোগিতায় সক্রিয় ভূমিকা রাখার পথ সৃষ্টি করা।

আমাদের দেশের পোশাকশিল্প, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ও চামড়াজাতশিল্প ইতোমধ্যে বিশ্ববাজারে পরিচিতি লাভ করেছে। এমনিভাবে অন্যান্য শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটিয়ে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। দেশে বহুবিধ আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা রয়েছে। এসব সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মাধ্যমে যথোচিত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সরকার এসব সমস্যা নিরসনের জন্য সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী। মনে রাখতে হবে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এই বৃদ্ধি প্রতিরোধ না করতে পারলে দেশের সমৃদ্ধি কখনই আসবে না, বেকার সমস্যা মোকবেলা করা যাবে না। প্রতিনিয়ত আমাদের সচেতন হতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা সৃষ্টি করতে হবে এবং মানবসম্পদের উন্নয়ন ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

“শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই”

‘মে দিবস পালন ও শ্রমের মর্যাদা সংরক্ষণ’

এম এ রশীদ
অতিরিক্ত পরিচালক (অবঃ)
শ্রম অধিদপ্তর

আজ মহান মে দিবস। এ দিন সারা দুনিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং বিজয়ের প্রতীক। শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে মেহনতি মানুষের সার্বিক মুক্তি অর্জন, অধিকার আদায় রক্ষা করা এবং সামাজিকভাবে মেহনতি মানুষকে মানবিক মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই মহান মে দিবসের মর্মবাণী।

মে দিবস মেহনতি মানুষের ঐক্যের এবং অধিকার অর্জনের এক অনন্য দিন। মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন ও দৈনিক আট ঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবিতে ১৮৮৬ সালের পয়লা মে আমেরিকার শ্রমিকদের আন্দোলন ও পরবর্তীতে আত্মত্যাগ সারা বিশ্বের মেহনতি মানুষকে আন্দোলিত করেছে। তারই ফলস্বরূপ ১৮৯০ সাল থেকে এ দিনটি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক সংহতি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিন হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও শিল্পায়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ তথা শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে মালিক-শ্রমিক ও সরকারের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের অঙ্গীকারে দীপ্ত মহান মে দিবস অনুপ্রেরণার এক চিরন্তন উৎস। ১৩২ বছর আগের সেই মে দিবসের আবেদন আজও অম্লান।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, আধুনিক সভ্যতা ও মানব সমাজের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার মূল কারিগর হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণী। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণির ন্যায্য দাবি ও অধিকারকে অবজ্ঞা করে মানব সভ্যতার অগ্রগতি এবং নিরাপদ ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ার আশা করা যায়না। তাইতো এবারের মে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে **“শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই, সোনার বাংলা গড়তে চাই”**। মানব সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই পৃথিবী গড়ে উঠেছে একটি বিশাল কর্মশালা হিসেবে। কর্মের অস্তিত্বের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী। সভ্যতার চরম বিকাশের মূলে রয়েছে যুগ-যুগান্তর, অগণিত মানুষের অফুরন্ত শ্রম। মানব গোষ্ঠী তাদের মূল্যবান শ্রম উৎসর্গ করে পৃথিবীকে দিয়েছে সভ্যতার সোনালী মূর্তি। অথচ এদের নাম ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। এরা কালের ভেলায় চড়ে হারিয়ে গেছে অতীত সমুদ্রে, কিন্তু তাদের শ্রমের উজ্জ্বল স্বাক্ষরই সভ্যতার চরম উৎকর্ষতা। মে মাস এলেই তাদের সেই স্মৃতিকথা বিশ্বব্যাপী মানব হৃদয়ের স্পন্দনকে জাগিয়ে তোলে আর মনে করিয়ে দেয় মহান মে দিবসের রক্ত রঞ্জিত ইতিহাস। দৈনিক আট ঘন্টা কাজ, আট ঘন্টা বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদন এবং বিনোদনের অধিকার, নারী শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা নির্ধারণ, যোগ্য কাজের যোগ্য মজুরি প্রদান, কর্মকালীন দূর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, চাকরির শর্ত অক্ষুন্ন রাখা, শ্রম কল্যাণমূলক কাজের বহিঃপ্রকাশ, সঠিক সময়ে মজুরি প্রদান, শ্রমজীবী মানুষের স্বাধীনভাবে সমিতি বা ইউনিয়ন গঠণ করার অধিকার ইত্যাদি বহুমুখী অধিকার স্ফুরণ ঘটেছে মে দিবসের বলিষ্ঠ ভিত্তি থেকেই।

তাই মে দিবস কেবলমাত্র বিবর্ণ পঞ্জিকার একটি তারিখ নয়, এ দিবসটি রূপ নিয়েছে শ্রমিক সমাজের প্রত্যয় হিসেবে। শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর মুক্তির স্বপ্ন নিয়ে প্রতি বছর মে দিবস আসে শ্রমিক শ্রেণীর এগিয়ে চলার পাথেয় হিসেবে। অর্থাৎ শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রতি বছর মে দিবস এলে শ্রমিক শ্রেণী যেন আরও সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠে তাই মে দিবস পালনের গুরুত্ব অপরিহার্য।

মে দিবসের মূলবাণী ও প্রেরণাকে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করে ও শ্রমিক সম্প্রদায়কে একটি সুখী ও উন্নত জীবনদানই সরকারের লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুদয়, শোষণ ও সংগ্রামের ইতিহাসের সাথে মহান মে দিবসের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য। অতীতের সংগ্রামী ঐতিহ্য, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের চলার পথকে আলোক উজ্জ্বল করে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগায়। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে মহান মে দিবস বিশ্বে আজ স্বীকৃত।

বাংলাদেশে যেসব শ্রম আইন শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর কনভেনশনের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে, তার পূর্ণ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের শ্রম প্রশাসন দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে শ্রম বিষয়ক আইন প্রণয়ন মাত্রই শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত হয়ে যায়না। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন শ্রমিক-মালিক-সরকার পারস্পরিক সমন্বয় প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে সমভাবে প্রয়োজন মালিক শ্রমিক পরস্পর সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ। দমন- পীড়ন-শাসন-নির্যাতন নির্ভর ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে বিশ্বে আজ অংশীদারিত্ব, পারস্পরিক মূল্যবোধ ও সহযোগিতা নির্ভর সফল ব্যবস্থাপনার প্রচলন হয়েছে।

তাই বর্তমান মুক্ত অর্থনীতির জোয়ারে বিশ্বায়নের পটভূমিতে সংগঠন-আন্দোলনের নতুন কলাকৌশল, প্রেক্ষাপট এবং মাত্রা সম্পর্কে শ্রমিক সংগঠনগুলোকে আরও সচেতন হতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের শ্রম প্রশাসনে নীতিমালা প্রণয়ন এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, দেশের মাঠ পর্যায়ে এর অধীনস্থ শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করছে। শান্তিপূর্ণ পন্থায় শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের সহযোগিতায় এবং দেশে প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শ্রম অধিদপ্তর দেশে স্থিতিশীল শিল্পোৎপাদন ও কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এছাড়া শ্রম অধিদপ্তরাধীন দেশে ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে শ্রম আইন-২০০৬, শ্রম অর্থনীতি, শ্রম প্রশাসন, সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক, শ্রমিক শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মতৎপরতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিসহ অব্যাহত উন্নয়ন তৎপরতায় দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শ্রমিকদের কল্যাণে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রম অধিদপ্তরাধীন ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র এবং চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য চা-বাগান প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করে শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, কল্যাণ, শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। এইসব কর্মতৎপরতা মূলতঃ শ্রমিকদের কল্যাণের স্বার্থেই পরিচালিত।

মহান মে দিবস শ্রমিকদের দায়িত্ব কর্তব্য ও তাদের অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা দেয় এবং স্মরণ করিয়ে দেয়, শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য শ্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা। শ্রম দিয়ে থাকে শ্রমিক সমাজ। শ্রমিক যদি দক্ষতার সাথে, নৈপুণ্যের সাথে এবং নিষ্ঠার সাথে শ্রম দিতে পারে, তবে শ্রমিকের শ্রম হবে উৎপাদনশীল। মে দিবস শ্রমিক ও মালিক একে অপরের প্রতি দায়িত্ব, কর্তব্য, সৌহার্দ সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়, আন্দোলন বা বিদ্রোহ পরিহার করতে শেখায়, সর্বোপরি শিল্প বা বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও স্থায়ী করার প্রত্যয় শেখায়। এই শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হলে শিল্পের বিনাশ হবে, সম্পর্কের তিক্ততা বাড়বে এবং শ্রমিক কর্মহীন হবে আর মালিককে লোকসানের বোঝা বহন করতে হবে, সুতরাং এক্ষেত্রে মে দিবস পালনের গুরুত্বও অপরিসীম। মে দিবস পালনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক তথা শিল্পাঙ্গনে অনুকুল পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই সচেতন হয়ে ওঠে এবং দেশে প্রচলিত শ্রম আইন ও নিয়মনীতির উপর শ্রদ্ধাশীল হয়। শ্রমিক ও মালিক যদি তাদের দায়িত্ব পালনে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে শ্রম আইন মেনে চলে, তাহলে একইসংগে উভয়ের স্বার্থ বজায় থাকবে এবং দেশের শিল্পায়নে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সাধিত হবে। বাংলাদেশ সরকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও স্বার্থ সমুন্নোয়নকল্পে সচেতন ও সক্রিয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশ সংবিধানে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। প্রতিবছর মে দিবস আগমনে শ্রমিকদের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আরও বেশি করে নজর দেয়া হয়।

শ্রমই শক্তি। শ্রমের মাধ্যমেই মানুষ সন্ধান করে নতুন কিছু আবিষ্কারের পথ। আর সেই শ্রমের আর্শীবাদ এবং শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে আমরা বদ্ধপরিকর। প্রতিবছর মে দিবস পালনের মধ্য দিয়ে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমের আর্শীবাদ এবং শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণে আমরা আরো কর্মতৎপর হয়ে উঠেছি।

মহান মে দিবস অমর হোক, এ দিনের সংগ্রামী চেতনায় আসুন সবাই কলে-কারখানায়, ক্ষেতে খামারে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুক্ষিবুর রহমানের স্বনির্ভর সোনার বাংলা গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার ও শপথ গ্রহণ করি।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

International Labor Day: A Celebration of Workers Rights

Prof Dr. Md. Golam Azam
Institute of Social Welfare and Research
University of Dhaka

International Labor Day remains an important day for workers' rights all over the world. International Labor Day is celebrated on international level with a view to promoting and encouraging the international labor force and their associations. Labor Day is being celebrated worldwide every year on the first of May. This day has also been declared as the national holiday in approximately 80 socialist and non-socialist countries including Bangladesh. Labor Day is observed as an annual holiday for recognizing massive economic and social achievements of the workers who are doing works in multiple fields with experiencing oppression, deprivation and biopsychic agony.

Historical Origin of Labor Day

Labor Day is a glorious day in the history of working class worldwide. First day of May is observed as Labor Day to show respects to demands of the workers. Historically Labor Day originates from the United States labor union movement in the late 19th Century, particularly the eight-hour day movement, which vehemently advocated eight hours for work per day. In late nineteenth century the working conditions were largely unhealthy, unsafe and oppressive. Working people had to work 10-16 hours per day.After highly devoted efforts and movements made by the workers and socialists, eight-hours was declared as the legal time for the workers in the national convention at Chicago in 1884 by the American Federation of Labor.

In 1884 the FOLTU (Federation of Organized Trades and Labor Unions) which later became the American Federation of Labor passed a resolution that "eight hours shall constitute a legal day's labor from and after 1st May, 1886". By 1886 around 250,000 workers were involved in the eight-hour Day movement. On May 3, 1886, some workers gathered in demand of a minimum wage, safety laws, and eight hour work hours in a working day. On 4 May, the police acted to disperse a public gathering (assembly) in support of the strike when an unidentified person threw a bomb. Police also fired in the crowd of strikers at the Mc Comick Harvest Machine Company, Chicago. The event led to the death of eight and injury of sixty police officers as well as an unknown number of civilian killed or wounded. Hundreds of labor leaders and sympathizers were later rounded-up and four were executed by hanging, after a trial that was seen as a miscarriage of justice. The following day on 5 May in Milwaukee Wisconsin, the state militia fired on a crowd of strikers killing seven, including a schoolboy and a man feeding chickens in his yard. In historical reality , this day's event was a tragic, and heartbreaking. In order to commemorate the 1886 Haymarket Massacre in Chicago Labor Day was chosen to be International workers' day that would remind the workers for their legal rights, demands and collective consciousness and unity.

Labor Day: Driving Force to the Rights of Workers

Labor Day is celebrated to pay tribute to the contributions the workers have made to build the world stronger and prosperous. This day is dedicated to the workers for their economic and social contribution and achievements. It is celebrated to finish the struggle as well as to promote the importance of eight-hour work day. It is important to state that deaths, injuries and other dreadful conditions of the workers were very common at the workplace during the 1860's and working people were very agitated throughout the workday until the 8-hour workday was declared. The history of industrial revolution says that at the beginning of Industrial Revolution people had to work long hours (10-16 hours a day) both day and night with gruesome experiences in mind, body and spirit. They were forced to work in severe unhealthy, unsafe and life-threatening working condition. When all the workers stood up with collective determination, these inhuman tortures to the workers

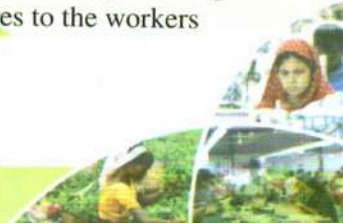

stopped. But it is true that if the workers would not strongly stand up and demand their rights, future generation would fail to enjoy all the productive privileges of the present day workers. As a matter of fact, Labor Day is most significant for the workers both manual and mental worldwide. The world community, therefore, needs to observe Labor Day with the great passion and feeling for the maximum wellbeing of the working force suffering from daily pains of deprivation and oppression. Therefore the workers need to have the rights to safe and healthful work place, good health, protection from job hazards, protection against forced and compulsory labor, freedom of association, elimination of discrimination and so forth.

Importance of Realizing Rights of Workers

For many decades, the working class was forced to work extra hours and paid very less wages. In order to protest against the owners of business establishments and other employers and put up a big symbol of their demand, Labor Day is celebrated in most of the countries of the world. Labor Day has assumed a special significance after the Socialist Revolution in Russia and subsequent revolutions in some other countries. The rights of workers were recognized by the founding of the International Labor Organization (ILO), an important auxiliary organ of the UNO. The ILO has established some conventions calling upon management and workers of all countries to abide by them, thereby conserving the rights of workers.

However, the people of entire world should admit that many things still remain to be done to ameliorate the conditions of the workers in the unorganized sectors. Human injustice and oppressions towards the working class have to be demolished with the spirit of establishing humanistic philosophy-the workers are human, they have rights to life and need to live with the fullest enjoyment of human rights, justice and maximum wellbeing. It is fact that the workers in the unorganized sectors are still forced to work longer with low wages. Workers are also partly to blame for their ordeals and miseries. Workers-in both organized and unorganized sectors-are yet to develop class consciousness. Being guided by a 'false consciousness', they are now divided into several groups and sub-groups which has resulted in their lack of unity and cohesiveness.

Despite the fact, workers are believed to be the backbone of a country's economy. A nation like ours cannot genuinely progress and prosper if its working force is dissatisfied and unhappy with their economic and social status. The economic development of the country will be truly effective only when the government and management realize the central importance of the workers in the economic sphere. Over a couple of decades, the use of machine and technology has tremendously increased globally but the significance of labor or human hand is still high. As Karl Marx emphatically held the view that 'labor adds to the value of a good' it would therefore be unwise on the part of the government to dissatisfy its work-force by denying its due. Today the reality is that the workers are not going to have recognition and justice by sitting divided and silent. They need to unite as they have to lose nothing but their chains, as Marx said. Labor Day is, however, celebrated yearly as an official holiday throughout the world to acknowledge the bright accomplishments and contributions of the workers. In Bangladesh, the people of different social groups heartily enjoy celebration of the Labor Day by arranging various magnificent programs.

However, socialist and non-socialist countries across the globe observe Labor Day with a strong determination of doing good for the working class. In addition, a range of demonstrations, speeches, protests processions, rallies and parades are organized by the people of working class.In Bangladesh, hardly 15% of the country's work forces are employed as workers and here Labor Day is observed with varied ceremonies that show the claims of realizing workers' rights. On Labor Day, rallies and processions are organized by the workers not to demonstrate their grievances, but to celebrate the victories that they had been able to achieve in the past. This day reminds the workers of their rights and leads to rising voice for ensuring their logical demands, legal human and labor rights as well. However, according to Human Rights Watch, garment workers in Bangladesh face poor working conditions and anti-union tactics by employers including assaults on union organizers. In the two years since the catastrophic Rana Plaza factory collapsed on April 24, 2013 claiming more than 1,100 workers lives, efforts are underway to make Bangladesh factories safer, as the New York-based rights organization said. But the government and western retailers should do more to enforce international labor standards to protect workers' rights, including

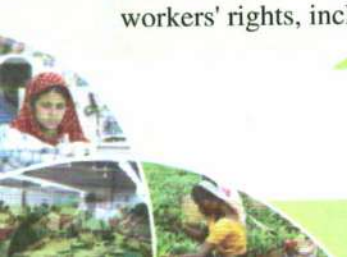

their right to form unions and advocate for better conditions. "If Bangladesh wants to avoid another Rana Plaza disaster, it needs to effectively enforce its labor law and ensure that garment workers enjoy the right to voice their concerns about safety and working conditions without fear of retaliation or dismissal," said Phil Robertson, Asia deputy director at HRW. In this regard, the Bangladesh government, factory owners, and western retailers and also the concerned workers' rights body should take initiatives coordinately to ensure respect for workers' rights and end the unlawful targeting of labor leaders by factory owners and supervisors.

In fine, it can be said that the time has passed with its due course but the memorial event of Chicago massacre is still in the mind of those people who are inclined to do something for the betterment of the working class. Though this brutal incident did silence the workers (who were killed) but that day's memory will survive them for long. In fact, since 1886 not only the martyrs (like August Spies, Alfred Parsons, George Engel etc.) are remembered on the Labor Day but also the workers use the occasion to take up their issues with their concerned authorities and governments across the globe. Taking the memories in the same line, Bangladesh should do the best for upholding the rights of workers and maximize their wellbeing necessary for satisfactory life. Actually respect for workers' rights helps ensure equal opportunities for all women and men to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security, and dignity.

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

শ্রম আইন এবং শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন

ডাঃ এ.এম.এম আনিসুল আউয়াল, পিএইচডি
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের একটি বিরাট অংশই কোন না কোন প্রকার শ্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা সবাই শ্রমিক (প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক) হিসেবেই চিহ্নিত। আমি তাঁদের মেহনতি মানুষ হিসেবেই বলতে বেশী আগ্রহী।

দেশে দেশে যুগে যুগে বিভিন্ন সরকার তার দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ জনগনের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে থাকে ১৯৭১ সালে জন্ম নেয়া আমাদের এই প্রানপ্রিয় মাতৃভুমির জনগণের কল্যাণে সব সরকারই সময় সময় বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আপামর জনগনের জান-মালের নিরাপত্তা প্রদানসহ আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মেহনতি জনগনের জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যেন তারা কাজের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করতে পারে।

পূর্বের শ্রম আইনসমূহ পর্যালোচনা করে ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে একটি সমন্বিত শ্রম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ আইনকে আরও যুগোপযোগী করে ২০১৩ সালে সংশোধিত শ্রম আইন জারী করা হয়। আইনটি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা যেমন বৃদ্ধি করেছে, তেমনি তাদের কল্যাণের ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড)- এ কর্মরত শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারসহ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ, ভবিষ্য তহবিলের ব্যবস্থা কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার মতো কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ নতুন আইনে স্থান পেয়েছে।

শ্রম আইনে শ্রমিকের চাকরি অবসানে ক্ষতিপুরণের আওতা বেড়েছে। বেড়েছে দূর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ। মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা বা প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, মৃত্যুজনিত সুবিধার বিধানও রাখা হয়েছে। পাশাপাশি বীমাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু সরকারি নয়, বেসরকারি খাতে শ্রমিকগণের ভবিষ্য তহবিল গঠনের জন্যও বলা হয়েছে। সমন্বিত এই শ্রম আইনে শ্রমজীবীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রমমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠনের বিধানের ওপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে কল্যাণ নিশ্চিত করেছে। পাশাপাশি তৈরী পোশাক শিল্প কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় তহবিল। সরকার যে শ্রমিকদের সমস্যা সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন তা এই সব আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে।

শিল্পোউন্নয়নের পূর্বশর্ত শিল্পে শান্তি। এতে মালিক, শ্রমিক ও দেশের প্রতিটি মানুষ উপকৃত হয়। উৎপাদন হ্রাস পেলে বা উৎপাদনের মান ক্ষুন্ন হলে যেমন মালিককে লোকসানের বোঝা বহন করতে হয়, তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হলে শ্রমিকদেরও বেকারত্বের বোঝা বহন করতে হয়। শিল্পোন্নয়নের অংশীদার হিসেবে মালিকের সাথে শ্রমিকের সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ না হলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। একদিকে বিনিয়োগ না হলে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না, অন্যদিকে নিষ্ঠার সাথে শ্রম না দিলে শিল্পের উৎকর্ষ ঘটে না। শিল্পে মালিক ও শ্রমিকের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে উন্নয়ন গতিধারা বৃদ্ধি, বেকারত্ব দূর এবং সর্বোপরি বাণিজ্য কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তৃত হয়। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, শ্রমের মর্যাদা, নারী শ্রমিকের কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সহযোগিতামূলক কাজের পরিবেশ ছাড়া গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থা আশা করা যায় না।

বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ অপ্রতিষ্ঠানিক বা অসংগঠিত সেক্টরে কর্মরত। এই সেক্টরে রয়েছে দর্জি, রিক্সা, ভ্যান, সড়ক পরিবহণ, নৌ পরিবহণ, হকার্স, কুলি, ট্যানারি, গৃহশ্রমিক, কৃষি শ্রমিকসহ আরো অনেকে যারা সরকারের বেশিরভাগ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিক কাজ করে কৃষি, গার্মেন্টস ও গৃহ কাজে। এ নারী শ্রমিকরা অস্বচ্ছল, অবহেলিত ও নির্যাতিত।

তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাসহ সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্তা, সরকার ও মালিকদের আরও উদ্যোগি হতে হবে। গৃহ শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য ইতোমধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্প মালিকদের অনুধাবন করতে হবে বিশ্বায়নের এ যুগে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে অন্তর্জাতিক শ্রমমান নিশ্চিত করতে হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিসহ একটি সুস্থ্য-সবল শিল্প সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শোভন কাজ, বাঁচার মতো মজুরি, শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া এবং যৌথভাবে দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা শিল্প বিকাশের জন্য যেমন অপরিহার্য তেমনি টেকসই উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য শিল্পোন্নয়নের ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কোনো বিকল্প নাই। সুশাসন, প্রশাসনিক দক্ষতা, সততা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা - আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে দেশের অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাবে, বেকারত্ব দূর হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। এই নীতিমালার আলোকেই অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থনৈতিক জোন অঞ্চলভিত্তিক নারী পুরুষসহ সব শ্রেণির মানুষের উন্নয়নে সহায়তা করবে।

বিদ্যমান শ্রম আইন পূর্বের চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছ। শ্রমিকদের কল্যাণে প্রচলিত আইনটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সময়ের প্রয়োজনে সরকার শ্রম আইন আরও উন্নত ও প্রায়োগিক করতে চলেছে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মালিক ও শ্রমিক দুই পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে সব ধরনের বিরোধ দূর হতে পারে। নারী, পুরুষ, মালিক ও সরকার সবাই মিলে একসাথে কাজ করলে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি এই আইনের যে সব দুর্বল দিক রয়েছে তা হালনাগাদ করে শ্রমিক-মালিক এবং সরকার সবাই উন্নয়নের মহাসড়কে পা রাখবে এটা আমার বিশ্বাস।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবছর এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্ব শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। বার্ষিক জিডিপি হার ৭ শতাংশের ওপর দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু আয় ১৭০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ফলে আর্থসামাজিক অবস্থা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক ভালো। কর্মপরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। ফলে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষ পূর্বের তুলনায় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

May Day:
How May 1 Became a Holiday for Worker's

A.T.M SAIFUL ISLAM
Deputy Secretary
Ministry of Labour and Employment

May Day is especially the day for the dissemination of the ideas of international solidarity among workers, a day for international action against discrimination and disagreement and to established equality, equity, justice and rights among workers. The origin of May Day is indissolubly bound up with the struggle for the shorter workday. The Chicago 8-hour movement, culminating in the strike on May First, 1886, forms by itself a glorious chapter in the fighting history of the working class

Eight-Hour Movement Started in America

The 8-hour day movement which directly gave birth to May Day, must, however, be traced to the general movement initiated in the United States in 1884. On August 20, 1866, there gathered in Baltimore delegates from three scores of trade unions who formed the National Labor Union. The movement for the national organization was led by William H. Sylvis, the leader of the reconstructed Molders' Union, who, although a young man, was the outstanding figure in the labor movement of those years. Sylvis was in correspondence with the leaders of the First International in London and helped to influence the National Labor Union to establish relations with the General Council of the International. It was at the founding convention of the National Labor Union in 1866 that the following resolution was passed dealing with the shorter workday: "The first and great necessity of the present, to free labor of this country from capitalist slavery, is the passing of a law by which 8 hours shall be the normal working day in all states in the American union. We are resolved to put forth all our strength until this glorious result is attained."

Eight-hour leagues were formed as a result of the agitation of the National Labor Union; and through the political activity which the organization developed, several state governments adopted the 8-hour day on public work and the U. S. Congress enacted a similar law in 1868. decision for the 8-hour day was made by the National Labor Union in August, 1866. In September of the same year the Geneva Congress of the First International went on record for the same demand

Preparations for May Day Strike

Although the decade 1880-1890 was generally one of the most active periods in the development of American industry and the extension of the home market, the year 1883-1885 experienced a depression which was a cyclical depression following the crisis of 1873. The movement for a shorter workday received added impetus from the unemployment and the great suffering which prevailed during that period, just as at the present time the demand for a 7-hour day is becoming a popular issue on account of the tremendous unemployment which American workers are experiencing.

The great strike struggles of 1877, in which tens of thousands of railroad and steel workers militantly fought against the corporations and the government which sent troops to suppress the strikes, left an impress on the whole labor movement. It was the first great mass action of the American working class on a national scale and, although they were defeated by the combined forces of the State and capital, the American workers emerged from these struggles with a clearer understanding of their class position in society, a greater militancy and a heightened morale.

The Federation, first to inaugurate the movement and definitely to set a date for the strike for the 8-hour day, also grew in numbers and particularly in prestige among the broad masses of the workers. Eight-hour day leagues and associations sprang up in various cities and an elevated spirit of militancy was felt throughout the labor movement, which was infecting masses of unorganized workers.

The Strike Movement Spreads

The number of strikes during 1885 and 1886 as compared with previous years shows what a spirit of militancy was animating the labor movement. Not only were the workers preparing for action on May First, 1886, but also in 1885 the number of strikes already showed an appreciable increase. During the years 1881-1884 the number of strikes and lockouts averaged less than 500, and on the average involved only about 150,000 workers a year. The strikes and lockouts in 1885 increased to about 700 and the number of workers involved jumped to 250,000. In 1886 the number of strikes more than doubled over 1885, attaining to as many as 1,572, with a proportional increase in the number of workers affected, now 600,000. How widespread the strike movement became in 1886 can be seen from the fact that while in 1885 there were only 2,467 establishments affected by strikes, the number involved in the following year had increased to 11,562. In spite of open sabotage by the leadership of the knights of leader, it was estimated that over 500,000 workers were directly involved in strikes for the 8-hour day.

The strike center was Chicago, where the strike movement was most widespread, but many other cities were involved in the struggle on May First. New York, Baltimore, Washington, Milwaukee, Cincinnati, St. Louis, Pittsburgh, Detroit, and many other cities made a good showing in the walkout. The characteristic feature of the strike movement was that the unskilled and unorganized workers were drawn into the struggle, and that sympathetic strikes were quite prevalent during that period. It is estimated that about half of the number of workers who struck on May First were successful, and where they did not secure the 8-hour day, they succeeded in appreciably reducing the hours of labor.

The Chicago Strike and Haymarket

The May First strike was most aggressive in Chicago, which was at that time the center of a militant Left-wing labor movement. On the Sunday before May First the Central Labor Union organized a mobilization demonstration which was attended by 25,000 workers. On May First Chicago witnessed a great outpouring of workers, who laid down tools at the call of the organized labor movement of the city. It was the most effective demonstration of class solidarity yet experienced by the labor movement itself. The importance at that time of the demand - the 8-hour day - and the extent and character of the strike gave the movement significant political meaning. This significance was deepened by the developments of the next few days. The 8-hour movement, culminating in the strike on May First, 1886, forms by itself a glorious chapter in the fighting history of the American working class.

But revolutions have their counter-revolutions until the revolutionary class finally establishes its complete control. The victorious march of the Chicago workers was arrested by the then superior combined force of the employers and the capitalist state, determined to destroy the militant leaders, hoping thereby to deal a deadly blow to the entire labor movement of Chicago.The events of May 3 and 4, which led to what is known as the Haymarket Affair, were a direct outgrowth of the May First strike. The demonstration held on May 4 at Haymarket Square was called to protest against the brutal attack of the police upon a meeting of striking workers at the McCormick Reaper Works on May 3, where six workers were killed and many wounded. The meeting was peaceful and about to be adjourned when the police again launched an attack upon the assembled workers. A bomb was thrown into the crowd, killing a sergeant. A battle ensued with the result that seven policemen and four workers were dead. The blood bath at Haymarket Square, the railroading to the gallows of Parsons, Spies, Fischer, and Engel, and the imprisonment of the other militant Chicago leaders, One year after the hanging of the Chicago labor leaders, the Federation, now known as the American Federation of Labor, at its convention in St. Louis in 1888, voted to rejuvenate the movement for the 8-hour day. May First, which was already a tradition, having served two years before as the concentration point of the powerful movement of the workers based upon a political class issue, was again chosen as the day upon which to re-inaugurate the struggle for the 8-hour day. May First, 1890, was to witness a nation-wide strike for the shorter workday.

May Day Becomes International

On July 14, 1889, the hundredth anniversary of the fall of the Bastille, there assembled in Paris, the Paris Congress adopted the following resolution:

"The Congress decides to organize a great international demonstration, so that in all countries and in all cities on one appointed day the toiling masses shall demand of the state authorities the

legal reduction of the working day to eight hours, as well as the carrying out of other decisions of the Paris Congress. Since a similar demonstration has already been decided upon for May 1, 1890, by the American Federation of Labor at its Convention in St. Louis, December, 1888, this day is accepted for the international demonstration. The workers of the various countries must organize this demonstration according to conditions prevailing in each country."But May Day, 1890, was celebrated in many European countries, and in the United States.

In the United States, the Chicago and New York demonstrations were of particularly great significance. Many thousands paraded the streets in support of the 8-hour day demand; and the demonstrations were closed with great open air mass meetings at central points. At the next Congress, in Brussels, 1891, the International reiterated the original purpose of May First, to demand the 8-hour day, but added that it must serve also as a demonstration in behalf of the demands to improve working conditions, and to ensure peace among the nations.

Conclusion: Bangladesh is labour intensive and 7th largest workforce country in the world. Around 10-11 million worker's have been working abroad and contributing world GDP. Bangladesh is going to be a middle income country. So ensuring the worker's social justice and social security and to established the dignity of labour, minimum labour wages, decent workplace, insurance, accidental compensation, rehabilitation and freedom of association and protection of the right to organize convention is very necessary and the Great May Day is the source of inspiration.

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

Bangladesh's Graduation from the Least Developed Country to a Developing Country: Implications for the Labour Sector

Md. Humayun Kabir
Deputy Chief
Ministry of Labour and Employment

Bangladesh is becoming a middle-income country by 2021 and she envisions being a developed country by 2041. For this the country requires to pass through a smooth transformation towards step by step graduation. In July 2015 the country has advanced from a low-income country to a lower middle-income country based on the per capita income categories provided by the World Bank. It is a matter of great pride that this year Bangladesh has fulfilled the criteria for graduation from the least developed country (LDC) into a developing country category provided by the United Nations. It is important to mention that Bangladesh is the only country that has fulfilled all three criteria although only two criteria were required to be fulfilled. The Bangladesh's eligibility for graduation was considered during the triennial review of LDCs in the 20th plenary session of United Nation's Committee for Development Policy (UN-CDP) held in New York during 12-16th March, 2018. The eligibility for graduation was formally announced on Friday evening on 16 March 2018 along with a letter of announcement to the Ambassador and Permanent Representative of Bangladesh to the United Nations in New York. The fulfillment of criteria leading to graduation is a major step forward and historic achievement. After graduation, as a developing country, Bangladesh be importance will increased in the international arena. The economic basis of Bangladesh will be considered as strong. This will, to some extent, help mitigate Bangladesh's economic risks to attract foreign investment in private and public sectors. The process, however, might have some implications for the country's economy as a whole including the labour sector. The article is an attempt to conceptualize the classification of countries, process of graduation, initiatives for smooth transition and implications of graduation in labour sector of Bangladesh based on the information gathered from different sources particularly form the United Nations and the Bangladesh Centre for Policy Dialogue (CPD).

2. Classification of Developing Countries

Based on development criteria and development challenges, several categories of developing countries have emerged to fulfill the bureaucratic necessities of different development organizations. The need for recognition of LDC was first discussed in the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) held in Geneva in 1964. Because the LDCs could not always be expected to get benefit fully or automatically from the international policies and measures adopted in favour of all developing countries. They required special supplementary support to remove the handicaps that limited their ability to get the supports from the international community. Therefore, the objective of the recognition of LDC was to attract special support measures from international community including the preferential treatment in the World Trade Organization (WTO). The concept of LDC was formally recognized by the UN General Assembly (UNGA) in 1971. The low-income countries suffering from the most severe structural impediments to sustainable development are classified as LDCs.

The classifications of developing countries by United Nations and the World Bank are widely recognized and used. The LDCs' classification of the United Nations is based on development criteria and development challenges. In 2018 a country with per capita Gross National Income (GNI) (3-year average) of US$1025 or below, Human Assets Index (HAI) of 62.0 and below and Economic Vulnerability Index (EVI) of 36.0 and above is considered as an LDC by the UN. The World Bank category is based only on per capita GNI (three year average), for the current 2018 fiscal year (based on 2016 income), the range of which is US$1005 or less and between US$1006 to US$3,955 respectively for low-income countries and lower middle-income countries. The World Bank's classification is used to make lending decisions and to provide concessional financing in terms of lower interest rates and debt relief to be offered to a country. The both United Nations and World Bank criteria are updated periodically.

Initially in 1971 a number of 25 UN member countries were categorized as LDCs. From the inception a total of 48 countries were recognized as LDCs including 34 African, 9 Asian, 4 Pacific and 1 Caribbean country. Bangladesh was included as an LDC in 1975.

3. Graduation Process

The graduation means leaving of a country from the LDC category assigned by United Nations which involves a systematic procedure. A schematic process of graduation is sown in the flow chart

(Figure 1).

The United Nation's Committee for Development Policy (UN-CDP) is mandated by the UN General Assembly (UNGA) and the ECOSOC to review the list of LDC category of countries in every three year and to make recommendation on the inclusion and graduation of eligible countries using a set of criteria. A country must fulfill the eligibility criteria in two consecutive reviews before making recommendation for graduations. Based on the vulnerability profile and impact assessment reports placed by the UNCTAD and United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA) in the 2nd triennial review (TR), the recommendation for graduation is endorsed by the ECOSOC and the proposal is placed for information in the UNGA. Once the UNGA takes note of the recommendation the country graduates from the LDC category.

Graduation becomes effective normally after a transition period of three years to allow the LDC to prepare for graduation. Graduated country also graduates out of the preferential market access regime. From the year of first fulfillment of the graduation eligibility criteria normally it takes minimum nine years to complete smooth graduation of a country. During this period the country passes through assessment of country profile by the UN-CDP. The views of the country are also considered. Based on the vulnerability profile and impact assessment findings, graduation of a country might be delayed. However, once graduated, the graduated country must accept the status and there is no option for rejection.

Figure 1: Graduation flow chart

4. Graduation Criteria

The criteria to identify LDCs were first applied in 1971 for inclusion of LDCs by the United Nations. However, the graduation rules were established in 1991 when the first systematic triennial reviews of LDCs was conducted. The criteria have always included three components: income, social progress and economic vulnerability. The criteria are developed and refined periodically by the UN-CDP to incorporate new development concerns, relevant advances in economic theory and greater data availability. For instance, maternal mortality ratio indicator was newly added in 2018 review. For graduation a country must meet two of the three threshold criteria for two consecutive triennial reviews. The LDC inclusion and graduation thresholds that were used for 2018 triennial review are presented in Table 1.

Table 1: LDC inclusion and graduation thresholds used for 2018 triennial review

Process	Per Capita Gross National Income (GNI)	Human Assets Index (HAI)	Economic Vulnerability Index (EVI
Inclusion	US$1,025 or below	62.0 or below	36.0 or above
Graduation	US$1,230 or above	66.0 or above	32.0 or below

Source: UN-CDP, 2018 triennial review.

A country may graduate based only on per capita income without fulfilling the HAI and EVI graduation thresholds. The income-only graduation threshold is twice the per capita income graduation threshold which is $2,460 or above for the year 2018.

The low level of human assets represents a lower development of human capital. High economic vulnerability indicates higher risks for economic development. For sustainability reasons, graduation thresholds are set at higher (lower) level compared to inclusion thresholds. Since 1991, recommendations for graduation are being made on the basis of triennial reviews of countries based on these criteria. In last 47 years since categorization of LDCs, only five countries - Botswana (1994), Cabo Verde (2007), Maldives (2011) and Samoa (2014); and Equatorial Guinea (2017, income only) - have graduated.

5. Fulfillment of Graduation Criteria by Bangladesh

Bangladesh has fulfilled the criteria for eligibility for graduation in terms of per capita income (GNI), human assets index (HAI) and economic vulnerability index (EVI). Bangladesh is the first LDC which has fulfilled all criteria for graduation. The scores of GNI, HAI and EVI of Bangladesh, LDCs and developing countries as of March, 2018 are presented in Table 2.

Table 2: Scores of GNI, HAI and EVI of Bangladesh, LDCs and developing countries

Indicator	GNI	HAI	EVI
Graduation score	US$ 1,230 or above	66.0 or above	32.0 or below
Average of all LDCs' score	US$ 1,229	53.1	41.3
Bangladesh score	US$ 1,274	73.2	25.2
Average of all developing countries	US$ 7,064	76.4	34.7

Source: UN-CDP, 2018 triennial review. Figure:2

Per Capita Income Criteria

In terms of the per capita gross national income (using the World Bank Atlas conversion criteria (3 year average), Bangladesh has exceeded the LDCs average since 1996. This year Bangladesh has crossed the graduation threshold income of US$1,230 with per capita income of US$1,274.

Human Assets Index (HAI)

Remarkable economic growth has helped the poor in Bangladesh. Since 1990 about 50 million people left extreme poverty, as defined by the World Ban Contributing, a reduction in the poverty rate from 40% to 14%. The government of Bangladesh has provided vital health and education services to the poor, translating into rapid improvements in the human assets index used by the UN-CDP. With the increases across the five components of the human assets index - infant mortality, maternal mortality, undernourishment, adult schooling and adult literacy - over the years, Bangladesh exceeded the threshold on this index for the first time in 2016 having the HAI of 73.2 in 2018 (Figure 3).

Figure 2: Per capita gross national income (US$, Atlas conversion), 1976-2018

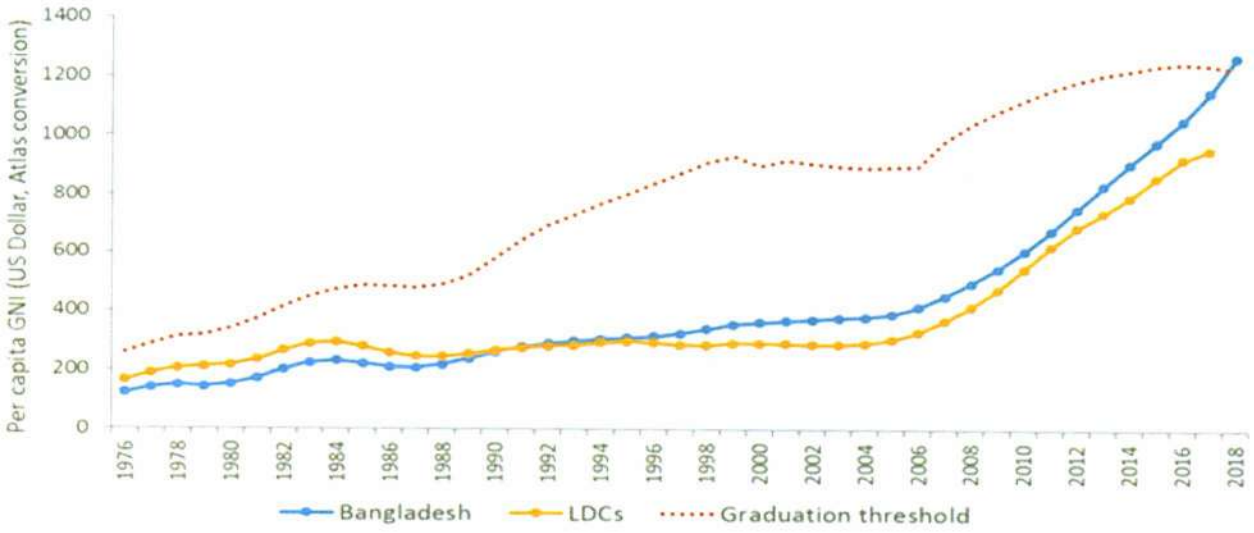

Source: UN-CDP

Figure 3: Decomposition of human assets index (Hai) Of Bangladesh, 2018

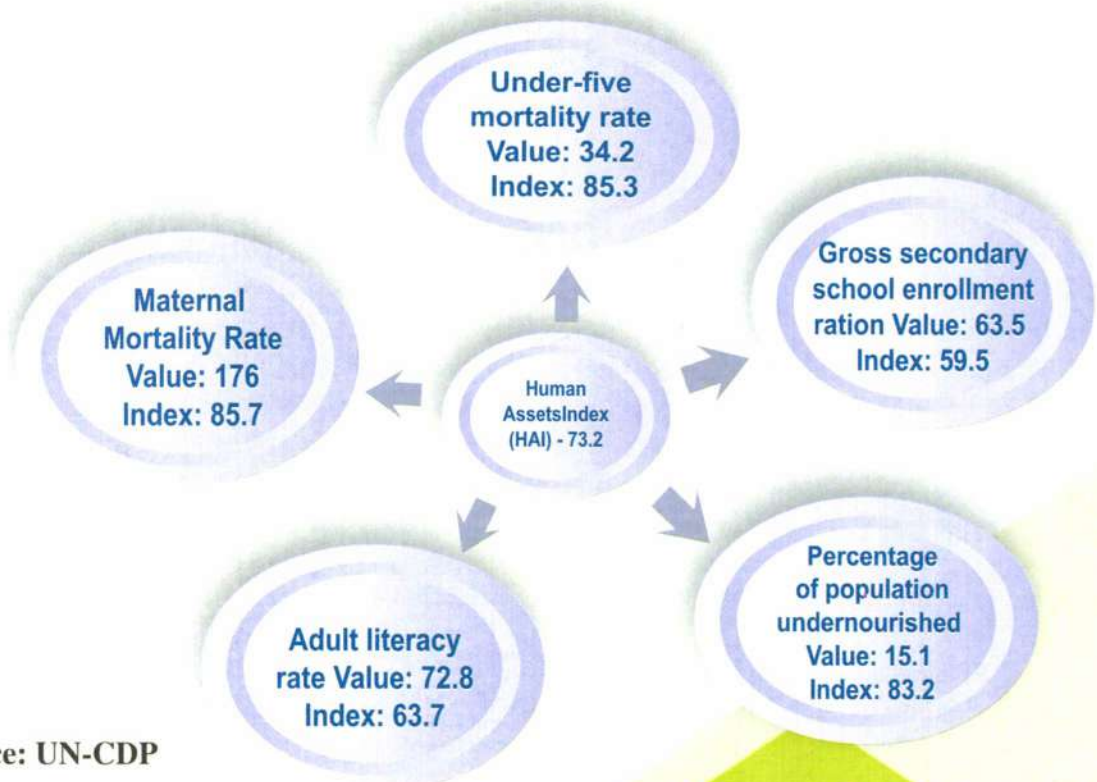

Scurce: UN-CDP

Economic Vulnerability Index (EVI)

Bangladesh also enjoyed a reduction in economic vulnerability. The economic vulnerability index has consistently decreased since 2003 when for the first year it fell below the UN-CDP's official threshold. The decomposition of economic vulnerability index (EVI) of Bangladesh in terms of eight indicators is shown in the Figure 4-

Figure 4: Decomposition of economic vulnerability index (EVI) of Bangladesh, 2018

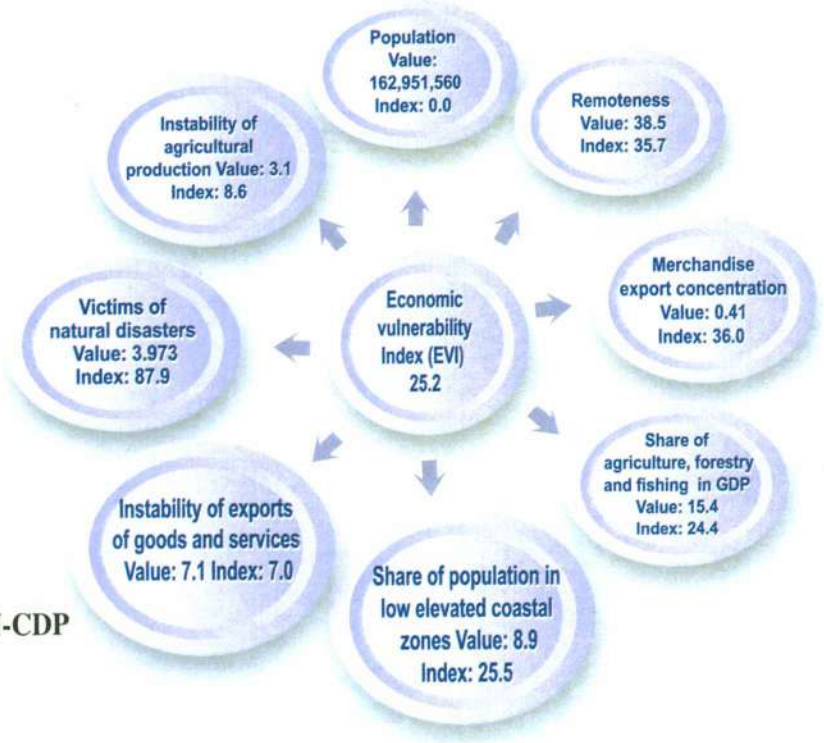

Source: UN-CDP

6. Factors Contributed to the Success

In 1974 per capita income of the Bangladeshi people was only US$110 which has increased to US$1,544 in 2016/17. During last ten years per capita income has been doubled. As a result, the percentage of the people below the poverty line has reduced from 56.6% in 1992 to 24.3% in 2016 (HIES, 2016). Foreign exchange reserve has increased from US$121 million in 1981-82 to US$33,407 million on 30 June, 2017. During last several years the economic growth in Bangladesh has exceeded 6% which has been one of the fastest growth rates in the world in recent years. Presently the economy of Bangladesh is the 43rd largest economy in the World. The economy has developed largely on the basis of textile and garment exports. Clothing forms a higher share of exports than in any other country. Remittances, natural gas, shipbuilding and seafood, as well as information communications and pharmaceuticals are all emerging sources of foreign exchange and economic growth.

7. Pathway for Effective Graduation of Bangladesh

Similar to other graduated countries, Bangladesh has to step forward through a specific pathway for effective graduation. Bangladesh needs to complete a number of tasks by 2027 which is briefly presented in the Figure: 5-

Figure: 5

Time line	LDC graduation procedure
The 2018 CDP triennial review	CDP found Bangladesh eligible for graduation. DESA has notified its initial findings.
Before next two CDP triennial reviews (2018-2021)	UNCTAD to prepare a vulnerability profile. DESA to prepare an ex-ante assessment report. Bangladesh may or may not provide comment on these drafts.
At the time of 2021 CDP triennial review	DESA to confirm Bangladesh's eligibility for LDC graduation for the second time and recommend to ECOSOC. ECOSOC likely to endorse and UN General Assembly will take note of the CDP recommendations.
Between two CDP triennial reviews (2021-2024)	Bangladesh to set up a consultative mechanism and prepare a transition strategy with the help of all responsible stakeholders. It is expected that to facilitate the process UNDP and UN system will provide targeted support. Besides, CDP will continue to monitor and report annually to ECOSOC.
2024 CDP triennial review	Graduation becomes effective and Bangladesh graduates permanently out of the LDC group.
Transition period of smooth graduation (2024-2027)	Bangladesh is expected to prepare, implement and monitor the transition strategy. In the process, it is hoped that Bangladesh will receive support from development and trading partners in implementing transition strategy.
Completion of Smooth graduation (2027)	Bangladesh graduates out of the preferential market access regime

Source: CPD, Bangladesh

Before next triennial review in 2021, Bangladesh should go through vulnerability profiling and assessment of possible impact of graduation. Bangladesh is well ahead in preparation, implementation and monitoring of the transition strategy. A work plan has been adopted on 12 August 2013 that aims to place the country firmly on the road to graduation from the LDC category. The work plan is focused on increasing productive capacity, developing human resources, increasing resilience and enhancing governance. A Ministerial Committee has been formed to monitor the implementation. For graduation and smooth transition Bangladesh will receive support from the development and trading partners in implementing the work plan.

8. Impact of Graduation on Bangladesh

The 48 LDCs represent 13% of the world's population and 38% of the world's extreme poor. Despite rising income levels in many LDCs, the incidence of extreme poverty in these countries is still very high. On average nearly 50% of the population in LDCs lives in extreme poverty compared to 12% in other developing countries.

Because of being vulnerable and disadvantaged UN member countries, the most LDCs are getting assistance in various forms in order to be able to maintain sustainable development effectively coping with the economic and environmental shocks and low-level of human assets. After graduation a country will no longer be eligible for certain international support measures in the areas of trade, official development assistance (ODA), climate change support, travel and other. The UN bodies and bilateral development partners are expected to offer a transitional period of three years to Bangladesh to avail itself of these benefits.

Impact on Development Financing

According to the Istambul Plan of Action (IPOA), the UN target for Official Development Assistance (ODA) to LDC is 0.15-0.20% of donor GNI to be provided as aid to LDCs. Bangladesh remains one of the largest LDC recipients of ODA in absolute terms. After graduation the options for concessional financing will no longer be applicable. Bangladesh may also be omitted from climate change support facility which may hamper mitigation and adaptation efforts of the country. The country will also not be eligible for science, technology and innovation related concessional finance for the LDCs. However, the country's dependency on ODA has reduced remarkably from 5.6% of GDP in 1991 to 2.2% in 2013. In 1991 the ODA amount was more than that of export earnings which was only 10.3% in 2013. The share of ODA has decreased from 69.8% of the exports & remittance in 1991 to 6.7% in 2013. It seems that the ODA is a relatively small proportion of government expenditure and there will be a little impact of graduation.

Impact on Trade and Export Markets

Currently, Bangladesh enjoys preferential market access, to varying degrees and extent, in markets of more than 40 countries including the European Union, Canada, Japan and Australia. About 90 percent of Bangladesh's total exports go to the export markets under different preferential market access facilities. The preference margin for its apparel industry under the EU's 'Everything but Arms (EBA)' initiative is 12% which gives the country a substantial price advantage. After graduation, Bangladesh will possibly face withdrawal of GSP facilities from these markets. If Bangladesh fails to manage to renegotiate with these countries it will have to face increased tariff rates in exporting to these markets beyond 2027. On average, Bangladesh's export will face additional 8.7% and 3.9% increased tariffs respectively in the EU and selected non-EU destinations once graduated. According to UNCTAD (2016) about 5.5% to 7.5% exports may be lost as a result of loss of preferential market access. This may result in an estimated export loss of US$2.7 billion in the currently preference-offering countries which would be equivalent to about 8% of its global exports in that year. After graduation, the intellectual property rights regimes will be more stringently applied which will be particularly relevant for Bangladesh's promising pharmaceutical sector currently getting special treatment under Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) and Public Health.

It is important that the EBA scheme has not only helped Bangladesh, but the brands and 500 million consumers in the European Union have also benefited from the scheme. It might be expected that the impact of any tariff increases would be divided between exporters of Bangladesh and importers of EU. The European clothing companies may pay a part or all of the increased tariffs. In that case the country would remain competitive over the medium term against major competitors.

Impact on Other Supports

The LDCs' contributions to the regular budget of the United Nations are kept as low as 0.01% of the total United Nations budget. Every LDC is also entitled to a 90% discount in their contributions to peacekeeping operations. The scholarships, research-related travel grants and research-related financial support are also classified under general support measures. As an LDC Bangladesh is getting discount in regular budget contribution to the United Nations, ILO, UNIDO, Inter-Parliamentary Union (IPU) etc. as well as access to special travel funds, free tickets to UN and WTO meetings. Although these supports to Bangladesh are supposed to be eliminated after graduation, although the supports are considered relatively unimportant for Bangladesh considering the big size of its economy.

9. Graduation and GSP+ Facility for Bangladesh

Once finally graduated, Bangladesh will no more be eligible for duty-free, quota-free market access under the WTO. Particular implications will be in the EU market which is the destination of more than 60% of the country's export goods. Following graduation in 2024 the country would have a three-year transition period before it lost duty-free, quota-free market access to the European Union under the 'Everything but Arms (EBA)' initiative. After 2027 up on ratification of 27 conventions on human (7 UN conventions) and labour rights (8 ILO core conventions), environment (8 conventions) and governance (4 UN conventions), Bangladesh may qualify for the Generalised System of Preferences Plus (GSP+) benefits of the European Union getting dedicated preferential tariff rates. Bangladesh has already ratified all GPS+ conventions except the ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138).

There are some encouraging factors that among the top 10 green factories in the world, seven are in Bangladesh and the government has been working to improve the human rights, labour rights, good governance and protection of environment. The government is also determined to take necessary steps to fulfill the requirements of GSP+ markets access in the EU. Therefore, it is hopeful that the EU will award Bangladesh the GSP+ status after completion of smooth graduation at the end of 2027.

10. Implications for Labour Sector

Graduation of Bangladesh will have some direct/indirect positive/negative impacts on the labour sector. There might be loss of services waiver under WTO General Agreement on Trade in Services (GATS) which provides preferential access to service exports from the LDCs. Although any benefit from the WTO-GATS is still under negotiations. The graduation might have some impacts on the labour sector in terms of employment generation and enforcement of Labour Act.

Implications for Improving Labour Rights

Bangladesh has already ratified 7 of the 8 ILO core conventions and it is likely that the country will move forward to ratify the ILO Minimum Age Convention No. 138 to fulfill the requirement of GSP+ market access. In recent years Bangladesh has much intensified its efforts for enforcement of Labour Act in order to improve labour rights and workplace safety at enterprise and sectoral levels. A forward-looking perspective will be needed to comply with all core labour conventions to satisfy the EU. Further, if Bangladesh is granted GSP+ market access facility in EU Markets, the country should go through periodic review of compliance of GSP+ labour conventions. All these initiatives would uphold the image of Bangladesh in improving welfare of the workers including workplace safety in the country, particularly in the export-oriented industrial sectors. Improved compliance of labour rights would contribute in expanding markets access through improved competitiveness of Bangladesh in the global supply chains of RMG, shrimp, leather, pharmaceuticals etc.

Implications for Labour Market

In Bangladesh, on an average, 20 to 22 lakh job seekers enter into the labour market annually, a large portion of them being youth. Approximately 2.5 lakh new jobs are created for 1% increase in GDP. Therefore, maintaining steady GDP growth is crucial for stability in the labour market and to create adequate jobs for the new entrance. The labour market impact of graduation can be captured only through detail study. Apparently, graduation will have negative impact on development financing, export competitiveness and export earnings affecting GDP growth, employment and poverty negatively. The success to mitigate the risks of development financing and erosion of preferential market access will be the ultimate determinant of labour market impacts.

Since the country's dependency on ODA has been reduced remarkably and it represents a small proportion of government expenditure, the negative impact of ODA after graduation would be very little. On the contrary, the experts' opinion is that the improvement to Bangladesh's image on the world stage from graduation would give it a better credit rating, allowing it to borrow more cheaply on world markets which will have positive impact on development financing.

Export loss due to increase in tariff rates would have negative impact on labour market. However, if Bangladesh can ensure GSP+ market access along with ensured labour rights it would help retain/expand market access for Bangladesh leading to export led growth. From recent trends it is evident that increasing volume of garment production is being offshored from China which is providing additional opportunities to expand RMG export from Bangladesh. Side by side, increased South-South trade opportunities, particularly in the regional markets of India and China may contribute to the export market stability and employment generation.

Productivity enhancement of export items would be another important determinant for competitiveness of Bangladeshi products in global markets. It is encouraging that Bangladesh has put much emphasis on skill development supported by policies and programmes particularly for the youths. This would help the country to ensure demographic dividend and pulling out of the people from low-paying jobs by ensuring higher productivity, productive jobs, decent working conditions and wages.

Finally, Bangladesh will continue to enjoy the facilities it has been getting as a LDC until 2027 after becoming a developing country. It is encouraging that in line with the UN 2030 Sustainable Development Agenda, the 7th Five Year Plan of Bangladesh has emphasized the need for diversification of export products and export market, trade-related capacity-building, technology up-gradation, skill development, productivity enhancement, higher competitive strength, inclusive development, good governance, and elimination of social discrimination along with speeding up revenue collection. More industrialization and public sector development prioritizing the less developed regions of the country would be important to promote productive employment and decent jobs creation. Since the UN 2030 Sustainable Development Agenda overlaps the graduation period of the country, achieving the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs) will significantly contribute smooth transition of Bangladesh. It is hoped that targeted allocation and appropriate utilization of resources and quality implementation of the Annual Development Programmes (ADP) following the Bangladesh SDG Action Plan would well pave the graduation path of Bangladesh contributing sustainable development of labour market and labour sector of the country.

ঐতিহাসিক মে দিবসের প্রত্যয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে
মে দিবস : আমাদের প্রত্যাশা

মহসিনুল হক
অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ঢাকা।

১৮৮৬ সালে আমোরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে পালিত হয়! মে দিবস। সেদিন দৈনিক আটঘন্টার কাজের দাবীতে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়ত হয়েছিল। তাদেরকে ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলীবর্ষণ শুরু করে। ফলে প্রায়! ১০-১২জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হয়।

১৮৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে প্যারিসে দ্বিতীয়! আন্তর্জাতিক-এর প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগো প্রতিবাদের বার্ষিকী আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে পালনের প্রস্তাব করেন রেমন্ড লাভিনে। ১৮৯১ সালের আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয়! কয়গ্রেস এই প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এরপরপরই ১৮৯৪ সালের মে দিবসের দাঙ্গার ঘটনা ঘটে। পরে, ১৯০৪ সালে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই উপলক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে দৈনিক আটঘন্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবী আদায়ের জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বজুড়ে পয়লা মে তারিখে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়জোনের সকল সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং শ্রমিক সংঘের (ট্রেড ইউনিয়ন) প্রতি আহবান জানানো হয়। সেই সম্মেলনে "শ্রমিকদের হতাহতের সম্ভাবনা না থাকলে বিশ্বজড়ে সকল শ্রমিক সংগঠন মের ১ তারিখে "বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না করার" সিদ্ধান্তগ্রহণ করে

বাংলাদেশের মতো অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালনের দাবী জানায় এবং এখন অনেক দেশেই এটা কার্যকর হয়েছে। পূর্বতন সোভিয়তে রাষ্ট্র, চীন, কিউবাসহ বিশ্বের অনেক দেশেই মে দিবস একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। সেসব দেশে এমনকি এ উপলক্ষে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয। বাংলাদেশ এবং ভারতেও এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয়ে আসছে। উমহাদেশে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ সালে।

বুড়ো শ্রমিক, যুবা শ্রমিক, মাঝারি শ্রমিক, শিশু শ্রমিক-- যেই শ্রমিকই হোক না কেন, সবার জন্যই বছরের একটি দিন 'বিশেষ দিন' হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে, যার নাম মে দিবস। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবেও এই দিনটি পালিত হয়ে থাকে। এখন বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে 'পহেলা মে' জাতীয়? ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হয়।

মে দিবস মানেই অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। মে দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গেলে ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশ যখন থেকে শুরু তখন থেকেই শ্রমিক শোষণের মাত্রা বেড়ে যায় বহুগুণ। মালিক শ্রেণীর প্রতাপের কাছে শ্রমিকরা মাথা তুলে দাঁড়ানোর সাহস খুঁজে পায়নি। বারো থেকে চৌদ্দ ঘন্টা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরেও দেয়া হতো খুবই স্বল্প মজুরি যা দিয়ে দুবেলা দুমুঠো খাবার জোটাই কষ্ট হয়ে যেত। সেই সময়ের শ্রমিকদের সীমাহীন কষ্ট, দুর্ভোগ, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্মম অত্যাচার আর শোষণের কাহিনী আমরা অনেক বিখ্যাত লেখকের বইয়ের মধ্যেই দেখতে পাই। সেই দুর্ভোগের কথা পড়লে গা শিউরে ওঠে। বিখ্যাত লেখক ম্যাক্সিম গোক্সিব 'মা' উপন্যাসটিতেই শ্রমিক নির্যাতন আর অধিকার হরণের কিছু নমুনা দেখতে পাই। লেখক যেভাবে শ্রমিকদের নির্যাতন আর বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেছেন তাতেই সেই সময়কার শ্রমিমকদের প্রকৃত চিত্র অনেকটাই ফুটে ওঠে। বঞ্চনা সইতে সইতে একসময় নির্বাক শ্রমিকরাও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাদের প্রতিবাদ মালিক শ্রেনীর জুলুমের বিরুদ্ধে। তাদের সংগ্রাম ন্যায্য অধিকার আদায়ে। 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' এই শ্লোগানের শক্তিতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে সংগ্রামে। দীর্ঘ শোষণের শিকল থেকে, দাসত্বের শিকল থেকে মুক্তি পেতে শুরু করে আন্দোলন। অধিকার আদায়ের চলমান আন্দোলনের একটি পর্যায়ে ১৮৮৪ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিকরা আট ঘণ্টা কাজ করার দাবি আদায়ে ১৮৮৬ সালের মে মাস পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। কিন্তু মালিক পক্ষ থেকে তাদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করা হয়নি। বরং এর জন্য শ্রমিকদের উপর বেড়ে যায় নির্যাতনের মাত্রা। তাই শ্রমিকরা পহেলা মে কাজ ফেলে রাস্তায় নেমে আসে। প্রায় সাড়ে তিন লাখের মতো শ্রমিক কাজ ফেলে রাস্তায় নেমে আসে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদ, ১৪ নং অনুচ্ছেদ আর ২০ (১) অনুচ্ছেদে শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া দেশে বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী সরকার শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে দায়বদ্ধ। কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা কতটুকু অধিকার পাচ্ছে, শ্রমিকদের কতটুকু কল্যাণ সাধিত হয়েছে আজ এই সময়ে তা কঠিন এক প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ লেবার ফোর্সের জরিপ অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমিক সংখ্যা ৫ কোটির কাছাকাছি। এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ মহিলা শ্রমিক। মে দিবস যায়, মে দিবস আসে। কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্য অনেক ক্ষেত্রেই যেন আর খোলে না।

বাংলাদেশের রফতানি আয়ের সিংহভাগ আসে যে পোশাক খাত থেকে, যে পোশাক খাতেই সবচেয়ে বেশি শ্রমিক নিয়োজিত। এখন সময় এসেছে অবস্থার পরিবর্তনের। এসেছে মহান মে দিবসের মহিমায় উজ্জীবিত হওয়ার। শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার। আর কোন রেষারেষি নয়। আমরা কাউকে দোষ না দিয়ে বলতে চাই- হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করুণ শ্রমিকের অধিকার এর বিষয়টি। এতে শ্রমিকের জীবনে আসবে স্বস্তি। বাড়বে উৎপাদন। লাভবান হবে মালিকপক্ষ। সর্বোপরি উপকৃত হবে দেশ।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

পরিক্রমা

মোঃ মোশাররফ হোসেন

প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

সময়ের পরিক্রমায় কত কিছু ঘটে যাচ্ছে জীবনে? কত পরিবর্তন আসছে সমাজে? যদি আমার নিজের এলাকার কথা ধরি কেমন ছিলো ১৯৭৫-৭৬সালে আমাদের ডালপা গ্রাম চারিদিকে অথৈ পানি। পানির নিচে আমাদেরকে কাটাতে হত ন্যূনতম ৫ মাস রপাতি নৌকা যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম। আলাদা। আজ সেখানে রিক্সা আর অটোর ছড়াছড়ি। আজ মোবাইল, ডিশলাইন কোন ব্যাপারইনা। ইমু, ভাইবার এর ব্যবহার কেনা জানে? কত উন্নতি মানুষের, রাস্তা ঘাটের আর বাড়ি ঘরের। আজকাল মানুষ পায়ে হেটে আর চলেনা। বউ ঝিরা আর নাউইউরি সময় ডিঙ্গি নৌকার জন্য বসে থাকেনা। সিএনজি নিয়ে দে দৌড়। কুড়ে ঘরের জায়গা নিয়েছে দালান কোটা। মাটির তৈরী সানকির জায়গা নিয়েছে ম্যালামাইন আর সিরামিক তৈজসপত্র।

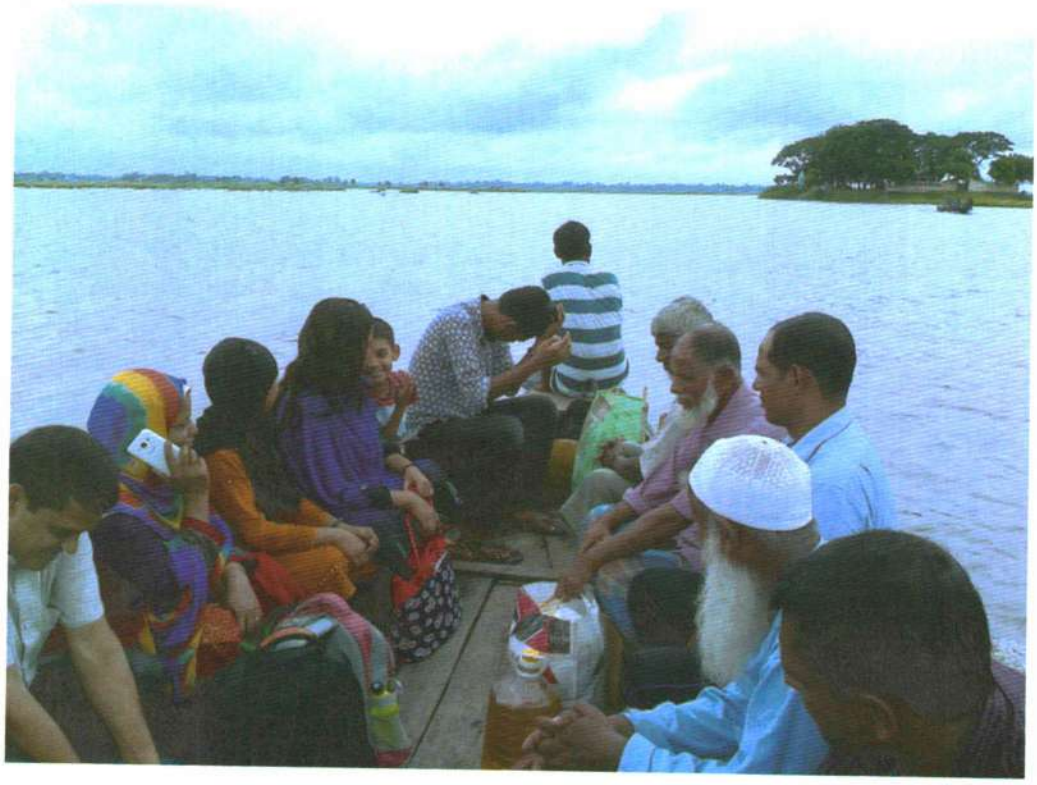

ছবি-১: বিল পেরিয়ে গ্রাম, নৌকা করেই যেতে হয়

মাগরিবের আযান পড়ত একদিকে, কেরোসিনের কুপি জ্বলত আরেক দিকে। আযানের আধা ঘন্টার মধ্যে রাতের খানাপিনা শেষ। তারপর নিঝুমঘুম। সাড়া পাড়া জুড়ে ঘুম। জেগে থাকত কেবল কিছু পাহাড়াদার আর সরাইলের কুকুরগুলি। কানেভেসে আসত ঝি ঝি পোকার একটানা সুর আর দূরে হাক দেয়া শিয়ালের ডাক। কত মধুর ও ভয়ছিল সে সুর তা মনে করলে খুব আনন্দ লাগে। রাত আট টা মানে গভীর রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভুত আর জিনের হামলার কথা ভয়ে কখনও কেউ একা ঘর থেকে বার হতনা। হাতে হারিকেন ও লাঠি আবশ্যিকভাবে থাকতো। সেই নিথর গ্রাম আজ কত উন্নত, কত সুখ এখানে। লোকের কত আনাগোনা আড়ঙ্গে। ভাবাই যায়না। ঘরে ঘরে টেলিভিশন, ফ্রিজ। বিজলী বাতির জাদুতে আজ বাড়ির আঙ্গিনা কত উজ্জ্বল। বুঝাই যায়না কখন যে রাত যে নেমেছে।

ছবি-২: অনাবিল শান্তির নীড় আমাদের গ্রাম

কার্তিক মাস এলে মাছ ধরার কি ধুম পড়ে যেত? ক্ষেতের আইলে আইলে আনতা (মাছ ধরার জন্য বাশের তৈরী বিশেষ যন্ত্র) আর চাইপাতা, বড়শি গাথা। কাক ডাকা ভোরে তা সংগ্রহ করা কতকি? মায়েরা পুটি, বইছা, চিংড়ি আর চান্দা মাছের শুটকি বিছিয়ে দিত উঠানে। এই সোনালি দিনগুলি আজ আর নাই। টানা বড়শি, কুপা বড়শি আর আঙটা বড়শি দিয়ে মাছ ধরার কোন সুযোগ নাই। ভেরা জাল, টানা জাল আর মইটানা জাল দিয়ে মাছ ধরার কোন অপশন আর নাই আমাদের গ্রাম গুলিতে। বিজলি বাতি, কলেরগান, আর অটো জীবনের সেই সব স্পন্দন হরণ করে নিয়েছে। কত সময়ের ব্যবধান? বড় জোড় ২০ বা ২৩ বছর। কত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সমাজ?

দাড়াশ, গোখরো কিংবা সঙ্খনিসাপে কেটেদিবে এ ভয়ে বর্ষার রাতে আমরা বড়রা কি কেউ ঘর থেকে বার হতাম?
না, মোটেও না। এসবের গন্ধ আজ কেউ পাবেনা। এগুলি আজ বিলুপ্ত প্রায়।
পাট চাষে এত লাভ ছিল যে, সমগ্র এলাকা জুড়ে কেবল পাট আর পচা পাটের গন্ধে হাটা যেত না। কখন পাটের মৌসুম শেষ হবে তা নিয়ে আমাদের অপেক্ষার শেষ থাকত না। এখন সেদিন আর নাই। এলাকায় সেই পানিও নাই। পাট চাষ ও নাই। পাটের পচা গন্ধও নাই।

কত জাতের ধান চাষ হত। চিকন কালচে জাতের তিল বা জাল, কটক তারা, সোনা রঙ্গের বিলবাজার, হুলসমেত খামার, সোনালি রঙ্গের চিকন পরশুম, সুগন্ধি কালিজিরা। খইয়ের জন্য আলাদা, মুড়ির জন্য আলাদা, পিঠা পায়েসের জন্য আলাদা ধানের জাত ছিল। পোলাও ভাতের জন্য আলাদা ধান ছিল। অনেক রকমের আমন ধান ছিল। আউশ জাতের ধান ছিল। কত জাতের আর কত মজার মজার ধান ছিল? আজ সে সব উধাও, নাই। এখন শুনি কেবল আটাশ(২৮), মিনিকেট আর টেপি বোরো। পানি চলে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষকের ভাগ্যে পরিবর্তন ঘটে। পানি নাই,পাট নাই। পানি নাই, ধান নাই। কৃষকের কাজও নাই। নাই জীবনের বৈচিত্র, নাই কোন চঞ্চলতা । আছে কেবল অবসর। আছে অলসতা।

উন্নয়নের এ ধাপে বেড়েছে বিদেশযাত্রী। বেড়েছে আর্থিক যোগ। যুবকেরা দলে দলে বিদেশ যাচ্ছে। প্রতি ঘরে ঘরে বিদেশী আছে। টাকা কামাই করছে। অর্থের উত্তাপ বেড়েছে বহুগুনে। কৃষিতে কর্মের যোগ এবং কৃষক কমে গেছে ব্যাপক হারে। পরিবর্তন এসেছে আচরণে।

অনেক পরিবর্তন পেশায়। মাটি কাটা, টিনের চালা ঘর বানোনো, এসব কাজ আর পেশা নাই। মাটি কাটার জায়গা নিয়েছে ডেকো খ্যাত ড্রেজার মেশিন। ঘর বানানোর বুইট্টার মিস্ত্রীর কাজ নিয়েগেছে কামাল রাজমিস্ত্রি। কুমারের তৈরী তৈজসপত্র আজকাল ব্যবহৃত হয়না। মাটির হাড়ির জায়গা নিয়েছে এলুমিনিয়াম আর প্লাষ্টিক। হাওয়াই মিঠাই, কটকডি আর আইসক্রিম-এর হাক ডাক নাই। নাই আর অনেক কিছু। ডাহুক, কুড়া, কালেম এসব পাখির কোন রা আজ আর শুনাই যায় না। হিনঙগুল, আনচিলা, কুইচ্যা, কাছিম কদিচিৎ দেখা যায় না গ্রামে।

ছবি-৩: আমাদের গ্রামের পুকুর।

এই যে পরিবর্তন তা শ্বাশত। এটা সার্বকালীন এবং সার্বজনিন। অনাদিকাল থেকে পরিবর্তন চলে আসছে। কালের পরিক্রমায় চাকা ঘুরতে থাকবে তার প্রয়োজনের নিরিখে। এটাই স্বাভাবিক। ভবিষ্যৎ আরো মোহময় বেগবান হবে এটাই প্রত্যাশা। আরো সুন্দর ও সুখী হবে আমাদের সোনার বাংলা।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মহান মে দিবস
বঙ্গবন্ধু এবং শ্রমিক বান্ধব দেশরত্ন শেখ হাসিনা

মোঃ সামসুল আলম (বকুল) হাওলাদার
সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ, ঢাকা মহানগর দক্ষিন

শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সংহতি এবং উৎসবের দিন হিসেবে উদ্‌যাপিত হয় মে দিবস। মে দিবসের পেছনে রয়েছে শ্রমিক-শ্রেণির আত্মদান ও বিরোচিত সংগ্রামের ইতিহাস। মে দিবসের ইতিহাস, শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এই দিবসটির উদ্ভব ঘটেছিল । অধিকার আদায়ে শ্রমজীবী মানুষকে যুগে যুগে করতে হয়েছে সংগ্রাম, সইতে হয়েছে নানা রকমের পুলিশি নির্যাতন, জেল-জুলুম, হুলিয়াসহ দমন-পীড়ন । তাই মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির দিবস হিসেবে বিবেচিত।

১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। তখন তাদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টাও ছিল না। নামমাত্র মজুরিতে তারা মালিকের ইচ্ছামতো কাজ করতে বাধ্য হতো। শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটের মূল দাবি ছিল ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ১ মে শিকাগো শহরের ৩ লাখ শ্রমিক ধর্মঘট করে রাস্তায় নেমে আসে। ৩ মে এর শ্রমিক সমাবেশে পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিক নিহত হয়। ক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেটে সমাবেশ ডাকা হয়। শান্তিপূর্ণ এই সমাবেশের শেষের দিকে দূর থেকে একটি বোমা এসে পড়ে সমাবেশস্থলে। সেই সময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। পুলিশ সমাবেশের শ্রমিকদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। পুলিশ শ্রমিক সংঘর্ষে চারজন শ্রমিক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সভাস্থলে নিহত একজন কিশোর এর রক্তে ভেজা জামা খুলে বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে দেয়, যা পরবর্তীকালে লাল পতাকার মর্যাদা পায়। ৮ জন শ্রমিক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের মধ্যে ৫ জনকে ফাঁসি দেয়া হয়। আমেরিকার শ্রমিকদের এই আন্দোলনের সমর্থনে বিশ্বের অন্যান্য দেশে সংহতি আন্দোলন গড়ে ওঠে। ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। ফলে বিভিন্ন স্থানে মালিকরা বাধ্য হয়ে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবসের দাবি মেনে নিতে শুরু করে। সেই থেকে ১ মে দিনটি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও সংহতির প্রতিকী হিসেবে মে দিবস নামে পরিচিত।

রাষ্ট্রীয়ভাবে পালিত না হলেও ১৮৯০ সাল থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ ১ মে কে "মে দিবস" হিসেবে পালন করে আসছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ১ মে-কে সার্বজনীন শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এরপর অনেক দেশ এই দিনটিকে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করে। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে মে দিবসকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন।

জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ এ দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিত। ১৯৪৯ সালের অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে মেনিফেস্টোতে 'শ্রম অধিকার' কে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করে কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের কর্মসূচি ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও উপযুক্ত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলে শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় বহুমাত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ সরকার। আওয়ামী লীগের এ সরকারের সময় প্রথম লেবার রেজিস্ট্রেশন আইন প্রণীত হয়। ফলে সাংবিধানিকভাবে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বেকারত্ব দূরীকরণে প্রতিষ্ঠা করা হয় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টি হয় নতুন নতুন কর্মসংস্থান।

আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই এফডিসি, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন, ওয়াপদা গঠন, ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম সার কারখানা নির্মাণ, সাভার ডেইরি ফামের্র সূচনা, স্থায়ী শিল্প ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং সরকারি, আধা-সরকারি বেশ কিছু স্বায়ত্তশাসিত/আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এ সময় আওয়ামী লীগ সরকারের উদ্যোগে একটি স্থায়ী আমদানি-রপ্তানি কন্ট্রোলারের অফিস স্থাপিত হয়। এরপর আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক শাসন জারির পর মে দিবসকে ধর্মীয় লেবাস লাগাতে তৎপর হয়ে ওঠে । থমকে দাঁড়ায় শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রযাত্রা।

এর মাঝেই পাকিস্থান সরকারের দমন নিপীরন এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীন বাংলার আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিতে থাকে এদেশের মুক্তিকামী শ্রমজীবী মানুষ। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর দেয়া মুক্তির সনদ ৬ দফা আন্দোলেন শহীদ হন তেজগাও এর শ্রমিক মনু মিয়া।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের বলিষ্ঠ ভূমিকা এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ১৯৬৯ সালে ১২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সরাসরি নির্দেশে শ্রমজীবী মানুষদের নিয়ে গঠিত হয় জাতীয় শ্রমিক লীগ। ১৯৭০ সালের মে দিবস জাতীয় শ্রমিক লীগ অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনকে সাথে নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রামের অংশ হিসেবে পল্টনে জনসভা ও মিছিলের ভেতর দিয়ে পালন করে। বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ নির্দেশে শ্রমজীবী মানুষকে একত্রিত করে জাতীয় শ্রমিক লীগ, শ্রমজীবি মানুষদের সাথে নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে স্বাধীন বাংলার মুক্তির সংগ্রামে । এরই ধারাবাহিকতায় ৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর শ্রমিকদের বিরাট অংশ বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে স্বাধীন বাংলার মুক্তির সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পশ্চিমা শাসকরা নিরস্ত্র মুক্তি পাগল বাঙ্গালির উপর ঝাপিয়ে পড়লে, বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাংলার স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে, সারা বাংলার শ্রমজীবী মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মে দিবস পালিত হয়। স্বাধীনতার পর মে দিবসটি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১ মে'কে মহান মে দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নির্যাতনমূলক ইজারাদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। কৃষকের কল্যাণে বকেয়া সুদ-খাজনা ও কর মওকুফ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার দরিদ্র চাষিদের জন্য কৃষি ঋণ, বিনামূল্যে সার ও বীজধান বিতরন করেন। ফলে কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের পথ সম্প্রসারিত হয়। পাকিস্তানি মালিকানার প্রায় ৮৫ শতাংশ শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্র সেগুলোর মালিকানা গ্রহণ করে। এই পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত হিসেবে অভিহিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতার প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে পাট, বস্ত্র, চিনিকল, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের আইন পাস করে। জাতীয়করণ আইনের আওতায় ৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বস্ত্রকল এবং ১৫টি চিনিকল এবং ব্যাংক/বীমা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান এর ব্যবস্থা হয়।

শ্রমিক কল্যাণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। জাতিসংঘের সাধারন অধিবেশনে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন
"বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিত।
আমি শোষিতের পক্ষে"।
শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে তার এই স্পষ্ট অবস্থান বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে ছিল ব্যাপক সমাদৃত। তাইতো তিনি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিক হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীতে যখন বাংলাদেশ যুদ্ধ বিদ্ধস্থ অবস্থা থেকে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তির দিকে যাচ্ছিল ঠিক তখনই দেশ বিরোধী যুদ্ধাপরাধী রাজাকার ও এদেশে অবস্থান করা পাকিস্থানী দোসররা ঝাপিয়ে পড়ে বাংলাদেশের হৃদপিন্ডের উপড়। সপরিবারে হত্যা করা হয় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। থমকে যায় দেশ পুনর্গঠনের কাজ। ১৯৭৫ পরবর্তী পাকিস্থান এর মদদপুষ্ট সামরিক সরকারের তথাকথিত বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে মৌলবাদী স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসন করতে শুরু করলে শ্রমিক সংগঠনগুলোয় তার প্রতিফলন ঘটে, জামায়াতের মতাদশের শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নামে শ্রমিক সংগঠন গঠিত হয়। একে একে ধ্বংস করা হয় বাংলাদেশ মতাদর্শের মুক্তিকামী শ্রমিক সংগঠন গুলোকে। শ্রম রাজনীতি শ্রমিক শ্রেণীর হাতে থেকে চলে যায় বুর্জোয়া শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে। বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শুরু হয় শ্রমজীবী মানুষের নতুন লড়াই। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের দাসত্ব মুক্তির আন্দোলন বেগবান হয়। ১৯৯০ এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাই শ্রমিকদের ছিল ব্যাপক ভূমিকা। ১৯৯২ সালের অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে ঢালাওভাবে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরোধিতা করা হয়। কাউন্সিলে আদমজী মিল বন্ধ করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সরকারকে হুঁশিয়ার করা হয়।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসুচী নেয়া হয়। এ সরকারের আমলে স্থাপিত হয় লক্ষাধিক ছোট-বড় শিল্প-কারখানা। এতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন কর্তৃক প্রণীত শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরির সুপারিশ বাস্তবায়িত করা হয়। গার্মেন্ট শিল্পে শিশুশ্রম সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়। একটি গণতান্ত্রিক 'শ্রমনীতি' প্রণয়ন করা হয়। নিশ্চিত করা হয় শ্রমিক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার। ১১টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানার মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্বভার সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের সীমা যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে তাদের দায়িত্বও। ফলে পাঁচ বছরে শিল্প প্রবৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার অর্জিত হয় ১৯৯৭-৯৮ সালে ৮.৫ শতাংশ।
স্থাপন করা হয় ৫৭টি শিল্পনগরী ।

১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত যখন জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসুচী নেয়া হয়, যখন শ্রমিকের মুখে হাসি ফুটতে শুরু করে ঠিক তখনই ২০০১ সালে দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রে রাজাকার আলবদর বাহিনীর গাড়ীতে তুলে দেয়া হয় ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া গবের জাতীয় পতাকা । ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বেছে নেয়া হয় শ্রমিক শ্রেনীর লোক গুলোকে ধ্বংস করা। ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করা হয় গার্মেন্টস সেক্টরকে, এবং এর সাথে জড়িত লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে। বন্ধ করে দেয়া হয় গর্বের আদমজী জুট মিল সহ শত শত শিল্প-কারখানা। বেকার হয়ে পরে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। ধ্বংস হতে থাকে দেশের অর্থনীতি। দেশের শ্বাসরুদ্ধকর সেই সময়ে রাজাকার পৃষ্ঠপোষক নব্য স্বৈরাচার সরকারকে হটাতে রাজপথে নেমে আসে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জনতা।

জননেত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়াদে (২০০৯-২০১৮) দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েই শ্রমিকের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন শ্রমবান্ধব কর্মসুচী ঘোষনা করেন । আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে, শ্রমিকরাই অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। এ কারণে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পরপরই জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানার শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা প্রায় ৭০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষে ১৬টি ধাপে সর্বনিম্ন ২ হাজার ৪৫০ থেকে ৪ হাজার ১৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৫ হাজার ৬০০ টাকায় মজুরি স্কেল ও ভাতা/প্রান্তিক সুবিধাদি নির্ধারণ করে পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান শ্রমিক আইন, ২০১২ জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। ২০১০ সালে দেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্ট শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি ১ হাজার ৬৬২ থেকে ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩ হাজার টাকা পুনর্নিরধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় ২০১৩ সালে গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩ হাজার টাকা থেকে ৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৩০০ টাকা পুনর্নিরধারণ করা হয়। গার্মেন্ট শ্রমিক থেকে শুরু সকল পর্যায়ের শ্রমজীবী মানুষ যাতে স্বচ্ছলভাবে চলতে পারে সে ব্যাপারে জাতীয় মজুরি কমিশন কাজ করছে। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় গার্মেন্ট নারী শ্রমিকদের আবাসন তৈরি করা হচ্ছে। কর্মজীবী নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। চাকরিজীবী মেয়েদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা হচ্ছে। শ্রমিকদের জন্য এমনকী গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং ডরমেটারি নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমজীবী মহিলাদের ছোট বাচ্চাদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। কর্মজীবী মেয়েদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস পর্যন্ত করা হয়েছে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আধুনিক জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৩ সালে জুলাই মাসে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ শ্রমআইন সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তি
গত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন-২০১৩) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী কিশোরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। । ইপিজেডস্থ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৪' শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বতন্ত্র নতুন শ্রম আইন নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইপিজেডের ২২০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠিত হয়েছে, যারা সিবিএ হিসেবে কাজ করছে। চা-শিল্পের উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণে চা আইন-২০১৫ এবং শ্রমিক কল্যাণ আইন-২০১৫ চূড়ান্ত করা হয়েছে। চা-শ্রমিকদের কল্যাণে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিল ২০১৬ পাস করা হয় । শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাতৃত্ব ভাতা প্রনয়ন, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কে ২০১৩ সালে সংশোধন, এবং বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন আইন প্রনয়ন ও সংশোধন করেন। শ্রমিক কল্যানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব পদক্ষেপ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তাই সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষের আশ্রয়স্থলের নাম দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যত সরকার এসেছে তার মধ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারই শ্রমিক বান্ধব সরকার হিসেবে সমাদৃত। শ্রমিক কল্যানে নিরলস কাজ করে যাওয়া জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। । অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমজীবী মানুষ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে আজ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। সকল অনাচার, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস দূর করে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিনত করবেন এটাই সকলের কাম্য। আর জননেত্রীর এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলার মেহনতি মানুষ একযোগে কাজ করে যাবে এই হোক শ্রমজীবী মানুষের মহান মে দিবসের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মহান মে দিবস ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

মোঃ শহীদুল্লাহ বাদল
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গার্মেন্টস, দর্জি শ্রমিক ফেডারেশন

মহান মে দিবস। শ্রমজীবী মানুষের ত্যাগ, সংগ্রাম আর সংহতির দিন মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে হে মার্কেটে দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘটরত শ্রমিক সমাবেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। সেই দিন আন্দোলনরত ০৬ জন শ্রমিককে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। এর প্রতিবাদে ৪ মে হাজার হাজার শ্রমিক বিক্ষোভে ফেটে পড়লে, আবার পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। গুলিতে ৫ জন শ্রমিক মারা যায়। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করার অপরাধে নেতৃত্বদানকারী শ্রমিক নেতা আলবার্ট আর পার্সন্স, আগষ্ট স্পাইজ, অ্যাডলাড ফিশার ও জর্জ অ্যাঙ্গেলকে বিচারের নামে প্রহসন করে ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। ১৮৮৬ সালে শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের রক্তস্নাত শ্রমিক আন্দোলনে যারা পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিলেন, আদালতের রায়ে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন, অত্যাচার, নিপীড়ন, জেল খেটেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই জানাই আমার গভীর শ্রদ্ধা। এই মহান মে দিবস হচ্ছে পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, বিজয় নিশান। এই কারণে মে দিবস বিশ্বের মেহনতি মানুষের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৯০ সাল থেকেই বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ও বিজয়ের প্রতীকী দিবস হিসেবে। মে দিবসের পথ ধারেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের নানা অধিকার অর্জিত হয়েছে। শ্রমের মর্যাদাকে দেওয়া হয়েছে গুরুত্ব।

প্রতি বছর ঢাক-ঢোল, রং-বেরঙের ফেস্টুন, ব্যানারসহ শ্রমিকরা বিশ্বব্যাপী যথাযথ মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করছেন। কিন্তু যে লক্ষ্যে শ্রমিকরা আন্দোলন-সংগ্রাম ও জীবন দিয়ে তাঁদের অধিকার আদায়ের গৌরব অর্জন করেছেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটেও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়। যুগে যুগে দেশে দেশে সমাজে খেটে খাওয়া শ্রমিক শ্রেনী ও মেহনতি মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, দেশ জাতির ক্রান্তিলগ্নে দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে। তাঁদের অবদানকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আবার তারাই সবচেয়ে বেশি শোষিত-বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়।

উন্নত দেশে শ্রমিকদের অধিকার প্রাপ্তিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি উপযুক্ত মজুরি প্রদান, নিরাপত্তা ও কর্মপরিবেশের হয়েছে উন্নত। তবে বাস্তবতা হলো অনুন্নত বা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর শ্রমিক শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশা এখনো ঘোচেনি। শ্রমিক শ্রেণির অধিকার সাংবিধানিকভাবে, প্রচলিত শ্রম আইন ও আইএলও কনভেনশনে স্বীকৃত হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। অনেক বেসরকারি শিল্পকারখানায় শ্রম আইন ও আইএলও কনভেনশন ৮৭, ৯৮ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা যায় না। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে মে দিবসের অনেক শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আমাদের দেশে শ্রমিকদের সকল অধিকার এখনো সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। কর্মক্ষেত্র এখনো সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা, বাঁচার মতো মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাভাবিক জীবনযাপন করার সুযোগ এখনো শ্রমিক পুরোপুরি পাচ্ছেনা।

প্রতিষ্ঠানিক খাত প্রায় বিলুপ্ত করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত দিনে দিনে বেড়েই চলছে। বাংলাদেশে এর পরিমান প্রায় ৮০ শতাংশ। আউটসোর্সিং তো আজ খুবই বহুল পরিচিত শব্দ। খরচ বাঁচানোর নামে অধিক মুনাফা লাভে এই কাজের সৃষ্টি। এসব কাজ অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, অনিয়মিত দিন মজুরি, বিপদজনক, অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ কর্মস্থল। নামমাত্র মজুরি, পরিচয়পত্র নেই, সাপ্তাহিক ছুটিসহ কোন ছুটি নেই। নো ওয়ার্ক নো পে। অনির্ধারিত কর্মঘন্টা, শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার নিত্য দিনের ব্যাপার, ট্রেড ইউনিয়ন করা থেকে বঞ্চিত, এর থেকে শ্রমিকদের মুক্তির জন্য আইএলও, আইটিইউসি কাজ করছে, অপ্রতিষ্ঠান খাতকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এই শিরোনামে।

বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে। কারণ শ্রমিকরা এই দেশের সম্পদ, এই দেশের গর্ব। তাঁদের কারণেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে। এ কারণেই তাঁদেরকে গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক চাকাকে যেসব খাত সচল রেখেছে, তার মধ্যে অন্যতম তৈরী পোশাক খাত। আন্তর্জাতিক বাজারে এই শিল্পের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতা করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বৃহৎ ভূমিকা রাখছে। পৃথিবীর বহুদেশে মালিক শ্রমিকের সুসম্পর্কের মাধ্যমে শিল্পের উন্নয়ন, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সর্বোপরি দেশের উন্নয়নে দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। আমরা মনে করি যাঁদের শ্রম ও ঘামে দেশের উন্নয়নের চাকা সচল থাকে, তাঁদের প্রাপ্য অধিকার এবং সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষের মতো মর্যাদাও নিশ্চিত করতে হবে।

হস্ত শিল্প বিকাশের স্বার্থে প্রবাসে এবং নিজ দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সব শ্রমিকদের মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রম আইন ও আইএলও কনভেনশনের যথাযথ বাস্তাবায়ন নিশ্চিত করার ব্যাপারে মালিক-সরকারকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে।

বাংলাদেশের বহুধাবিভক্ত শ্রমিক সংগঠন ও দুর্বল আন্দোলন শ্রমিকদের দাবি আদায়ে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারছেনা। মহান মে দিবসের অনুপ্রেরণা বুকে ধারণ করে সত্যিকারের ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই হোক আজকের এই মহান মে দিবসের অঙ্গীকার। শোষণমুক্ত সমাজ, শ্রমিক পাবে তার ন্যায্য অধিকার, মালিক-শ্রমিক ও সরকারের দায়িত্বশীল ভূমিকায় দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে। এই প্রত্যাশায় রইলাম।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

দেশের উন্নয়নে নির্মাণ শ্রমিকদের ভূমিকা

মো. আব্দুর রাজ্জাক
সাধারণ সম্পাদক
ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব)

মহান মে দিবস সারাবিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি ও ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার প্রকাশের দিন। শ্রমিক মেহনতি মানুষের কাছে দিবসটি খুবই গুরুত্ব বহন করে। এটি শ্রমিকদের সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। ন্যায্য অধিকারের দাবিতে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল এই দিনটি। এই দিনটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়ে আসছে ১৮৯০ সাল থেকে। যদিও ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ৮ ঘন্টা কাজ ও শোভন মজুরির দাবিতে সেখানকার শ্রমিকদের সমাবেশ ও আন্দোলনের মাধ্যমে এর সূচনা হয়েছিল। যেখানে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১১ জন শ্রমিককে হত্যা এবং অসংখ্য শ্রমিককে আহত করে। ঐ সময় একজন পুলিশও নিহত হয়। আর পুলিশ হত্যায় অভিযুক্ত করে ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর আলবার্ট পার্সনসহ ৬ জন শ্রমিক নেতাকে ফাঁসি দেয়। যদিও পরবর্তীতে অভিযুক্ত শ্রমিক নেতা ও আন্দোলনকর্মীরা নির্দোষ প্রমাণিত হয় এবং শ্রমিকদের দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজের দাবি অফিসিয়ালি স্বীকৃতি পায় এবং মে দিবস প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মে দিবস প্রতিষ্ঠার সোয়া শতাব্দিকাল পর এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ৪৭ বছর পরেও আমাদের সমাজে মেহনতি মানুষ কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। বিশেষভাবে নির্মাণ শ্রমিক, যাঁরা তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিশাল বিশাল অট্টালিকা, সুরম্য প্রাসাদ, ব্রিজ, কালভার্টসহ মানবজাতির বসবাস উপযোগী জীবনধারণের সকল অবকাঠামোর নির্মাতা তাদের অনেকেই কিন্তু সুখে নেই। আমাদের দেশের নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মস্থলের নিরাপত্তা এখনো আন্তর্জাতিক মানের হয়নি। এখনো কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় পড়ে প্রায়ই কোন না কোন শ্রমিকের মৃত্যু হচ্ছে অথবা আহত বা পঙ্গুত্ব বরণ করতে হচ্ছে।

নির্মাণ শ্রমিকরা দেশে এবং বিদেশে তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও তাদের অনেকেই মাথা গোঁজার যথাযথ ঠাই নেই। সঠিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন থেকেও তারা বঞ্চিত। কর্মক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় আহত ও নিহত হলে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণও পায়না তারা। দেশে ৩৭ লক্ষাধিক নির্মাণ শ্রমিক রয়েছে। দেশের নির্মাণ শ্রমিকরা যেমন তাদের শ্রম, ঘাম, মেধা ও বিচক্ষণতা দিয়ে দেশের সকল অবকাঠামো নির্মাণে মূল ভূমিকা রাখছেন। অন্যদিকে বিদেশে কর্মরত প্রবাসী শ্রমিকদের সিংহভাগই হল নির্মাণ শ্রমিক, যাদের প্রেরিত রেমিট্যান্স এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দেশের নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের শ্রমের ন্যায্য মুজরি পায় না। নারী নির্মাণ শ্রমিকরা সকল ক্ষেত্রে সমকাজে সমমজুরি পায় না। কর্মস্থলে তাদের চাইল্ড কেয়ার সেন্টারসহ সুযোগ সুবিধা নেই। অথচ একজন শ্রমিকের কর্মস্থলে নিরাপত্তা, চাকরির নিরাপত্তা, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পরিবার নিয়ে মোটামুটি ভালভাবে বেঁচে থাকা, ন্যায্য মজুরি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দেশের শ্রম আইনের সঙ্গে জড়িত। তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পেনশনের আওতায় আনা এবং দ্রব্যমূল্যের অব্যাহত বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সারাবছর ধরে ন্যায্য মূল্যে নির্মাণ শ্রমিকদের রেশন প্রদান অত্যন্ত জরুরি। নির্মাণ শ্রমিকদের কাজ যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি এটি ভারী ও পরিশ্রমের কাজও বটে। যে কারণে পরিমানমত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে না পারলে তারা দীর্ঘসময় কর্মক্ষম থাকতে পারে না। এ বিষয়গুলো সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ভাবা জরুরি বলে মনে করি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "বিশ্বে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন। একশ্রেণী শোষক অন্য শ্রেণী শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে"। সে মোতাবেক বঙ্গবন্ধু শোষিত, বঞ্চিত, মেহনতি মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্ব-পরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন দেশকে যেভাবে উল্টো পথে পরিচালিত করা হয়েছে তাতে সবচাইতে বেশি বঞ্চিত হয়েছে দেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ।

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্ব গ্রহণের পর শ্রমিক স্বার্থে তার গ্রহণকৃত বিভিন্ন প্রচেষ্টার কারণে শ্রমিকেরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে উপকার পাচ্ছে। যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছায় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতোমধ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের কাজকে নির্মাণ শিল্পের আওতায় আনা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কল্যাণ তহবিল থেকে আহত, কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় নিহত, অসহায়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হচ্ছে। নারী নির্মাণ শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ভাতাও প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া পর্যাপ্ত না হলেও নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচিতে নির্মাণ শ্রমিকরা উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র উপরোক্ত পদক্ষেপ নির্মাণ শ্রমিকদের পরিবার-পরিজনসহ সুস্থ্য ও স্বাভাবিকভাবে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য কোনভাবেই যথেষ্ট নয়। ব্যাপক অর্থে নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নির্মাণ শ্রমিকদের শ্রম ও ঝুঁকি বিবেচনায় ন্যূনতম মুজরি নির্ধারণ, কর্মঘন্টা, থানা ও জেলা পর্যায়ে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান, এলাকাভিত্তিক হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পেনশন বীমা স্কীম চালু, প্রত্যেক জেলা উপজেলায় শ্রম আদালত স্থাপন, দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত নির্মাণ শ্রমিকদের Loss Of Year Earning এর ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান, রেশনিং ব্যবস্থা চালু, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদেশে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রেরণসহ নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন জরুরি।

উপর্যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমলে নিয়ে চলতি বছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা জরুরি। আর এতেই শ্রমজীবী মানুষের জন্য কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে দেশ এগিয়ে যাবে।

দুনিয়ার মজদুর এক হও।

“শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই”

মে দিবস : শ্রমজীবী মানষের অবিরাম সংগ্রামের প্রেরণা

রাজেকুজ্জামান রতন
সাধারণ সম্পাদক
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

১৮৮৬ সাল থেকে ২০১৮ সাল বছরের হিসেবে ১৩২ বছর। মে দিবসের রক্তাক্ত সংগ্রামের ১৩২ বছর পালন করবে শ্রমিক শ্রেণি। কিন্তু ইতিহাস কি শুধু অতীতের কথা বলে? যে ইতিহাস বর্তমানকে প্রভাবিত করে, পরিচালিত করে ভবিষ্যতের দিকে, সে ইতিহাস জীবন্ত। সে ইতিহাস প্রশ্নবিদ্ধ করে সমাজকে, ব্যক্তির যুক্তিকে শাণিত করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহস যোগায় এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় উন্নততর স্তরে। মে দিবসের ইতিহাস তেমনি এক গতিময় ও সংগ্রামের ইতিহাস। ফরাসি বিপ্লব সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে মানুষের চিন্তাকে উন্নত মানবিক স্তরে উন্নত করেছিল। সে কারণে লক্ষ কোটি মানুষের সংগ্রামে সামন্ত স্বেচ্ছাচারী সমাজ ভেঙে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়েছিল। কিন্তু জনগণের মনে গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রম শোষণের তীব্রতা তো কমলোই না বরং বহুগুণ বেড়ে গেল। শিল্প বিপ্লব উৎপাদন বৃদ্ধির নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্ট করেছে, গ্রাম থেকে লক্ষ লক্ষ কৃষক শিল্প কারখানায় এসেছে, সৃষ্টি হয়েছে বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের। একদিকে বেড়েছে উৎপাদন অন্যদিকে বেড়েছে শ্রমিকদের উপর কাজের চাপ। একের পর এক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদনের বহুমুখী বিকাশ ঘটিয়েছে। ফলে সমাজের সমৃদ্ধি, ধনীদের বিলাসিতা বৃদ্ধি পেয়েছে পাশাপাশি শ্রমিকদের কর্ম ঘণ্টা বেড়েছে, বেড়েছে দারিদ্র্য। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে ১৬-১৮ ঘণ্টা কাজ করা শুধু নয়, নারী ও শিশুদেরকে কারখানায় পাঠাতে বাধ্য হতে লাগলো শ্রমজীবী মানুষেরা। মালিকরা মুনাফা বাড়াতে শ্রম ঘণ্টা বাড়ানোর জন্য শ্রমিকদের উপর যে চাপ প্রয়োগ করতো তা শ্রমিকদের জীবন একেবারে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সর্বত্রই তাই কর্ম ঘণ্টা কমানোর দাবি জোরদার হয়ে উঠছিল। ১৮৩২, ১৮৩৯, ১৮৪৮, ১৮৫৭, ১৮৭৫ সালে বড় বড় শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকরা তাদের দাবিতে যেমন রাজপথে নেমে এসেছিল, মালিকরাও তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে সব আন্দোলনকে দমন করেছে। ১৮৮৬ সালে ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবসের দাবি তাই কোন তাৎক্ষণিক দাবিতে গড়ে উঠা আকস্মিক আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল দীর্ঘদিনের বঞ্চনা থেকে মুক্তির আশায় শ্রমিক শ্রেণির লড়াইয়ের অংশ। **৮ ঘণ্টা কর্ম দিবসের দাবির অন্তরালে ছিল ন্যায্য মজুরির আকাঙ্ক্ষা।** প্রকৃতিতে যা আছে তা দিয়ে অন্য প্রাণীর চললেও মানুষের চলে না। তাই প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সম্পদের উপর মানুষ শ্রম প্রয়োগ করেই তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে। শ্রমশক্তি প্রয়োগ করা থেকেই শ্রমিক নামের উৎপত্তি। শ্রমিক কাজ করে একই সঙ্গে নিজের ও সমাজের জন্য। মানুষ যা খায়, যা পরে, তার বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এমনকী মানুষের ভাষাও শ্রমের মাধ্যমে এবং শ্রমের প্রয়োজনে সৃষ্ট। শ্রমের ফলে মানুষ শুধু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে না উদ্বর্ত সৃষ্টি করে। আজকের সমাজের যা কিছু সমৃদ্ধ তা উদ্বর্ত সৃষ্টির ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই উদ্বর্ত আত্মসাৎ করার ফলেই একদল সম্পদশালী হয় আর বাকিরা নিঃস্ব হয়। অর্থনীতিবিদরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে কেন এই ঘটনা ঘটে? পেটি, অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ড তাঁরা দেখিয়েছেন–শ্রমের ফলে মূল্য তৈরি হয় পরবর্তীতে কার্ল মার্কস দেখালেন কীভাবে উদ্বর্ত মূল্য তৈরি হয়। ১৮৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহার আর পরবর্তীতে মার্কস ক্যাপিটাল লিখে দেখালেন–এ যাবত কার্লের লিখিত ইতিহাস একদিকে যেমন শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস, অন্যদিকে মানুষের বিকাশের ইতিহাস। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ, যা মানুষের শ্রমের ফল তা থেকে কী বঞ্চিত হবে শ্রমজীবী মানুষ? জীবিকার জন্য দিনের ১২-১৪-১৬ ঘণ্টা যদি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় তাহলে শ্রমজীবী মানুষ কীভাবে তাদের জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে। বিপুল সংখ্যক মানুষকে বঞ্চিত রেখে সমাজের সুষম বিকাশ কী সম্ভব হবে? যন্ত্রের বিকাশ কী মানুষের শ্রম সময় লাঘব করবে না? কতক্ষণ কাজ করলে একজন মানুষ তার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে? এ সব প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে শ্রমজীবী মানুষের দাবি উচ্চারিত হয়েছিল ৮ ঘণ্টা কাজ, এটাই হবে কর্ম সময়। কিন্তু মজুরি যদি ন্যায্য না হয় তাহলে জীবনযাপনের জন্য শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য হতেই হবে। তাই ৮ ঘণ্টা কর্ম সময়ের সাথে ন্যায্য মজুরির দাবি যে কত যৌক্তিক তা ১৩২ বছর পরেও আজ শ্রমিকশ্রেণি অনুভব করছে। শ্রমিকশ্রেণি এটাও দেখছে যে, যত গণতন্ত্রের কথা বলা হোক না কেন শোষণমূলক ব্যবস্থা বহাল রেখে ৮ ঘণ্টা কর্ম সময় এবং ন্যায্য মজুরি আদায় করা সম্ভব নয়। **এত উৎপাদন বৃদ্ধি তবুও শ্রমিকের জীবনে তার ছোঁয়া লাগেনা কেন ?**

শ্রমিকের শ্রমে উৎপাদিত দ্রব্যে শ্রমিকের অধিকার নেই। অর্থনীতির প্রতিটি সূচকের উন্নতি ঘটানোর পিছনেই থাকে শ্রমিকের ঘাম-পেশির শক্তি আর মেধা। কিন্তু সবচেয়ে কম পুষ্টি, কম শিক্ষা, কম স্বাস্থ্য সুবিধা, কম বিশ্রাম, কম নিরাপত্তা যেন শ্রমিকদের জন্যই বরাদ্দ। অথচ সারা বিশ্বেই খাদ্য উৎপাদনসহ ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ছে। বাংলাদেশেও জিডিপি বৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পরিমাণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন যত বাড়ছে তার সাথে এ কথাটাও যুক্ত হয়ে আছে বাংলাদেশকে সস্তা শ্রমিকের দেশ বলা হয়। এর কারণ বাংলাদেশের শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম। কিন্তু উৎপাদনশীলতা শুধুমাত্র শ্রমিকের শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করে না। মেশিন, ম্যানেজমেন্ট এবং ম্যান পাওয়ার এই তিন 'এম' যুক্ত আছে উৎপাদনশীলতার সাথে। একটি সহজ উদাহরণ থেকেও বিষয়টা বোঝা যাবে। রিক্সা চালক অনেক পরিশ্রমী কিন্তু তার চেয়ে কম পরিশ্রম করেও সিএনজি চালকের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। শিক্ষিত শ্রমিক, প্রশিক্ষিত শ্রমিক, দক্ষ শ্রমিক যাই বলি না কেন–তা অর্জন করতে হলে প্রয়োজন শ্রমিকের আয় এবং অবসর। আয় বাড়লে এবং অবসর সময় পেলেই তো শ্রমিক তার দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পাবে। তা যেমন সমাজের অগ্রগতি সৃষ্টি করবে তেমনি বৈষম্য কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে। শোষণমূলক সমাজ যেমন বঞ্চিত করে শ্রমজীবীকে তেমনি জন্ম দেয় বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের। মে দিবসের সংগ্রাম ছিল তেমনি এক বিদ্রোহ যা শুধু শ্রমিকদের দাবিতে নয়, সমাজের বিকাশের প্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছিল। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে অগাস্ট স্পাইস যে ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন তা আজও আমাদেরকে আলোড়িত করে। তিনি বলেছিলেন–The time will come when our silence will be more powerful than the voices you strangle today.

৮ ঘণ্টা কর্ম সময়ের দাবিতে ১৮৮৬ সালের ১ মে ও ৪ মে আন্দোলন এবং শ্রমিক নেতাদের ফাঁসির ঘটনায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ইন্টারন্যাশনাল সোশালিস্ট কংগ্রেস ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনের ঘোষণা দেয়। ১৯১৯ সালে আইএলও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবস ও ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ঘোষণা করা হয়। ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবস আন্দোলনের নেতা অগাস্ট স্পাইস, এঙ্গেলস, ফিশার ও পারসন জীবন দিয়ে আন্দোলনের যে যৌক্তিকতা তুলে ধরেছিলেন তা আজো বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিকের অধিকার ও শোষণ মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে পথ দেখায়।
দুনিয়ার মজদুর এক হও!

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মহান মে দিবসের চেতনা

সুলতান আহম্মদ
অর্থ বিষয়ক সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিকলীগ
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড
শ্রমিক কর্মচারী লীগ (সিবিএ)

সকল বঞ্চনা, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম আর অধিকার আদায়ের রক্তাক্ত স্মৃতিবিজড়িত গৌরবময় দিনের নাম মহান মে দিবস। ১৮৮৬ সালে আজ থেকে প্রায় ১৩২ বছর আগে এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে হতাহত হন অনেক মেহনতি শ্রমিক। আমরা নিহত ও আহত শ্রমিকদের জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। সেইদিনের সেই শ্রমিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বজুড়ে। দেশে দেশে গড়ে ওঠে মেহনতি জনতার ঐক্য। দুর্বার আন্দোলন ও প্রতিবাদের মুখে শ্রমিকদের দাবি মানতে বাধ্য হয় আমেরিকা সরকার। তারপর ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিক শ্রমিক সম্মেলনে শিকাগোর রক্তঝরা সেইদিনটিকে স্মরণ করে বিশ্বব্যাপি মে দিবসকে শ্রমিক অধিকার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৯০ সাল হতে বিশ্বের প্রতিটি দেশে মে দিবস পালিত হয় নানারকম কর্মসূচির মাধ্যমে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সরকারিভাবে পালিত হয় মহান মে দিবস। আমরা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন তাৎপর্য ও গুরুত্বের সাথে মহান মে দিবস পালন করি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শ্রমিক অন্তপ্রাণ, শ্রমিকের ভালবাসায় সিক্ত অবিসংবাদিত নেতা। বঙ্গবন্ধু সরকার স্বাধীনতা অব্যবহিত পরই বাংলাদেশে ১ মে-কে জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করেন। সরকারিভাবে এই দিনটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১মে দেশের শিল্পকারখানা/প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে পত্রিকা অফিস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। ঐ দিনই ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মহান মে দিবসের তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ অনুষ্ঠানমালা পরিবেশিত হয়। আমরা শ্রমিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের চলমান সমস্যাসহ নানাইস্যু ও ন্যায্য দাবী নিয়ে সোচ্চার হই।

ট্রেড ইউনিয়ন হলো আধুনিক শিল্পায়নের অপরিহার্য অঙ্গ। ট্রেড ইউনিয়ন বলতে শ্রমিক-শ্রমিক মিলে শ্রমিকদের সংগঠন এবং মালিক-মালিক মিলে মালিক সংগঠন বুঝায়। তবে শ্রমিকদের কেন্দ্র করেই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে উঠেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। মূলতঃ অতীতের অসংখ্য শ্রমিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফলেই ট্রেড ইউনিয়ন বিকাশলাভ করেছে। ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশে জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অবদান অনস্বীকার্য।

জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা পিতার মতই শ্রমিক বান্ধব। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য অবদান বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধন করে অধিক কার্যকর ও যুগোপযোগী সংশোধিত শ্রম আইন প্রণয়ন, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ জারী করা। শ্রমিকদের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্ম ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের সময়সীমা ৫৭ বছর থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করেছেন। শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের জন্য বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফলে, অসুস্থ শ্রমিক তাঁর চিকিৎসা ব্যয়নির্বাহের জন্য যেমন আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। অন্যদিকে শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য আর্থিক সহায়তা দিচ্ছেন। জাতীয় শ্রমনীতি, শিশু শ্রমনীতি, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ননীতি, ব্যক্তি মালিকানাধীন বে-সরকারি সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি প্রণয়নসহ শ্রমিক ও তার পরিবারের উন্নয়নের জন্য শ্রমিক বান্ধব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড শ্রমিক কর্মচারীলীগ (সিবিএ) কর্তৃক বর্তমান সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ডসহ সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সুরক্ষার জন্য কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের সদস্যদের ৮,০০,০০০/- (আটলক্ষটাকা), গুরুতর আহত হলে, স্থায়ী অক্ষম হলে আহত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৪,০০,০০০/- (চারলক্ষটাকা) এবং চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে দাফন-কাফন বাবদ তার পরিবারকে ৩০,০০০/- (ত্রিশহাজারটাকা) প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা অত্র সেক্টরে বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বাংলাদেশের সফল প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে নদী ভাঙ্গন রোধ, নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর সু-ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ডকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে বিএনপি-জামাত জোটের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এক শ্রেনির উচ্চভিলাসী স্বার্থভোগী কর্মকর্তা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বিধিমালা মোতাবেক শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধ তথা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) এর কার্যক্রম বন্ধ করার পাঁয়তারা করে চলেছেন। এহেন কর্মকান্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ডের সকল শ্রমিক-কর্মচারী সিবিএএর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ অব্যাহত রেখেছেন এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে।

জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ট নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে অবস্থান করছে। উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মিয়ানমার থেকে নির্যাতিত বাংলাদেশের সীমান্তে প্রবেশ করেছে প্রায় ১০ লক্ষ রোহিঙ্গা। তাদের আশ্রয়, অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা সেবার সু-ব্যবস্থা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ বিশ্বের কাছে প্রশংসিত হয়েছেন। শুধু তাই নয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **"মাদার অব হিউমিনিটি"** পদবীতে ভূষিত হয়েছেন। বর্তমান সরকার জ্বালাও পোড়াও ধ্বংসাত্নক কর্মকান্ড কঠোর হস্তে দমন করে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। কল কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য মজুরি বৃদ্ধি করেছেন। কলেকারখানায় শ্রমিক-মালিক সু-সম্পর্ক বজায় রয়েছে। ফলে কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বার্ষিক জিডিপি যে কোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে উর্দ্ধে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কঠোর হস্তে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছেন এবং যা অব্যাহত রয়েছে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকায় দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এরই সাফল্যতায় জাতিসংঘ বাংলাদেশকে একটি নিম্নমধ্য আয়ের দেশের স্বীকৃতি দিয়েছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ মুক্ত, মুক্তিযুদ্ধের স্ব-পক্ষের সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশ গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ নিম্নমধ্য আয় দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে, দেশ আজ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি যাতে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে নাপারে সেদিকে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। সামনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে যেকোন সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নিরসনকল্পে বাংলাদেশ পানিউন্নয়ন বোর্ড এর শ্রমিক-কর্মচারী তথা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শ্রেণি আজ এক প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যাতে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আর না আসতে পারে সে দিকে মেহনতি শ্রমিকদের শপথ নিতে হবে এবং জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের স্ব-পক্ষের শক্তিকে উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ক্ষমতায় বসাতে হবে। তবেই শ্রমিকদের স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকবে এবং জাতির জনকের কন্যার উন্নয়ন ধারা অব্যাহত থাকবে- এ হোক মহান মে দিবস'২০১৮ এর অঙ্গীকার।

খোদা হাফেজ
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয় হোক মেহনতি মানুষের

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

Informal Economy- বাঁচার মত মজুরি চাই

মোঃ নুরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
ইউনাইটেড ফেডারেশন অব গার্মেন্টস ওয়ার্কাস

মহান মে দিবস ২০১৮। গার্মেন্টস শ্রমিকসহ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের প্রতি আমার রক্তিম শুভেচ্ছা। অমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি যার বিচক্ষণ নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর দীর্ঘ ২৫ বছরের শাসন, শোষণ ও নির্যাতনের শিকল ভেঙ্গে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মাধ্যমে স্বাধীন দেশের স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পেরেছিল।

বঙ্গবন্ধুর সুদক্ষ নেতৃত্বে এদেশে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ দেশের অর্থনৈতিক চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার পেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর আমলে International Labour Organization (ILO) এর তৎকালিন সকল কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অকৃতিম বন্ধু। তাই তিনি উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ নিশ্চিত করতে সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ধ্বংসস্থপ থেকে তুলে এনে এদেশের সকল কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রীয় খাতে অধিগ্রহণ করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদে পরিণত করেছিলেন। তিনি এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার সমূহ সুনিশ্চিতভাবে বাস্তবায়ন করতে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।
১৮৮৬ সালের আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের রক্তক্ষয়ী সফলতার ইতিহাস এদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে স্বাধীনতার সফলতা হিসেবে ধরা দিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুও এদেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষদের যথযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

১৮৮৬ সালের ১লা মে গরপযরমধহ আবহঁব থেকে শ্রমিকরা যে সকল দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল আমরা তাদের উত্তরসূরী হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের সোনালী যুগে অবস্থান করছি। McCormick Harvesting Machine Company এর যে শ্রমিকরা সিকাগো শহরের হে মার্কেট চত্তরে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন আজ মহান মে দিবসে আমরা তাদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

আজ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের স্বপক্ষের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে ইতিমধ্যে ২০০৬ সালে প্রণীত শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম আইন সংশোধন করে আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করেছেন। সরকারী চাকরির বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছর বাস্তবায়ন করেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। ইতিমধ্যে কর্মচারীদের জন্য দুই দুইবার জাতীয় পে-স্কেল ঘোষণা করেছেন, প্রতিটি সেক্টরে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করেছেন। রাষ্ট্রয়াত্ব খাতের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠন করেছেন। বিএনপি-জামাত জোট সরকার আমলে তড়িঘড়ি করে ঘোষিত বাংলাদেশ শ্রম আইন- ২০০৬ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও আইএলও কনভেনশনের আলোকে একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন মহান জাতীয় সংসদে পাশ করেছেন। ২০১৩ সালে জুলাই মাসে মাহান জাতীয় সংসদে এ আইন সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন করেছেন। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষের টেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন
ও বিধিমালা প্রণয়ন, জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন, শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়নের কাজ চলছে।

ব্যক্তিমালিকাধীন বেসরকারী সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন, শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়ন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যাক শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। গার্মেন্টস সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক চট্টগ্রামের বালুরঘাটে ও নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ২টি ২০০০ শয্যা বিশিষ্ট ডরমিটরী নির্মানের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০০৯ সনে সরকার ক্ষমতায় এসে ২০১০ সনে দেশের শ্রমঘন ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১৬৬২ টাকা হতে ৮২% বৃদ্ধি করে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা পুনঃনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করেছে। পরবর্তীতে পূণরায় ২০১৩ সনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা হতে ৭৭% বৃদ্ধি করে ৫,৩০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

সরকারী-আধা সরকারী ও স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসংখ্যা প্রাপ্তির মাঝেও শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের প্রাপ্তিতে কিছু অপূর্ণতা থেকেই যায়। মহান মে দিবস ২০১৮ এর পাদমূলে এসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের আবেদন, Informal Economy- তে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য বাঁচার মত মজরি নির্ধারণ করে গার্মেন্টস, নির্মান, রিকসা-ভ্যান, পরিবহন, দর্জি, কুলি, নৌকা মাঝি, গৃহ শ্রমিক, দোকান-পাট, হকার্স সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা করা। নিম্ন আয়ের মানুষদের স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা, বিনা মুল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, তাদের সন্তানদের সর্বস্তরে লেখা-পাড়া ফ্রি করা, গণপরিবহনে যাতায়াতে Informal Economy- তে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য বীমার সুবিধা প্রদান ও দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। কর্মক্ষম এবং বার্ধক্যকালীন শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পেনশনের ববস্থা চালু করা। দেশের সব থেকে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন কারী সেক্টর গার্মেন্টস-এ কর্মরত শ্রমিকদের জন্য অবিলম্বে বাঁচার মত মজুরি পুনর্নির্ধারণ করে অবিলম্বে নতুন মজুরি ঘোষণা করা সময়ের অপরিহার্য দাবী।
তাই শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র আস্থা ও ভরসার স্থান বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার প্রতি প্রত্যাশা– ধনী-দরিদ্রের আকাশ-পাতাল অর্থনৈতিক বৈষম্যের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করে বৈষম্যহীন বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় যথযাথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মহান মে দিবসের স্মরণে
''শিল্পের উন্নয়ন-শ্রমিকের অধিকার বাড়বে মর্যাদা সবার''

সিরাজুল ইসলাম রনি
সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী লীগ

১লা মে ১৮৮৬ সালে মেহনতি মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের রক্তস্নাত শ্রমিক আন্দোলনে আমেরিকার শিকাগো শহরে, হে-মার্কেটে, পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন অসংখ্য মেহনতি শ্রমিক এবং তৎকালিন সময় জেল ও খেটেছেন আরও অসংখ্য শ্রমিক।

আমি তাদের প্রত্যেককে মে দিবসে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।
আমি শ্রদ্ধা জানাই- হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ''জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান''।
তিনি বলেছিলেন-বিশ্ব আজ দু-ভাগে বিভক্ত-শোষক আর শোষিত-''আমি শোষিতের পক্ষে''।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা 'দেশরত্ন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী-শেখ হাসিনা' শ্রমিকদের কল্যাণে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে শ্রমিকদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য শ্রম-আইন সংশোধন করেছেন।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ৫০ লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে ৮৫ ভাগ নারী শ্রমিক। তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে এবং পাশাপাশি শ্রমিকদের যৌথ দর কষাকষির জন্য ইউনিয়ন গঠন করার ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিরসন করতে হবে।

শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কমিটির গঠন করে (সেফইটি কমিটি) তাদের স্বাস্থ্য সেবায় কারখানা কর্তৃপক্ষ বাস্তবমুখী ব্যবস্থ্যা গ্রহণ করতে হবে। অপরদিকে সকল নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অবহেলার যাতে কারখানা কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে না পারে সেদিকেও কার্যকরি পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের সকল ধরনের শোষণ, বঞ্চণা, বৈষম্য থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নারী শ্রমিকদের অবসর কালীন পেনশন ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে ভাত, কাপড়, মাথা গোজার ঠাঁই, চিকিৎসা, শিক্ষা ও সাথে প্রয়োজনীয় সু-স্বাস্থ্যের জন্য ক্যালরি, পুষ্টি এবং মানসম্মত খাবারের নিশ্চয়তা প্রদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিককে অভুক্ত রেখে কখনও শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ আজ মধ্য আয়ের দেশ যা উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভূক্ত। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শ্রমিকরাই হচ্ছে একমাত্র চালিকা শক্তি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে, দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাতকে আরও শক্তিশালী করার জন্যে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার আহব্বান জানাচ্ছি।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মহান মে দিবস

এস.এ. তালুকদার
উচ্চমান সহকারী
শ্রম অধিদপ্তর

মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে
যাদের তাজা রক্ত ঝরে
মহান মে দিবসের মর্মবাণী সেদিন
গিয়েছে রচনা করে।

পেনসিলভেনিয়ার দশ খনি শ্রমিক
আন্দোলনের ভীত রচনা করে
নির্মমভাবে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছে
আঠারো শো পঁচাত্তরে।

ইরা ষ্টুয়ার্টের ত্যাগী উদ্যোগে সেদিন
শ্রমিক মজদুর সংহতি গড়ে
শ্রমিকের আট ঘন্টা কাজের সময়
দিয়েছে আদায় করে।

শ্রমিক আন্দোলনে হয়নি কেবলই
শ্রমিকের ভাগ্য সংস্থান
তার কারণেই আমেরিকায় হয়েছিল
গৃহযুদ্ধের অবসান।

আমরা ভুলিনি তাদের ভুলবোনা কভু
মনে রবে চির দিন
শোধিতে পারবেনা শ্রমিক শ্রেণী
তাদের ত্যাগের ঋণ।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীতকরণে শ্রমিকের ভূমিকা

মহব্বত হোসাইন
উপপরিচালক
ঢাকা বিভাগীয় শ্রম দপ্তর

মহান মে দিবস, শ্রমিকের অধিকার এবং তাৎপর্যের স্বীকৃতির দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশও যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করে আসছে। এবারের মে দিবসের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে– উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর এটাই প্রথম মে দিবস। অর্থাৎ সরকার উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিয়ে মে দিবস পালন করছে এ বছর। দেশের স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে শ্রমিকের অবদান অনস্বীকার্য।

সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরে শ্রমিক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিরামহীন ভূমিকা রেখে চলেছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দিনমজুর পর্যন্ত সকলেই দেশের উন্নয়নের শরিক। এটা দেশের জন্য খুবই আশাব্যঞ্জক যে, সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নে সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ। সঠিক পরিকল্পনা এবং নেতৃত্ব দেশের এই অগ্রযাত্রার মূল চাবিকাঠি, পাশাপাশি দিকনির্দেশনা অনুযায়ী স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে শ্রমিকরা (total labour force) তাদের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করায় দেশ তার গন্তব্যে পৌঁছাবে।

বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে (২০১৮ সালে) প্রায় ৭ (সাত) কোটি টোটাল লেবার ফোর্স অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা রয়েছে। যা ২০০৬ সালে ছিল পাঁচ কোটির একটু বেশি। এটা লক্ষ্যনীয় যে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে যা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকারের সঠিক নেতৃত্বে অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা তাদের নিজ নিজ কর্মে নিয়োজিত থেকে দেশের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধি করছে। ২০০৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যা বা টোটাল লেবার ফোর্স বৃদ্ধির একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

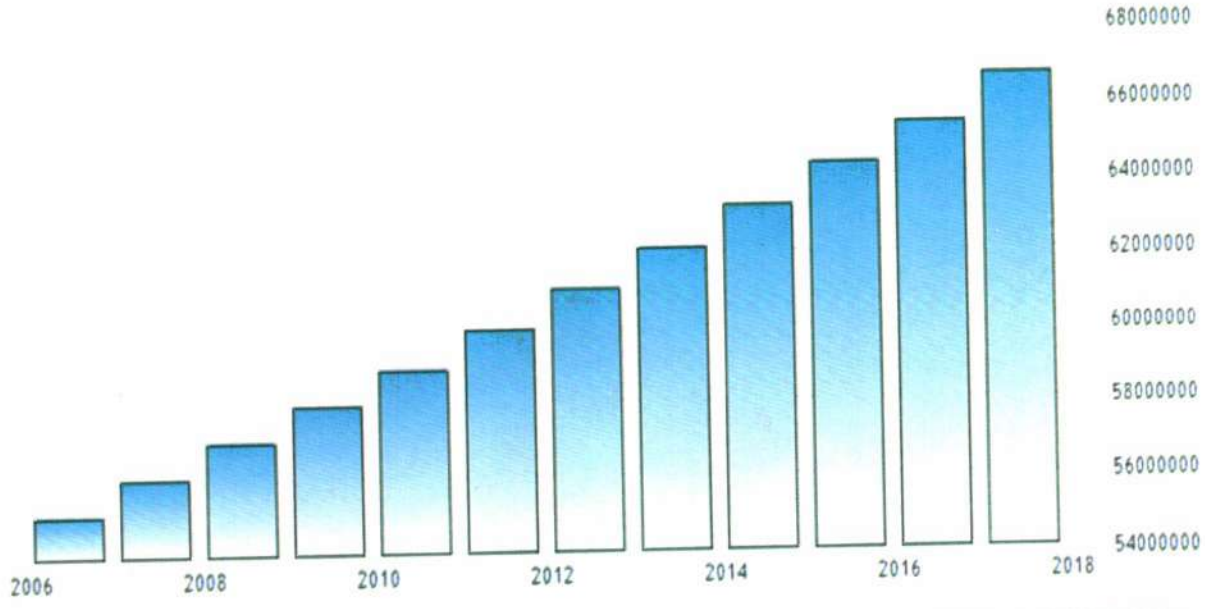

লেবার ফোর্স বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক নেতৃত্বে দেশ সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। দেশের এই অর্জনে শ্রমিক যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তেমনিভাবে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে কাজ করে যেতে হবে। একটি দেশের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে- দেশের সক্রিয় কর্মীবাহিনী। প্রবাসী শ্রমিক, পোশাক শিল্প শ্রমিক, কৃষি শ্রমিকসহ সকল সেক্টরের শ্রমিক বা কর্মীবাহিনীকে সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে দেশ তার লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাবে।

প্রবাসী শ্রমিকরা বাংলাদেশে জিডিপি-তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। দেশে টোটাল লেবার ফোর্সের এক পঞ্চমাংশই প্রবাসী শ্রমিক। তারা তাদের যৌবনের সবটুকু দিয়ে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে কষ্টার্জিত উপার্জন দেশে পাঠিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে যাচ্ছে। তাদের অবদান কৃতজ্ঞতাবশে আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি। প্রবাসী শ্রমিকের পরেই জিডিপি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে আরেক গুরত্বপূর্ণ সেক্টর হচ্ছে দেশের পোশাক শিল্প। প্রায় ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ লোক এ সেক্টরে কাজ করছে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশই নারী। সুতরাং, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বেকার সমস্যা সমাধানে পোশাক শিল্প এক অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়া কৃষি শিল্পের শ্রমিকরা তাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের খাদ্য ঘাটতির সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশাপাশি পরিবহন, পাট, কুটির শিল্প, ঔষধ শিল্পসহ অন্যান্য খাতের শ্রমিকরা তাদের কাজের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

শ্রমিকদের এই অনন্য অবদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। সঠিক নেতৃত্বে দেশ আজ অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায়। এই ধারা অব্যাহত রেখে বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন হোক এটাই আমাদের মহান মে দিবসের লক্ষ্য।

“শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই”

১লা মে চিরজীবী এক চেতনার নাম

মোল্যা আবুল কালাম আজাদ
সহ-সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক লীগ
কেন্দ্রীয় কমিটি।

শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতি মে মাসের আগমনেই আমি হারানো ও প্রাপ্তির দ্বিমাত্রিক অনুভূতি বোধ করি। ১৮৮৬ সনের ১ মের অনেক বছর পূর্ব থেকেই ইউরোপ আমেরিকাসহ সমসাময়িক বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশ সমূহের ছোটবড় বিভিন্ন কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষেরা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের সুনির্দিষ্ট কর্মঘন্টা নির্ধারনসহ স্বাস্থ্য সহায়ক কর্ম পরিবেশ, বিনোদন, বিশ্রাম ইত্যাদি ন্যায় সংগত দাবীতে আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন। সেই সময়ের অসংগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলন সংগ্রাম প্রয়োজনানুযায়ী ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর না হলেও-সেইসব আন্দোলনেও আন্দোলনরত মেহনতি শ্রমিকেরা অবর্ননীয় জুলুম নির্যাতন ও কারাভোগ করেছিলেন। তাদের সেই আন্দোলন তাৎক্ষনিক সফলতা বয়ে না আনলেও পরবর্তীতে ইহা ন্যায়সংগত দাবী-দাওয়া ও অধিকার আদায়ের পথ প্রশস্ত করেছিল। মালিকপক্ষ এবং তখনকার মালিকপ্রিয় হৃদয় সরকারের সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও শ্রমজীবী মানুষদের আন্দোলন সংগ্রাম কখনো কখনো কিছুটা স্তিমিত হলেও উহা কখনো বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং সমগ্র ইউরোপ আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াব্যাপী শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের ন্যায্য দাবী-দাওয়া, অধিকার আদায়ের আন্দোলনের অক্ষয়, অব্যয় সুপ্ত চেতনা আস্তে আস্তে দৃঢ় ভিত্তিমূলে প্রোথিত ও ব্যাপৃত হতে থাকে। চলমান আন্দোলনের এই পথধরে শত বছরের ব্যবধানে শ্রমিকরাজ কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেকটা সফল দুই দুইটি প্যারি কমিউন আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। প্যারি কমিউন আন্দোলন সেই সময়ে সমগ্র ইউরোপ আমেরিকায় চলমান অসংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনকে সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর (Organised United and Effective) শ্রমিক আন্দোলনরূপে গড়ে উঠার চেতনা ও প্রেরণা যোগায়। সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার মেহনতি শিল্প শ্রমিকগন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন শুরু করেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় শ্রমিকদের ঐ আন্দোলন কখনো সহিংস আন্দোলনের রুপ পরিগ্রহ করেনি। ইহা সর্বদাই ছিল শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক। অন্যদিকে ছোট বড় শিল্প মালিকদের অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। শ্রমিকদের দিনে-রাতে প্রায় সার্বক্ষণিক কাজ করানো, যথাযথ মজুরি প্রদান না করা, বিশ্রাম ও বিনোদনের সময় না দেয়া, কারখানা ও শ্রমিক কলোনীর পরিবেশ স্বাস্থ্য সম্মত না করাসহ মালিক পক্ষের অত্যাচার নির্যাতন সর্বরকমের সীমা ছাড়িয়ে যায়। শ্রমিকদের প্রতিবাদী আন্দোলন সংগ্রামের বিরুদ্ধে তারা (মালিক পক্ষ) নানা প্রকার হীন চক্রান্ত চালানো শুরু করে। এমনই এক চক্রান্তের অংশ হিসেবে ১৮৮৬ সনের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে বিক্ষুব্ধ এক শ্রমিক জমায়েতের উপর মালিক পক্ষের ভাড়া করা গুন্ডাবাহিনী অতর্কিতে বিনা উস্কানিতে অসংখ্য বোমা নিক্ষেপ করে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের নিহত ও আহত করে। মালিক পক্ষের ভাড়াটিয়া গুন্ডারা শুধুমাত্র শ্রমিক জমায়েতের উপরে বোমা মেরেই ক্ষান্ত হয়নি-সুপরিকল্পিতভাবে আন্দোলনকারী শ্রমিকদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে কর্তব্যরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপরেও তারা লোক দেখানো বোমা নিক্ষেপ করে। তখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সম্পূর্ণ নির্দোষ শ্রমিক নেতৃবৃন্দদের উপরে নির্বিচার গুলিবর্ষণ করে সমাবেশ স্থলে ৪জনকে হত্যা করে। অনেক শ্রমিক নেতাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আটক করে তাদের বিরুদ্ধে বোমা মেরে মানুষ হত্যার ষড়যন্ত্রমূলক মামলা রুজু করে। প্রহসনের এই মামলায় ৬ জন শ্রমিক নেতাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে ইতিহাস সর্ব সময়ের মতই সত্য প্রকাশ করে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয় যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত শ্রমিক নেতৃবন্দ সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন। এই সমস্ত ঘটনার অনেক পরে এক আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমাবেশে ১লা মে কে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। সেই থেকেই ১লা মে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গ একটু পাল্টিয়ে অবশ্যই বলতে হয় যে জাতির জনক **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান** এর নেতৃত্বে ২৩ বছরের লড়াই সংগ্রাম এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু দেশের সমস্ত বড় বড় শিল্প কল কারখানা, ব্যাংক বীমা ব্যক্তিখাত থেকে জাতীয়করণ করে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী হেমনতি মানুষকে ইহার মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। শ্রমিক কর্মচারীরা আজ সরকারি চাকুরিজীবী। বঙ্গবন্ধু ১লা মে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষনা করে দিয়ে গিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু তনয়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদার অব হিউম্যানিটি, প্রাচ্যের বীরকন্যা দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রম ও শ্রমিক বান্ধব সরকারের নেতৃত্ব প্রদান করছেন। এই সরকার আমলে সংশোধিত শ্রম আইন, ২০১৩ এবং শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ জারি হয়েছে। ফরমাল ও ইনফরমাল সেক্টরে এই সরকারের আমলে সুষ্ঠু ও সুস্থধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিকরূপ ধারন করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) ৩৫টি কনভেনশন ও রেগুলেশন সরকার অনুস্বাক্ষর (Ratify) করেছে। দেশের শ্রমিক শ্রেণী আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর পূর্ণ সুবিধা যথাযথ ভাবে ভোগ করছেন। শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন ও মজুরি যথাযথভাবে নির্ধারন পূর্বক তাদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও শোভন কাজের (Decent Work) সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

আজ আনন্দচিত্তে বলতে দ্বিধা নেই যে, বর্তমান সরকার প্রধান ও তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার নিজেই মহান মে দিবসের চেতনায় শতভাগ উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করছেন। দুনিয়ার মজদুর-এক হও। বাংলার মেহনতি মানুষ-এক হও।
জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

আহসান হাবীব মোল্লা
সাধারণ সম্পাদক
জাতীয় শ্রমিক লীগ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ

বাংলার শ্রমজীবী জনতার আলোর দিশারী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের পক্ষে কাজ করেছেন। শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু এদেশকে সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তারই ধরাবাহিকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর ব্যাংক, বীমা সহ বৃহৎ শিল্প ও কলকারখানা জাতীয়করণ করেন। সকল শ্রমিক কর্মচারীকে সরকারী চাকুরিজীবী হিসেবে সম্মানিত করেন। শ্রমিক-কর্মচারীদের ছেলে মেয়েদের পড়া-লেখা করার জন্য, স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রত্যেক শিল্প কারখানা এলাকায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিকদের ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার জন্য কো-অপারেটিভ চালু করেন এবং রেশনিং প্রথার ব্যবস্থা করেন। শিল্পকারখানার মুনাফায় ২.৫০ শতাংশ শ্রমিকের উৎসব বোনাস হিসেবে প্রদান করতেন। শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষার জন্য বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে আইএলও কনভেনশন এর ৮টির মধ্যে ৭টি কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বে এবং বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে শ্রমিক সংগঠনগুলোর গভীর সুসম্পর্ক ছিল। দেশের সাধারণ মানুষ, মেহনতি শ্রমিক জনতা, দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির অঙ্গিকার ছিল বঙ্গবন্ধুর শাসন আমলের অন্যতম অঙ্গীকার, শ্রমিক-কর্মচারীদের উন্নয়নের সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে গেল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহামনকে খুনি জিয়া-মোস্তাক চক্রসহ সামরিক বাহিনীর কিছু বিপদগামী সদস্য ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট রাতের আধারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে। তারপর থেকে শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনে নেমে আসতে থাকে নানাবিধ নির্যাতন, বঞ্চিত হতে থাকে সকল সুযোগ সুবিধা থেকে। সামরিক জিয়া মার্শাল ল' জারি করে শ্রমিকের আন্দোলনের অধিকার ও কণ্ঠ রোধ করে ফেলে। শিল্প কলকারখানা বে-সরকারী করণ, শ্রমিক ছাঁটাইসহ নানা নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখে স্বৈরাচার এরশাদ সরকার। শ্রমিকের অধিকার আদায়ের জন্য সকল জাতীয় ফেডারেশন ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ (স্কপ) নামে একটি শ্রমিক ঐক্য মোর্চা তৈরী করে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন শুরু করে, যা সকল রাজনৈতিক দল সমর্থন করেন। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতনের পর মুক্তিকামী মানুষের বিজয় হলেও ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর আবার শ্রমিক-কর্মচারীদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। বিএনপি'র নীতির কারণে তাদের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বঙ্গবন্ধুর জাতীয়করনকৃত শিল্প কারখানা ব্যক্তি মালিকানা খাতে বিক্রি শুরু করেন এবং শ্রমিক-কর্মচারীদেরকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করতে থাকেন।

আজ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেনতায় বিশ্বাসী শক্তিকে সাথে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়। বাংলাদেশকে শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রগতি ও স্বয়ং সম্পূর্ণ উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে "ভিশন-২০২১" ও "রূপকল্প- ২০৪১" ঘোষণা করেছেন জাতীয় শ্রমিক লীগের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মী তা বাস্তবায়নে প্রতিটি সেক্টর থেকে সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সর্বস্তরের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে বর্তমান সরকার শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের পক্ষের সরকার–শ্রমিক বান্ধব সরকার। দাবী আদায়ে শ্রমজীবী মানুষকে রাস্তায় নামতে হয় না, প্রাণ দিতে হয় না কৃষককে। বি.এন.পি-জামাত জোট সরকারের দুঃশাসন, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সীমাহীন লুণ্ঠন, সাম্প্রদায়িক জঙ্গীবাদের উত্থানে পৃষ্ঠপোষকতা, আদমজী পাটকলসহ সাড়ে ছয় হাজার শিল্প-কলকারখানা বন্ধ করে লক্ষ শ্রমিককে বেকার করা, ২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর বর্বরোচিত ও পাশবিক হামলা, নারী নির্যাতনের দুঃসহ দিন পেরিয়ে এবং দুই বছর জরুরী অবস্থায় শাসনের দুঃস্বপ্নের কালো রাত্রি পেরিয়ে স্মরণ কালের নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সুবিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচনী ওয়াদা একে একে পালন করে যাচ্ছেন।

জাতীয় শ্রমিক লীগ আজ আরো সুসংগঠিত ও বিস্তৃত। অসংগঠিত সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক সহ সর্বস্তরের শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা, উৎপাদনের লভ্যাংশে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা, শ্রমিক-কর্মচারীদের শোভন কাজ ও তাদের প্রতি শোভন আচরণ, কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জীবনের মান উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক ভিত্তি আরো সুসংহত করার লক্ষ্যে জাতীয় শ্রমিক লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শ্রমজীবী মানুষের যে কোন যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা পূরণে সর্বদাই সদয় দৃষ্টি প্রদান করেন। দেশকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম ও বাস্তবমুখী সর্বাধুনিক পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার নিশ্চিত করেছেন এখন শ্রমিক আন্দোলনের স্বর্ণযুগ– রক্তপাতহীন নীরব শ্রম বিপ্লবের যুগ।

জয় বাংলা–জয় বঙ্গবন্ধু।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

শ্রম-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬

ড. উত্তম কুমার দাস
আইনজীবী এবং
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শক

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ একটি সমন্বিত আইন। পূর্বে বহাল থাকা ২৫ টি আইনের বিষয়বস্তুকে সমন্বয় করে এই শ্রম আইন প্রণীত হয়েছে। যা মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে ১১ অক্টোবর ২০০৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। শ্রম আইন একটি বড় আইন; এতে ২১ টি অধ্যায়, ৩৫৪ টি ধারা এবং পাঁচটি তফসিল রয়েছে। তবে বিভিন্ন আইনের বিধান একত্র করে আলোচ্য শ্রম আইন করায় কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে অস্পষ্টতা, বিভিন্ন অধ্যায়ের বিধানে সংঘর্ষ বা দ্বৈত অর্থ প্রভৃতি রয়েছে।

এছাড়া বিদ্যমান আইনে বেশ কিছু কাঠামোগত ও প্রয়োগগত সীমাবদ্ধতা নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিশেষজ্ঞ কমিটির পর্যবেক্ষণও রয়েছে। শ্রম আইনে বেশ কিছু সংশোধনী ইতোমধ্যে এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম হ'ল ২০১৩ সনের সংশোধনী। (আরেকটি উদ্যোগ এই মুহূর্তে চলছে)। এছাড়া উক্ত আইনকে যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০০৫ গৃহীত হয়েছে। শ্রম আইনের উদ্দেশ্য কি তা আইনের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে। সেগুলো হ'ল- শ্রমিক নিয়োগ, মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক, সর্বনিম্ন মজুরি হার নির্ধারণ, মজুরী পরিশোধ, দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্প-বিরোধ উত্থাপন ও তার নিস্পত্তি, শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ ও চাকুরীর অবস্থা ও পরিবেশ এবং শিক্ষাধীনতা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। অনেকের ধারণা শ্রম আইন শুধুমাত্র শ্রমিকের জন্য। আসলে তা কিন্তু নয়। শ্রম আইনের মূল দুই পক্ষ শ্রমিক ও মালিক (নিয়োগকারী)। আইনটি অন্যান্যের মধ্যে এই দুই পক্ষের অধিকার, দায়-দায়িত্ব প্রভৃতি নিয়ে বিধানাবলী দিয়েছে।

এবার দেখা যাক শ্রম আইনের আওতায় শ্রমিক কারা? শ্রম আইনের কারা শ্রমিক হবেন তা অন্ততঃ তিন জায়গায় উল্লেখ রয়েছেঃ ধারা ২(৬৫), ১৭৫ এবং ১৫০ ও তৎসহ চতুর্থ তফসিল। ধারা ২(৬৫) কারা শ্রমিক হবেন তার উপর মৌলিক ধারণা দিয়েছে। এটিই একজন শ্রমিকের নিয়োগ ও চাকরীর শর্তাবলীর মানদন্ড ঠিক করবে। এই ধারা ২(৬৫) অনুসারে, তিনিই শ্রমিক সংজ্ঞার আওতায় পড়বেন যিনি নিম্নোক্ত শর্তের আওতায়- (১) শিক্ষাধীনসহ কোন ব্যক্তি, (২) চাকরীর শর্ত প্রকাশ্য বা উহ্য, (৩) সরাসরি বা ঠিকাদারের মাধ্যমে নিযুক্ত, (৪) অর্থের বিনিময়ে কাজ করেন, (৫) দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক; কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানীগিরির কাজে নিযুক্ত।

এই ধারা মতে, প্রধানতঃ প্রশাসনিক, তদারকি কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি শ্রমিক সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হবেন না(শ্রম আইন, ২(৬৫) ধারা]। তবে আমাদের মাননীয় উচ্চ আদালত থেকে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন মামলায় যে সব সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে তাতে কে শ্রমিক হবে বা হবেননা তার জন্য ভিন্ন মানদন্ড দেওয়া হয়েছে।

ঐ সকল মামলার রায়ের মূল অংশ নিলে যা দাঁড়ায় তা হ'ল- কে শ্রমিক হবেন তা দেখার জন্য তাঁর পদবী নয়, বরং তাঁর কাজের ধরণ (Nature of work) প্রধান বিবেচ্য বিষয়। শুধুমাত্র সুপারভাইজরি দায়িত্বে থাকলেই বলা যাবেনা যে সংশিষ্ট ব্যাক্তিটি আর শ্রমিক নন। [Dosta Tex. Milss vs. S. B. Nath 40 DLR (AD) (১৯৮৮) ৪৫ (৫০) (Para 7) । আরেকটি বিষয়মূল শ্রম আইনে "তদারকি কর্মকর্তা" কিংবা "প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িতপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি"র সংজ্ঞানাথাকলেও শ্রম বিধিমালায় তাযুক্তকরায় ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে (বিধি ২)। মূল আইনে কোন সংজ্ঞা না থাকলে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা করে তা সৃষ্টি করাও যাবে না- এটি জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ১৮৮৭ এর বিধান। এর সমর্থনে আমাদের উচ্চ আদালত থেকে সিদ্ধান্ত ও রয়েছে।

তাই বিধিমালায় উক্ত সংজ্ঞা দু'টি অন্তর্ভুক্তিকে মাননীয় শ্রম আপীলেট্রাইব্যুনাল তাঁর সাম্প্রতিক এক রায়ে "Void" বলে আখ্যা দিয়েছেন। শ্রম আইনের প্রোক্ষাপটে শ্রমিকের সংজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর সঙ্গে তাঁর নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলী, সংগঠন করার অধিকার প্রভৃতি জড়িত। এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় শ্রম-সংক্রান্ত বিরোধ (Labour related dispute) প্রসঙ্গে আসা যাক।

এই বিরোধ হতে পারে মূলতঃ দুই ধরণের- একটি হ'ল ব্যক্তিগত অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-শ্রমিকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালিক বা নিয়োগকারীর মধ্যে বিরোধ (Individual dispute), এবং আরেকটি যৌথ বা দলগত (Colective dipute); যৌথ-বিরোধই শ্রম বিরোধ (Labour dispute) বা শিল্প-বিরোধ (Industrial dipute)। আর এই বিরোধ হতে পারে কোন অধিকার (জরমযঃ) এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্বার্থকে (Interest) কেন্দ্র করে। শ্রম আইনে শ্রম বিরোধ বা শিল্প-বিরোধের সংজ্ঞা রয়েছে। তা হ'ল- কোন বিরোধ অথবা মালিক ও মালিকের মতান্তর বা মালিক ও শ্রমিকের মতান্তর বা শ্রমিক ও শ্রমিকের মতান্তর। যা কোন ব্যক্তির চাকুরি অথবা চাকুরিচ্যুতি অথবা চাকুরির শর্তাবলী অথবা কাজের শর্ত সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে হতে হবে [শ্রম আইন ২(৬২) ধারা]।

এবার দেখা যাক এহেন বিরোধের প্রতিকার কি? ব্যক্তি পর্যায়ের বিরোধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক শ্রম আইনের ৩৩ ধারা কিংবা ২১৩ ধারায় প্রতিকার চাইতে পারেন। আইনের ৩৩ ধারার বিধান হ'ল লে-অফ, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা অন্য কোন কারণে চাকরির অবসান হয়েছে এমন শ্রমিকসহ যে কোন শ্রমিকের শ্রম আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কোন বিষয় সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকলে তিনি প্রতিকার চাইতে পারেন। আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় হ'ল- নিয়োগ ও চাকরীর শর্তাবলী। প্রতিকার চাওয়ার শর্ত হ'ল- (১) অভিযোগটি লিখিত আকারে সংশ্লিষ্ট মালিককে (নিয়োগকারী) জানাতে হবে, এবং (২) অভিযোগের কারণ জানার ৩০ দিনের মধ্যে এহেন অভিযোগ করতে হবে [শ্রম আইন, ৩৩(১) ধারা]।

এমন অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট মালিকেরও দায়িত্ব রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অভিযোগ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে তাঁকে অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। প্রয়োজনে অভিযোগকারীকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে [শ্রম আইন, ৩৩(২) ধারা]। সংশ্লিষ্ট মালিক যদি নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দিতে ব্যর্থ হন কিংবা অভিযোগকারী শ্রমিক যদি প্রাপ্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে তিনি (ক্ষুব্ধ শ্রমিক) প্রতিকার চেয়ে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে শ্রম আদালতে লিখিতভাবে অভিযোগ করতে পারবেন। শ্রম আদালত অনান্য প্রতিকারের মধ্যে (অভিযোগকারীকে) বকেয়া মজুরিসহ বা ছাড়া তাঁর চাকুরিতে পুনর্বহাল করতে নির্দেশ দিতে পারবেন এবং বরখাস্থ, অপসারণ বা ডিসচার্জের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশকে লঘু দন্ডে পরিবর্তিত করতে পারবেন [শ্রম আইন, ৩৩(৫) ধারা]।

একই সঙ্গে কোন শ্রমিক তাঁর প্রাপ্য কোন অধিকার ভোগ করা থেকে বঞ্চিত হলে শ্রম আইনের ২১৩ ধারার বরাতে সরাসরি শ্রম আদালতে দরখাস্ত করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিককে কোন অনুযোগ দিয়ে তারপর আদালতে আসার দরকার নেই। এখানে অধিকার বলতে শ্রম আইনে স্বীকৃত কোন অধিকার বা কোন রোয়েদাদ, কিংবা নিস্পত্তি বা চুক্তির অধীন বা দ্বারা নিশ্চিত বা দেওয়া অথবা কোন প্রথা বা কোন বিজ্ঞপ্তি বা আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি (নোটিফিকেশন) বা অন্য কোনভাবে স্বীকৃত কোন অধিকার বুঝাবে (২১৩ ধারা)। কোন যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি কিংবা কোন মালিকও তাঁর অধিকার ক্ষুন্ন হলে এই ধারার প্রয়োগ করে প্রতিকার চাইতে পারবেন।

তবে কোন শ্রমিকের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সংশ্লিষ্ট চাকুরিতে বহাল থাকুন বা না থাকুন আইনের ৩৩ ধারায় প্রতিকার চাইতে পারবেন। অর্থাৎ কোন শ্রমিককে লে-অফ, ছাঁটাই, বরখাস্ত কিংবা অপসারণ প্রভৃতি করা হলে তিনি যদি মনে করেন যে তা আইনের বিধানমতে হয়নি তবে তিনি ৩৩ ধারা প্রয়োগ করে প্রথমে অনুযোগ দিতে পারেন (অবশ্যই নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে); এবং এতে ব্যর্থতায় শ্রম আদালতে যেতে পারবেন। আর শ্রম আইনের ২১৩ ধারার প্রয়োগ করে কোন অধিকারের বাস্তবায়ন চাইলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে তাঁর চাকুরিতে বহাল থাকতে হবে। আমাদের মাননীয় হাই কোর্ট বিভাগ এক মামলার সিদ্ধান্তে শ্রম আইনের ৩৩ ও ২১৩ ধারা প্রয়োগে এই ভিন্ন প্রয়োগের কথা নিশ্চিত করেছেন [Robi Axiata Ltd. vs First Labour Court, Dhaka and others, 65 DLR (2013)]।

শিল্প-বিরোধ কি? শ্রম আইনের বিধান অনুসারে শিল্প-বিরোধ হ'ল- বিরোধ বা মতান্তর যদি কোন মালিক বনাম মালিক কিংবা মালিক বনাম শ্রমিক (বা শ্রমিকরগণ) কিংবা শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে হয়। তবে তার বিষয়বস্তু হতে হবে- কোন ব্যক্তির চাকরী অথবা চাকুরিচ্যুতি অথবা চাকুরীর শর্তাবলী অথবা কাজের শর্ত সংক্রান্ত বিষয় [শ্রম আইন ২(৬২) ধারা]। আর শিল্প-বিরোধ কে উত্থাপন করতে পারবে? শ্রম আইনের চতুর্দশ অধ্যায়ের ২০৯ ধারায় বলা হয়েছে- "কোন শিল্প বিরোধ বিদ্যমান আছে বলিয়া গণ্য হইবে না যদি না ইহা এই অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক কোন মালিক অথবা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি কর্তৃক উত্থাপিত হয়"। তাহলে প্রশ্ন যে সকল প্রতিষ্ঠানে যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি নেই সেখানকার শ্রমিকরা কিভাবে তাঁদের শিল্প-বিরোধ সংশ্লিষ্ট মালিকের কাছে তুলে ধরবে?

দেশে প্রায় চার হাজার গার্মেন্টস কারখানার মধ্যে মাত্র সাড়ে পাঁচশ'টিতে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে (মার্চ ২০১৮ এর হিসাব) ।যা যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধির পূর্বশর্ত। তাহলে এত বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা কিভাবে তাঁদের শিল্প-বিরোধ (যদি থাকে) তুলে ধরবে? এর উত্তর আমাদের শ্রম আইন ও বিধিমালায় নেই। এর বিকল্পের আলোচনায় যাওয়ার আগে দেখা যাক মালিক কিংবা যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি শিল্প-বিরোধ উত্থাপন করলে তার পরবর্তী ধাপসমূহ কি কি।

শিল্প-বিরোধের বিষয়ে মালিক কিংবা যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি লিখিত ভাবে অবহিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে অন্যপক্ষের সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌছার লক্ষ্যে সভার আয়োজন করবেন; যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দর-কষাকষি হবে। আলোচনার বিষয়ে ঐক্যমত হলে তার ভিত্তিতে একটি লিখিত নিস্পত্তিনামা হবে এবং তাতে দুই পক্ষ স্বাক্ষর করবে। এর একটি কপি সংশ্লিষ্ট মালিক কর্তৃক শ্রম পরিচালক (এখন মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর) এবং সালিসের (Conciliator) (শ্রম অধিদপ্তর) কাছে পাঠাতে হবে [শ্রম আইন, ২১০(৩) ধারা]। এই ক্ষেত্রে নিস্পত্তির সময়সীমা দুই পক্ষের মধ্যে প্রথম সভা অনুষ্ঠান থেকে এক মাস। আর উভয়পক্ষের লিখিত সম্মতিতে এই সময় বাড়ানো যাবে; তবে তা সর্বোচ্চ কত দিন পর্যন্ত আইনে তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। আর এখানে নিস্পত্তি ব্যর্থ হলে যে কোন পক্ষ পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে সালিসের (Conciliator) কাছে নিস্পত্তি করার আবেদন করতে পারবেন [শ্রম আইন, ২১০(৪) (খ) ধারা]। সালিসের সময়সীমা- অনুরোধ পাওয়ার ১০ দিনের মধ্যে সালিসী কার্যক্রম (Conciliation) শুরুকরা এবং ৩০ দিনের মধ্যে (অনুরোধ পাওয়ার দিন থেকে) সালিস নিস্পন্ন করা। তবে উভয় পক্ষ সম্মত হলে সময় বাড়ানো যাবে; তবে তা কত দিন পর্যন্ত বৃদ্ধিহবে আইনে তার উল্লেখ নেই। আর সালিস ব্যর্থ হলে মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) কাছে যাওয়া যাবে [শ্রম আইন, ২১০(১২) ধারা]। মধ্যস্থতাকারীর (Arbitrator) সময়ও ৩০ দিন। উভয় পক্ষ সম্মত হলে সময় বাড়ানো যাবে; তবে তা কত দিন পর্যন্ত আইনে তার উল্লেখ নেই [শ্রম আইন, ২১০(১৪) ধারা]। মধ্যস্থতাকারী কর্তৃক রোয়েদাদ চূড়ান্ত এবং তার মেয়াদ হবে দুই বছর। এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হলে ধর্মঘট বা লক-আউট (২১১ ধারা)।

এবার দেখা যাক কোন প্রতিষ্ঠানে যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি যদি না থাকে তা হলে শ্রমিকের পক্ষে কে শিল্প-বিরোধ উত্থাপন করবে। না-কি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য শিল্প-বিরোধই উত্থাপিত হবে না! আমাদের মাননীয় হাই কোর্ট বিভাগ বেশ আগে (১৯৮৭) এক মামলার রায়ে বলেছেন, কোন বিরোধ আইনের বিধান অনুযায়ী কোন যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধি (বা মালিক) কর্তৃক উত্থাপিত না হলে তাকে শিল্প-বিরোধ বলা যাবেনা।[Chairman, Chittagong Port Authority vs. KalipadaDey, 39 DLR (1987) 39 (45) (Para 12).]

তবে এক্ষেত্রে ভারতের উচ্চ আদালতের বেশকিছু সিদ্ধান্ত রয়েছে যার অবস্থানভিন্ন। একজন শ্রমিক কর্তৃক উত্থাপিত বিরোধও শিল্প-বিরোধে পর্যবসিত হতে পারে যদি তার সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন (বা যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি) তাতে সমর্থন দেয় বা যুক্ত হয়। আর কোন ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে একদল শ্রমিক যদি তাতে সমর্থন দেয় তখন কোন ব্যক্তি-শ্রমিকের বিরোধও শিল্প-বিরোধেপরিণত হতে পারে। এই অর্থে ট্রেড ইউনিয়ন বা যৌথ দর-কষাকষি প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে দলবদ্ধ শ্রমিকরাও শিল্প-বিরোধ উত্থাপন করতে পারে। [Jadhav J. H. vs. Forbes Gohak Ltd AIR 2005 SC 998].

মতামত লেখকের ব্যক্তিগত। এর সঙ্গে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক সংশ্লিষ্টতার কোন সম্পর্ক নেই।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

একজন শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাষ্টার-মেহনতি মানুষের নেতা

খালিদ মাহমুদ ভূঁইয়া
২য় বর্ষ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

সুন্দর হাসিমাখা মুখখানি নাম তাঁর আহসান উল্লাহ্ মাস্টার-যিনি শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের মনের ভাষা বুঝতেন। আগামী ৭ মে ২০১৮, সোমবার, শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টারের ১৪তম শাহাদৎবার্ষিকী। ১৪ বছর আগে শ্রমজীবী ও পেশাজীবী মানুষের নেতা আহসান উল্লাহ্ মাস্টার ঘাতকচক্রের ব্রাশফায়ারে শহীদ হন। তার জন্ম গাজীপুরের সাবেক পূবাইল ইউনিয়নের হায়দরাবাদ গ্রামে। জন্ম তারিখ ৯ নভেম্বর ১৯৫০সাল। আহসান উল্লাহ্ মাস্টার জীবন বাজি রেখে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যাবার আগে তিনি পাক বাহিনীর হাতে আটক ও নির্যাতিত হন। আহত অবস্থায় তিনি মুক্তিযুদ্ধে যান এবং সক্রিয়ভাবে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবক, শিক্ষক, শ্রমিক নেতা, রাজনীতিবিদ, গবেষক ও শ্রমিক হিতৈষী ।

শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কাছের নেতা জননেতা শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার সমাজ নিয়ে ভাবতেন। সেই ভাবনার একটা বড় অংশজুড়ে ছিল বাংলাদেশের মেহনতি মানুষ। মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার দুর্দমনীয় সাহস ও ভূমিকার কথা সকলের অন্তর ছুঁয়ে আছে। শিক্ষকতা জীবনের প্রথম দিকে তরুণ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার শুধু যে শ্রম বিষয়ক ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তা নয় তাঁকে আমজনতার দরদি নেতার ভূমিকা পালন করতেও দেখা গেছে। শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেনদরবার করা এবং তাদের স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টায় কোনদিনই তাকে পিছ পা হতে দেখা যায়নি। ধীরে ধীরে মেহনতি মানুষ তাদের এই দরদী নেতার এমন অন্ধ-অনুসারী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তার আহ্বানে দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হওয়ার বিচিত্র দৃশ্য অবাক-বিস্ময়ে ঢাকা-টঙ্গী-গাজীপুরের সবাই বার বার প্রত্যক্ষ করেছে। শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার তার অন্তরের দরদ দিয়ে আমজনতার ভালো-মন্দ খোঁজ খবর নিতেন ও তাদের নিয়ে ভাবতেন বলেই তার কথায় মানুষ সাড়া না দিয়ে পারতেন না। আর এভাবেই তিনি শ্রমিক ও জনতার দরদি নেতা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টারের সঞ্চয় শুধু মানুষের ভালবাসা। মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জীবনবাজি রেখে কাজ করেছেন, আপোষ করেননি যে ব্যক্তিটি, যিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো একজন মানুষ ও রাজনীতিবিদ। সেই ব্যক্তি প্রাণ হারালেন ঘাতকচক্রের হাতে। সেবার দ্বারা ও মহৎ কর্মের মাধ্যমে আলোর প্রদ্বীপ হাতে নিয়ে যে মানুষটি অবদান রেখেছিলেন সংগ্রাম-আন্দোলনে, সে মানুষটি আজ চিরনিদ্রায় শায়িত। শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার প্রমাণ করেছেন মানুষকে ভালবাসলে, তাদের জন্য কাজ করলে ও জীবন উৎসর্গ করলে মানুষ ভালবাসায় তার প্রতিদান দেয়।

শ্রম বিষয়ক আন্দোলনে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা হলে, সেই মামলার আইনি লড়াইয়ের জন্য আইনজীবী নিয়োগ ও মামলা পরিচালনার জন্য তহবিল গঠনসহ বহুবিধ কর্মযজ্ঞের সাথে শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার পরিচিত হয়েছেন। ঢাকা-টঙ্গী-গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্রগ্রাম খুলনাসহ বিভিন্ন স্থানের নির্যাতিত ও ভোগান্তির শিকার শ্রমিকদের জন্য মামলা বিষয়ক আইনি লড়াইয়ের জন্য ছুটে যেতেন তিনি নিজে। অসাধারণ বন্ধুপ্রীতি ও অনুগত জনের প্রতি গভীর সৌহার্দ্য ও অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টারের অন্যতম গুণ। যাকে একবার তিনি বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন, তার জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারার জীবন জোয়ার সৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে তাকে সুসংহত করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার পথে তিনি ছিলেন- একজন মাঠের দক্ষ কর্মী। তিনি ছিলেন একজন দেশভক্ত প্রেমিক এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সভ্যতার পথচলার প্রধান সারথী শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। শ্রমজীবী মেহনতি মানুষই মানব সভ্যতার স্রষ্টা। এই মেহনতি মানুষ অতীতে কাজ করেছে, বর্তমানে করছে এবং অনাগত দিনগুলোতেও কাজ করবে। এরা কাজ করে চিরকাল। মেহনত করে বলেই তারা মেহনতি মানুষ। এই মেহনতি মানুষ মাটি কাটে, ইট-পাথর ভাঙ্গে, দাঁড় টানে, মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে, কলকারখানায় কাজ করে, নগরে প্রান্তের কাজ করে।

আর সেই মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ে কিংবদন্তির মতো আমৃত্যু নেতৃত্ব দিয়েছেন শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার। বিনম্র চরিত্রের এই অসামান্য সংগ্রামী রাজনীতিক কোনো অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন থেকে শুরু করে জাতীয় নির্বাচনে যতবার প্রার্থী হয়েছেন আমাদের জনগণের নেতা শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার একটিবারের জন্য ও হারেননি। জিতেছেন বিপুল ভোটে। জয় করে নিয়েছেন গণমানুষের হৃদয় ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। ১৯৯২ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার উপজেলা পদ্ধতি বিলোপ করে দেয়। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উপজেলা চেয়ারম্যানদের নিয়ে আহসান উল্লাহ্ মাস্টার দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলেন। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাস্তবায়ন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং প্রবাসী শ্রমিকদের হয়রানি বন্ধ করার দাবি নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন প্রতিনিয়ত। দেশে যখন ত্রাস ও গ্রাসের রাজনীতির বলয় তৈরি হয়েছে তখনই শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টারকে দেখা গিয়েছে টঙ্গীর রাজপথে এবং ঢাকার রাজপথে।

২০০১ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট রাষ্ট্রায়ত্ত ০৯টি বস্ত্র শিল্পের মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে মিলগুলো বেসরকারিকরণে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনে যার অক্লান্ত পরিশ্রম বাস্তবে কাজে লেগেছে, তিনি হচ্ছেন শ্রমিকদের পরীক্ষিত নেতা আহসান উল্লাহ্ মাস্টার এমপি। শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকারের প্রশ্নে কোনদিন আপস করেননি। শ্রমিক অসন্তোষ যেখানে দেখা দিয়েছে, সেখানেই নিজে ছুটে গিয়েছেন। শ্রমিক অসন্তোষের সময় খেয়াল রেখেছেন শ্রমিকদের কেউ যেন অসন্তোষকে নৈরাজ্য পুঁজিকরে নিজের ফায়দা হাসিল না করতে পারে। তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আইনি অধিকার নিশ্চিত করা, নারী শ্রমিক স্বার্থ সংবলিত দাবি বাস্তবায়ন ও বাস্তবতার সঙ্গে সংগতি রেখে মজুরি ও বেতন-ভাতা নির্ধারণ করার জন্য দেশের নীতিনির্ধারণী মহলের সচেতনতা বৃদ্ধি করার কাজে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আই এল ও কনভেনশন '৮৭ ও '৯৮ এর ভিত্তিতে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি করেছেন। আজদেশে শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধিত হয়েছে এবং শ্রমবিধিমালা ২০১৫ প্রনীত হয়েছে ।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মানদন্ডে শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন একজন শ্রমজীবী নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন দশের মধ্যে একজন। তাকে মানুষ ভক্তি করতো, তিনিও মানুষকে ভক্তি করতেন। স্বাতন্ত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে আর দশজন থেকে তাকে পৃথক করা যায় এবং তিনি দিপ্তমান হয়ে উঠেন জ্যোতির্ময় সূযের মতো। সকলের প্রিয় শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার ছিলেন সর্বস্তরের মানুষের গভীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় সিক্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ। দেশ ও মানুষের জন্য তিনি কাজ করেছেন এবং জীবন উৎসর্গ করেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান উল্লাহ্ মাস্টার একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সময় মরেননি যুদ্ধ করেন যে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সেই পাকিস্তানি বাহিনী তাকে হত্যা করতে পারেনি। তাকে হত্যা করে স্বাধীন দেশের মাটিতে ঘাতকচক্র নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবক, শিক্ষক, শ্রমিক নেতা হিসেবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়-এর উচ্চারণে তিনি ছিলেন নির্ভীক। মাথা উঁচু করে ন্যায়ের পক্ষে কথা বলতেন সবসময়। রাজপথে তিনি আগলে রেখেছেন কর্মীদের। পুলিশের লাঠি মাথায় নিয়ে নেতাকর্মীদের রক্ষা করতেন সবসময়। অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে রাজপথে থেকে আহত হয়ে তিনি হাসপাতালে গেছেন কয়েকবার। একজন শিক্ষক, একজন চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্য হিসেবে এলাকার উন্নয়ন এবং সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ গঠনে ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় তিনি যে ভূমিকা রেখে গেছেন, তা যুগে যুগে স্মরণীয় হয়ে থাকবে সর্বমহলে। কোন অন্যায়কারীকে তিনি সহ্য করতেন না। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে তিনি ছিলেন এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ।

অনেকে বলে থাকেন আহসান উল্লাহ্ মাস্টারের জনপ্রিয়তা ও সাহসী ভূমিকাই ছিল তাঁর মৃত্যুর কারণ। একজন সৎ রাজনীতিক ও আদর্শ সমাজ সেবকের যত গুণ থাকা দরকার তার শতভাগই ছিল তাঁর মধ্যে। পূবাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর কয়েকবার নিজ হাতে ডাকাত ধরে পুলিশের কাছে দিয়েছেন তিনি। এলাকাকে ডাকাতমুক্ত করতে তিনি বিশেষভাবে এলাকাবাসীকে অনুপ্রাণিত ও উদ্যোগী করেছেন। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে সৎ জীবন-যাপনে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এলাকাবাসী যেকোন সমস্যা নিয়ে সব সময় তার কাছে যেতে পারতেন ও আলোচনা করতে পারতেন। ব্যক্তিগত জীবনে কোন লোভ-লালসা তাকে এবং তার পরিবার, এমনকি তার কর্মীদেরও স্পর্শ করতে পারেনি।১৯৯২ সালে উপজেলা চেয়ারম্যান সমিতির আহ্বায়ক হিসেবে তিনি উপজেলা পদ্ধতির পক্ষে সারাদেশে আন্দোলন গড়ে তোলার কারণে গ্রেফতার হন এবং পরে আদালতের মাধ্যমে জামিনে মুক্তিলাভ করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময় রাজপথে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে নির্যাতনের শিকার ও আহত হন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আহসান উল্লাহ্ মাস্টারসহ কমপক্ষে ১০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সদস্য সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হন। আহসান উল্লাহ্ মাস্টারের হত্যাকান্ডের পর জাতীয় সংসদে সর্বসম্মত শোক প্রস্তাবে হত্যাকারীদের যথাযথ শাস্তি দেয়া

হবে বলে আলোচনাকালে সব দলের রাজনৈতিক নেতৃবন্দ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তৎকালীন বিএনপি জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, এমপিসহ সবাই বলেছিলেন, আহসান উল্লাহ্ মাস্টারের হত্যাকারী যেই হোক তাকে যথাযথ শাস্তি পেতেই হবে। মাননীয় আদালত হত্যা মামলার এক বছরের মধ্যে ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল দ্রুত বিচার আইনে মামলার প্রধান আসামি বিএনপি নেতা হাসান উদ্দীন সরকারের ছোট ভাই নূরুল ইসলাম সরকারসহ ২২ জনকে ফাঁসি ও ৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন যা বর্তমানে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে ১০ জন আসামি দেশে-বিদেশে পলাতক রয়েছে। ইতোমধ্যে কারাগারে অসুস্থ হয়ে ছোট রতন নামে একজন ফাঁসির আসামিসহ ২ জন মারা গেছে। বর্তমানে ১৬ জন আসামি কারাগারে বন্দী রয়েছে। শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টারের বাবা শাহ সূফি পীর সাহেব আবদুল কাদের পাঠান ইতোমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন। বৃদ্ধ মাতা বেগম রোসমেতুননেসা কবরের পাশে বসে গত ১৪টি বছর যাবৎ মামলার ফাঁসির রায় কার্যকর দেখতে চোখের জলে বুক ভাসান। উল্লেখ্য, ২০০৪ সালের ৭ মে শহীদ আহসান উল্লাহ্ মাস্টার হত্যার পর ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। ঐ রায়ের কার্যকারিতা দ্রুত বাস্তবায়ন চায় দেশবাসী।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

মহান মে দিবস-২০১৮
মালিক কর্তৃক বঞ্চিত পরিবহন শ্রমিক

মোঃ ইনসুর আলী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক লীগ
রেজিঃ নং বি-২০৯১
২৫, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ (২য় তলা), ঢাকা।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস প্রতি বছর ১লা মে শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে সারা বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে। "দুনিয়ার মজদুর-এক হও" এই দিনের আন্তর্জাতিক স্লোগান। ৮ ঘন্টা কর্মদিবসের আন্দোলন সফল পরিণতি পেয়েছিল ১৮৮৬ সালের ঐতিহাসিক ১লা মে দিবস। এর কিছু পূর্বে ইংল্যান্ডে সূতাকল শ্রমিকদের সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘট, ১৮৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকদের ১ দিনের ধর্মঘট, ১৮৬২ সালে ভারতের হাওড়া স্টেশনে ১২০০ রেল শ্রমিকদের কয়েক দিনের ধর্মঘট, ১৮৬৬ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকদের আন্দোলন গোটা বিশ্বের নজর কাড়ে। অবশেষে ১৮৮৬ সালের ১লা মে শুরু হয় গুরুত্বপূর্ণ সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট। নির্যাতিত শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যে সকল শ্রমিকরা জীবন দিয়েছেন, তাদের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সারা বিশ্বে মহান মে দিবস পালিত হলেও বাংলাদেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১লা মে সরকারি ছুটি ঘোষনা করে রাষ্ট্রীয় ভাবে মে দিবস পালনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ, মর্যাদা সুনিশ্চিত করেন। মহান মে দিবস ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভত হয়ে শ্রমজীবী মানুষের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, যুদ্ধাপরাধীসহ সকল অপশক্তিকে প্রতিহত করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ভীষন-২০২১ বাস্তবায়ন হোক, এটাই হলো মে দিবসের শপথ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় আইএলও কনভেশন ৮৭, ৯৮ সহ ৩৩টি কনভেনশন অনুমোদন করেন। বাংলার শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধু আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি জাতিসংঘে বলেছিলেন, বিশ্ব আজ দুই ভাগে ভিবক্ত। একদিকে শোষক ও অন্যদিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে। তিনি স্বাধীনতার পরে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বন্ধকৃত সকল কল কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনৈতিক শ্রক্তিশালী ও শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করেছেন। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সমস্ত কল কারখানা জাতীয়করণ করেছিলেন, ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে আদমজী পাটকল বন্ধ করাসহ অসংখ্য কল-কারখানা পানির দরে বিক্রি করার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারী বেকার হয়ে যায়।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস সড়ক পরিবহন সেক্টরে স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়োগপত্র প্রদান করে থাকে। কিন্তু দীর্ঘ ৪৭ বছর মালিক কর্তৃক পরিবহন শ্রমিকরা নিয়োগপত্র হতে বঞ্চিত। বিআরটিএ এর তথ্য অনুযায়ী বাস-কোচের সংখ্যা ৪০৬১৬ টি, মিনিবাস-২৭৪৫৭ টি, ট্রাকের সংখ্যা ১২৩৩২৩ টি, সব মিলিয়ে ২৯৪৮৯০৬ টি। এই পরিবহন সেক্টরের শ্রমিকরা ৮ ঘন্টার কর্মস্থলের পরিবর্তে কোন কোন সময় ২৪ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করে, যাহা বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ পরিপন্থি। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক লীগ ২০১৪ সালে আত্মপ্রকাশের পরে গণপরিবহনে নৈরাজ্য, জনদূর্ভোগ থেকে সাধারণ যাত্রীদের মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে নগর পরিবহন নীতিমালা গঠনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন। কিন্তু অদ্যাবধি পর্যন্ত নগর পরিবহন নীতিমালা আলোর মুখ দেখেনি। মহান মে দিবস-২০১৮ এ পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হস্তক্ষেপ কামনা করি। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের অগ্রগতি ও উন্নয়নের সাফল্য যেমন-পদ্মা সেতু নির্মান, সমুদ্র সীমানা বিজয়, শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, ফ্লাইওভার নির্মান, জেলেদের খাদ্য সহায়তা প্রদান, দারিদ্রতার হার নিম্নপর্যায়ে নিয়ে আসা, যুদ্ধাপরাধী রাজাকারদের বিচার, বয়স্ক ভাতা প্রদান, বিনামূল্যে এক কোটি শিক্ষার্থীদের হাতে বই বিতরণ, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান, মাতৃত্বকালীন ছুটি, কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, বিধবা ভাতা প্রদান, দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, গরীব শিক্ষার্থীদের উপ-বৃত্তি প্রদান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদান, প্রতিটি ইউনিয়নে ডিজিটাল তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন, বিভিন্ন স্থানে বিনোদন কেন্দ্র নির্মান, দেশের বিভিন্ন জেলায় শিল্প পার্ক নির্মান,

দেশের বিভিন্ন স্থানে ইকোনমিক জোন নির্মান, গ্রামীন রাস্তা-ঘাট ও কালভার্ড নির্মান, মোবাই ও ইন্টার্নেট গ্রাহক বৃদ্ধি, একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কৃষিতে সফলতা, জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমনে সফলতা, এশিয়ান হাইওয়ে রোড প্রকল্প, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধি, রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (চলমান,) নারীর ক্ষমতায়ন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার, দেশব্যাপী বিদ্যুতের উন্নয়ন, ছিটমহল সমস্যার সমাধান, অনলাইন সেবা প্রদান, অসহায় শ্রমিকদের জন্য শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠন সহ অসংখ্য উন্নয়মূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ আজ মধ্য আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পরিবহন মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের নিয়োগ পত্র প্রদান, পরিবহন শ্রমিকদের ফ্রি চিকিৎসার জন্য পরিবহন শ্রমিক হাসপাতাল নির্মান, শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা কর্ম নির্ধারণ, ২ ঈদে উৎসব বোনাস প্রদান ও পরিবহন শ্রমিকদের নিম্নতম ৩০ হাজার টাকা বেতন নির্ধারন করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করি, এটাই মহান মে দিবসের প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রত্যাশা ঃ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন

কামরুল আহসান
সভাপতি
জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন

অষ্টাদশ শতকে যুক্তরাজ্যে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠে। ১৮২৪ সালে প্রথম শ্রমিকরা লন্ডনে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে আইনী অধিকার লাভ করে। শ্রমিকরা তাদের জীবন ধারন উপযোগী মজুরি ও উন্নত কর্মপরিবেশ অর্জনের জন্য ইউনিয়নে সংগঠিত হন। ১৯৯০ সালের ২৪ এপ্রিল ভারতে প্রথম 'বম্বে মিল হ্যান্ডস এসোসিয়েশন" গঠিত হয়। এটি ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গতি সঞ্চার করে। ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত ভারতে ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১৯৪৬ টি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পাকিস্তানে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৫ টি। তারমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ইউনিয়ন ছিল ৩০টি। এখানে ১৪১ টি কারখানায় ২৮০০০ জন শ্রমিক ছিল। যাদের মধ্যে ২০০০০ শ্রমিক ইউনিয়নে সংগঠিত ছিলেন।
দেশ ভাগের পর ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবীর সমর্থনে ২৫ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়।

কর্মচারীদের এই আন্দোলনে সমর্থন দেয়ার কারনে তৎকারীন ছাত্র আন্দোলনের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করা হয়। সে সময়ে শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রতি ছাত্র, মধ্যবিত্ত, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। এরফলে শ্রমিক কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গণ আন্দোলনের অংশে পরিণত হয়।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচিতে আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও জীবন মানের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ছিল। ২১ দফায় বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসা জাতীয় করণের বিষয় তুলে ধরা হয়। ষাটের দশকের শুরুতে বেতন বৃদ্ধির দাবীতে লালবাগের কেল্লায় ধর্মঘটটি পুলিশের উপর সেনাবাহিনীর দমন, পিড়ন, রেল, ব্যাংক, ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের লাগাতার ধর্মঘটে অচল সরকার বাধ্য হয়ে ১৯৬১ সালে 'কারখানা আইন ও দোকান প্রতিষ্ঠান আইন' প্রবর্তন করে।

কিন্তু শ্রমিকদের দাবী পূরণ না হওয়ায় আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ৬২ ও ৬৩ সাল জুড়ে রেল, পাট ও টিএন্ডটি শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ১৯৬৩ সালে টঙ্গি শিল্পাঞ্চলে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালালে সুন্দর আলী নিহত হন। ১৯৬৪ সালে পাটকল শ্রমিকদের ৫৬ দিন এবং বস্ত্রকল শ্রমিকদের ৫৪ দিন ধর্মঘট, ২৯ সেপ্টেম্বর ট্রেডইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে দেশব্যাপী হরতালে নাকাল সরকার ১৯৬৫ সালে শ্রম আইন পুনবিন্যাস করে নতুন শ্রম আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু এই শ্রম আইনের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কলা কানুন বাতিলের দাবীতে অধুনালুপ্ত পল্টন ময়দানে সময়কালের বৃহত্তম শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৬৬ সালের ৭ জুন ৬ দফা দাবীতে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। এই হরতালে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে পুলিশের গুলিতে শ্রমিক মনু মিয়া সহ প্রায় দশজন শহীদ হন। ৭ জুন হরতালে শ্রমিকদের অংশ গ্রহন গণঅন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯৬৭ সালে পাটকল শ্রমিকদের ধর্মঘটসহ বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সৃষ্টি করে। ১৯৬৯ সালে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচির ৫ ও ৭ নং দফায় বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসা জাতীয় করণ এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কলা কানুন বাতিলের দাবী সন্নিবেশিত হয়। ১৯৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘটে ছাত্রনেতা আসাদ পুলিশের গুলিতে নিহত হলে ২৪ জানুয়ারি সামরিক শাসক আইউব খানের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থান ঘটে। এই অভ্যুত্থানে শ্রমিকদের ব্যাপক অংশগ্রহণের প্রেক্ষপটে ১৯৬৯ এ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ জারী করা হয়। এসময় প্রথম বারের মত শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য জাতীয় নূন্যতম মজুরি ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত ঐ মুজুরির পরিমান ছিল শহরে ১২৫ টাকা এবং মফস্বলে ১১৫ টাকা। ঐ মুজুরি ছিল পাঁচ মন চালের দামের সমপরিমাণ অর্থ।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিকের সক্রীয় অংশগ্রহণ ছিল নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। স্বাধীন দেশে তাদের দাবী বাস্তবায়ন হবে এই ছিল প্রত্যাশা। ১৯৭২ সালের ৫ জুন শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার অধিকার ও যৌথ দর কষাকষির অধিকার নিশ্চিত করতে আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ সহ ২৭টি কনভেনশন অনু সমর্থন করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। কিন্তু গত ৪৭ বছরে এসকল কনভেনশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটেনি। যার ফলে দেশের বিশাল অংশের শ্রমজীবী মানুষ আইনগত সুরক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ইউনিয়নের সংখ্যা প্রায় ৮ হাজার; যার সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখের মত। বাংলাদেশের বর্তমানে প্রায় ৮০ লাখের মত ছোট-বড় শিল্প ইউনিট রয়েছে। বাংলাদেশে শ্রমে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ৩৪ লাখ। সেখানে ইউনিয়নে সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৪ ভাগ।

১৯৭৫ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যার পর সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে। তিনি শ্রম আইনে কিছু পরিবর্তন আনেন। তাতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ছেটে ফেলা হয়। ১৯৭৭ প্রবর্তিত হয় শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশ, যাতে সার্বক্ষণিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কলকারখানায় ইউনিয়ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। এবং একটি ইউনিয়ন গঠনে কারখানার মোট শ্রমিকের ৩০% শতাংশের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। মূলত শ্রম আইনে এই দুইটি বিধান যুক্ত করায় বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তত এই ব্যবস্থা ছিল বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করা। শ্রম আইনে এই দুটি পরিবর্তনই ছিল আইএলওর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ২০০৬ সালে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬' প্রণয়ন করা হয়। আইনের অনেক অংশেই ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষের আপত্তিকে আমলে নেয়া হয়নি। ২০০৭-২০০৮ সালে সামরিক সমর্থিত তত্বাবধায়ক সরকার মালিক পক্ষকে ব্যাপক সুবিধা দিয়ে শ্রম আইনে সংশোধনী আনা হয়। এখানে আইন অমান্যের দায়ে মালিকদের কারাদন্ডে বিধান রহিত করে নাম মাত্র অর্থদন্ডের বিধান যুক্ত করা হয়। তাছাড়াও মালিক পক্ষকে আইনে বর্নিত বিভিন্ন দায় থেকে অব্যাহতি দেয়ার বিধান রাখা হয়।

২০১৩ সালের শ্রম আইনকে যুগোপোযোগী করতে ব্যাপক সংশোধন আনা হয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা প্রনয়ন করে শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ লেখায় উল্লেখ করা হয়েছে, মহান মুক্তিযুদ্ধে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছিল স্বপ্নপূরণের। সেখানে স্বপ্ন ছিল শোষণ, বঞ্চনামুক্ত একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা তার মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন করবে এবং স্বাধীন দেশে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকারী হবে।

২০২১ সালে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার রজত জয়ন্তি পালন করবে। মুক্তিযদ্ধের বাংলাদের আকাংখা ছিল সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। এমন পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ করছি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হতে চলেছে। আগামী তিন বছরে আরো কতগুলো বিষয় অর্জনের মধ্যে দিয়ে তা সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশের মাথা পিছু গড় আয় বেড়ে এখন এক হাজার সাতশত চুয়াল্লিশ ডলারে উন্নিত হয়েছে। বৈদেশিক রিজার্ভ বত্রিশ মিলিয়নের উপর। এগুলো জাতিকে আশাবাদী করে।
আমাদের অর্থনীতির মূল প্রবাহের চালিকা শক্তি হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক ও অভিবাসী জনগোষ্ঠি। তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এই শ্রম শক্তির উন্নয়ন ও বিকাশই আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখবে।
শ্রমিক মেহনতি মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে কিছু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

- সকল শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা।
- ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচার এবং ট্রেড ইউনিয়নের অপব্যাবহার বন্ধ করা।
- মুনাফায় অংশগ্রহণ, বোনাস (উৎসব, উৎপাদন, লভ্যংশ) মালিকানায় অংশিদারিত্ব মর্যাদাকর মুজুরি।
- জাতীয় নূন্যতম মুজুরি নিশ্চিত করা
- স্বাধীনতার মূল চেতনার ভিত্তিতে আরও সার্বজনীন শ্রম আইন প্রণয়ন।
- সংবিধানের অনচ্ছেদ ৮/৯ এর ১, ১৩ ও ১৫ অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন।
- মৌলিক ও ভারী শিল্প, জরুরি গুরুত্ব শিল্প রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়া।
- শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নির্ধারিত ১৭ লক্ষ মাত্রার মধ্যে ৮ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা; যেখানে সবার জন্য শোভন কর্মসংস্থান, সবার জন্য টেকসই এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণকালীন ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। এসকল ব্যবস্থা নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করা গেলে ২০২১ সালে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী পালন স্বার্থক হবে।

বাংলাদেশের গার্মেন্টস এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপ পরিচালক
বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা।

২৪ এপ্রিল, ২০১৩, সকাল ৮.৪৫ মিনিটে সাভার বাসষ্ট্যান্ডের পাশে রানাপ্লাজা নামের বহুতল ভবন ধ্বসে পড়ে। হাজারেরও বেশি মানুষ নিহত হয় এবং দুই হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়, যা বিশ্বের ইতিহাসে তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প দূর্ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ২৪ নভেম্বর, ২০১২ সালে আশুলিয়ায় "তাজরীন ফ্যাশন" পোষাক কারখানায় অগ্নিকান্ডে ১২৪ জন মারা যায়। ৩০০ এর বেশী মানুষ আহত হয় এবং ৭০০ শ্রমিক তাদের চাকুরি হারায়।

২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১০ সালে জয়দেবপুরর গাজীপুরে "গরীব এন্ড গরীব" কারখানায় অগ্নিকান্ডে ২১ জন শ্রমিক নিহত এবং ৫০ জন শ্রমিক আহত হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময় তৈরি পাশাক শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে প্রতি বছর বিভিন্ন দূর্ঘটনায় প্রাণহানি, অঙ্গহানি ও চাকুরিচ্যুত হয়েছে বহু মানুষ। এসব ক্ষতি সব সময় আর্থিক মূল্যে নিরূপন করা প্রায় অসম্ভব। সম্প্রতি বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে ঘটে যাওয়া কিছু দূর্ঘটনা বিদেশি ক্রেতাদের মনযোগ আকর্ষণ করে। ফলে এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে ২০১৩ সালে"একোরড"এবং"এলায়েন্স" এ দেশে তাদের যাত্রা শুরু করে। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বিভিন্ন বিদেশি ক্রেতা ও ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে এ শিল্পে রউন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে মজুরি হয়তো কম। বাংলাদেশের শ্রম হয়তো সস্তা। যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ ডলার যে পোশাক বিক্রি হয় তার জন্য বাংলাদেশ পায় মাত্র ৫ ডলার। বাকী ২০ ডলার কোথায় যায় ? ওয়াল্সমার্ট বা জেসি পেনী এরমতো প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিটি পোষাকের দাম একটু বাড়িয়ে তা শ্রমিকের কল্যাণে ব্যয় করতে পারে। আমাদের উৎপাদনশীলতা এখনও বিশ্বমানের নয়। এটা বাড়ানো গেলে শ্রমিকের সুবিধা বাড়বে, পাশা পাশি মালিকের স্বার্থও রক্ষিত হবে। আমাদের অর্থনীতি বড় হয়েছে। আবার বৈষম্য বেড়েছে। গড় আয় বেড়েছে। গড় আয়ু বেড়েছে। ষাটের দশকে শিল্পে প্রতিযোগিতা ছিলনা। পরিকল্পিতভাবে কারখানা গড়ে উঠেছে। কিন্তু পোষাক শিল্প লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। এত বড়শিল্প, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কারখানা বেড়ে উঠেছে অপরিকল্পিতভাবে। এতবড় খাত, অথচ ছিল এলো মেলো। সরকার, মালিক, ব্যাংক অফিসার, শ্রমিক নেতা সবাই ঠিকভাবে বুঝে ওঠার আগেই বিশ্ব বাজারে বড় স্বীকৃতিমিলে গেল।

আগে অভিযোগ ছিল- ট্রেড ইউনিয়ন হয়না। এখন হরদম ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে। আদমজীতে যিনি শ্রমিক ছিলেন, তিনি ভেবেছেন তার ছেলেও এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে। তাঁর সর্বক্ষণ চিন্তা থাকত কারখানা নিয়ে। একটা মনোসংযোগ ছিল কারখানার সঙ্গে। এখন অন্য কারখানায় ৫০০ টাকা বেতন বেশী পেলেই বিনা নোটিশে শ্রমিক চাকুরি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। কেন যায়, এটা অবশ্যই আমাদেরকে ভেবে দেখতে হবে।

মালিক ও শ্রমিক দু'পক্ষ হওয়া উচিৎ নয়। মালিকের যেমন শ্রমিক দরকার, তেমনি কারখানা না থাকলে শ্রমিকদের কাজও মিলবেনা। বাংলাদেশের গার্মেন্টসে একটা বড় সমস্যা শ্রমিকের মাইগ্রেশন। শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রম শক্তির যোগান দিতে হবে। আমাদের শিল্পমান অনেক ভালো, মালিক-শ্রমিক সবাই মিলেই এ স্বীকৃতি এসেছে।

কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানায় পরিবেশ ও জীবনযাত্রায় সামগ্রিক মানের উন্নতি সাধন হয়েছে। স্বল্পোন্নত হতে দেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে। ২৪ এপ্রিল, রানাপ্লাজা ঘটনার পর বাংলাদেশের গার্মেন্টস বিশ্ব বাজারে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে। তারপরও এশিল্পে বিদেশী ক্রেতাদের আস্থা অর্জনে যে বিষয়গুলো আরো উন্নত করতে হবেঃ

- বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- শ্রমিকের স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থা এবংএক্সিডেন্টাল ইস্যুরেন্স নিশ্চিত করণ।
- শ্রমিক ও মালিকের সু-সম্পর্ক।
- নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি।
- শ্রমিকের ব্যবসায়িক উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে স্থান দেয়া।

মহান মে দিবস শিকাগো থেকে ঢাকা

মিতসু শাওলিন
উপ পরিচালক
শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

'মে দিবসের কবিতা'য় সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-

'চিমনির মুখে শোনো সাইরেন- শঙ্খ,
গান গায় হাতুড়ি ও কাস্তে
তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে। ...

শতাব্দী লাঞ্ছিত আত্মের কান্না
প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না-
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।'

মে দিবসের ইতিহাসের দিকে নজর দিলেই এর মৌলিক সংগ্রামী ও বিপ্লবী চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমেরিকার শিকাগো শহরে সংঘটিত ঘটনা দিয়েই সেই ইতিহাসের সূচনা।

মহান মে দিবস একদিনে সূচিত হয়নি। এটা ছিল দীর্ঘ দিনের আন্দোলন সংগ্রামের ফসল। শ্রমজীবী মানুষের প্রথম সংগঠন গড়ে ওঠে ১৬৮৪ সালে। তখনো আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা হয়নি। ঠেলা গাড়ির চালকরা প্রথম "ঠেলা শ্রমিক ইউনিয়ন" গড়ে তোলেন। ১৭৮৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় আর ১৮৪২ সালে আমেরিকায় শ্রমিক শ্রেণি ট্রেড ইউনিয়ন করার এবং ধর্মঘট করার অধিকার পায়। ১৮২০ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি দৈনিক কর্মঘণ্টা কমানোর দাবিতে অনেকবার ধর্মঘটে অংশ নেয়। বিশ্বের প্রথম নারী শ্রমিকদের ধর্মঘট পালিত হয় আমেরিকায় ১৮২৩ সালে। বিশ্বের শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় ১৮২৮ সালে তার পূর্বে ১৮২৭ সালে ফিলাডেফিয়াতে ১৫টি শ্রমিক সংগঠন একত্রিত হয়ে একটি ফেডারেশন গড়ে তোলে। ১৮৪৫ সালে সারা বুগের নেতৃত্বে বিভিন্ন তুলা শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা শোভন কাজের পরিবেশ, স্যানিটেশন ও কর্মঘণ্টার দাবিতে ম্যাসাচুসেটসে 'দ্য ফিমেল লেবার রিফর্ম এসোসিয়েশন' গঠন করে কাজ শুরু করেন। ১৮৬০ সালে নিউ ইংল্যান্ডে জুতা তৈরি শিল্পের নিয়োজিত শ্রমিকরা ধর্মঘটের ডাক দেন এবং ২০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৬৬ সালের ২০ আগস্ট বাল্টিমোরে ৬০টি ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা একত্রে গঠন করেন 'ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন'। প্রতিষ্ঠাকালীন সভাতেই প্রস্তাব করা হয়- 'পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে এ দেশের শ্রমিকদের মুক্ত করার জন্য দরকার এমন আইন পাস করা, যাতে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের সব রাজ্যে আট ঘণ্টাই যেন স্বাভাবিক কাজের দিন বলে গণ্য হয়। যতদিন এই গৌরবময় ফল আমরা অর্জন করতে না পারি ততদিন আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগের প্রতিজ্ঞা করছি'। শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচনে অংশ নেয়ার স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত এই সভা থেকেই গৃহীত হয়। ১৮৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভায় আটঘণ্টা কর্মসময় নির্ধারণের আইন পাস হয়। কিন্তু সেটা শুধু সরকারি কারখানার শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হয়। ফলে বেসরকারি শিল্প-কারখানার শ্রমিকদের ওপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণ-বঞ্চনার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

আন্দোলন চলতে থাকে। ১৮৮১ সালে জর্জিয়া-আটলান্টার লন্ড্রি শিল্পের ৩ হাজার কৃষ্ণাঙ্গ নারী শ্রমিকরা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর 'ফেডারেশন অব অর্গানাইজড ট্রেডস এন্ড লেবার ইউনিয়ন অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এন্ড কানাডা' দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের জন্য ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে সারা দেশে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ডাক দেয় এবং মালিক ও বণিক শ্রেণিকে এই দাবি মেনে নেয়ার জন্য ১ মে পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। ১ মে সন্নিকটে। মালিক-বণিক শ্রেণি অবধারিতভাবে শ্রমিক শ্রেণির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে ১৮৮৬ সালে ১ মে আমেরিকাজুড়ে শুরু হলো উত্তাল ধর্মঘট। মূলত শিকাগো ছিল এর মূল কেন্দ্র। কয়েক লাখ শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। ধর্মঘট চলছে, কাজ বন্ধ, শ্রমিকদের হাতে স্লোগান লেখা

নানা ধরনের ব্যানার ফ্যাস্টুন। তারা প্যারেড করছেন, বাদ্য বাজাচ্ছেন, তাদের ওপর অত্যাচার শোষণের চিত্র বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করছেন। পরবর্তী দুই দিন পরিবেশ শান্ত ও থমথমে। মে মাসের ৩ তারিখ ম্যাককরমিক রিপার ওয়ার্কস শ্রমিক ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই শিল্প-কারখানাটিতে আগে থেকেই মালিক কর্তৃপক্ষের সশস্ত্র এজেন্ট ও পুলিশ শ্রমিকদের নানাভাবে নির্যাতন করে আসছিল। শ্রমিকরা এর প্রতিবাদে ম্যাককরমিক রিপার ওয়ার্কস শিল্প এলাকা চত্বরের কাছাকাছি জায়গায় যখন সভা সমাবেশ থেকে বক্তৃতা করছেন তখন মালিক কর্তৃপক্ষের এজেন্ট ও পুলিশ তা ছত্রভঙ্গ করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে। শ্রমিকরা প্রতিবাদ করেন ও তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অধিকরের কথা জানান। অবশেষে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। পুলিশ গুলি চালায়। সেদিন ছয়জন শ্রমিক মারা যান ও অনেকে আহত হন। পরের দিন অর্থাৎ ৪টা মে খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে হে মার্কেট স্কোয়ারে একটি প্রতিবাদ সভার আহ্বান করা হয়।

শিকাগো শহরের মেয়র নিজে উপস্থিত থাকেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সাক্ষ্য দেন, 'পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত ছিল এবং সহনীয় আলোচনা ও বক্তৃতা চলছিল'। এমন সময় একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। প্রাণভয়ে আতঙ্কিত লোকজন পালাতে থাকে। পুলিশ সেদিন আবারো সরাসরি গুলি করে। এতে কত লোকের মৃত্যু হয় তার সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে বলা হয়ে থাকে, শ্রমিক বা সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে সাত কিংবা আটজন নিহত এবং চল্লিশ জনেরও অধিক আহত হয়েছেন। অপরপক্ষে ঘটনাস্থলে একজন পুলিশ ও পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে আরো সাতজন মারা যায় বলে দাবি করা হয়। পরবর্তীতে বোমা বিস্ফোরণে একজন পুলিশের মৃত্যু ও অন্যান্য পুলিশের আহতের অবস্থা প্রমাণিত হয়। এই ঘটনার জন্য শ্রমিক নেতাদের মধ্য থেকে এলবার্ট পারসন, অগাস্ট স্পাইস, স্যামুয়েল ফিলডেন, অস্কার নিব্, মাইকেল শোয়াব, জর্জ ইগেল, এডলফ ফিশার এবং ল্যুইস লিংকে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। এই মামলায় মাত্র তিনজন ব্যক্তি ওই ঘটনার সময়ে অভিযুক্ত নেতাদের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। যখন আমেরিকায় বিচারের প্রহসন চলছিল, তখন আমেরিকাসহ সারা দুনিয়াতেই; বিশেষ করে ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়া, হল্যান্ড আর ইংল্যান্ডে শ্রমিকরা সংগঠিত হয়েছিল নেতাদের প্রাণ রক্ষার জন্য।

একদিকে মামলা চালাবার টাকা তোলা হচ্ছিলো আর আমেরিকার সরকারের কাছে তারবার্তা পাঠানো হচ্ছিল। এমনকি ফ্রান্সের চেম্বার

অব ডেপুটিস আর ইংল্যান্ডের উইলিয়াম মরিস, জর্জ বার্নার্ড শ' প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তিরা তাদের বাঁচাতে অক্লান্ত কাজ করছিলেন। শেষ পর্যন্ত মালিকগোষ্ঠী আর তাদের সরকার শ্রমিকদের উচিত শিক্ষা দেয়ার নির্মম উদ্দেশ্যকে হাসিল করতে ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর ইতিহাসের কলঙ্কজনক এক রায়ের মাধ্যমে নেতাদের দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেওয়া হয়। এলবার্ট পারসন, অগাস্ট স্পাইস, জর্জ ইগেল এবং এডলফ ফিশারকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। বিচার কর্তৃপক্ষ ও এই প্রক্রিয়া ন্যায়সঙ্গত নয় বলে এর প্রতিবাদে মৃত্যুদন্ড কার্যকরের আগের দিন ল্যুইস লিং আত্মহত্যা করেন।

১৮৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের নেতৃত্বে প্যারিসে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক-এর প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসে রেমন্ড লাভিনে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশে ১৮৯০ সাল থেকে শিকাগোর প্রতিবাদে বার্ষিকী পালনের প্রস্তাব করেন। ১৯০৪ সালে আমস্টারডাম শহরে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে প্রতি বছর মে মাসের ১ তারিখে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবি আদায়ের জন্য বিশ্বজুড়ে মিছিল ও শোভাযাত্রা আয়োজনে সব সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রতি আহবান জানানো হয়। বিশ্বজুড়ে সব শ্রমিক সংগঠন ১লা মে 'বাধ্যতামূলকভাবে কাজ না করার' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনেক দেশে শ্রমজীবী জনতা মে মাসের ১ তারিখকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালনের দাবি জানায় এবং অনেক দেশেই তা কার্যকর হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে, আমেরিকা এবং কানাডায় আজো মে দিবস পালন করা হয় না।

তাই ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নানা শ্রমিক আন্দোলনের ফসল মহান মে দিবস। ভারতবর্ষে ১৯২৩ সালে মাদ্রাজে সর্ব প্রথম মে দিবস পালিত হয়। কমিউনিস্ট নেতা সিঙ্গাভেল্যু চেটিয়া মেয়ের লাল শাড়ির অংশ কেটে মে দিবসের লাল পতাকা উত্তোলন করেন। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় ১৯২৭ সালে প্রথম মে দিবস পালন করা হয়। দেশ বিভাগের আগে নারায়ণগঞ্জে মে দিবস পালিত হয় ১৯৩৮ সালে। ১৯৪৭ সালে আগের বাংলাদেশে মে দিবস পালিত হয় ঘরোয়া পরিবেশে। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মে মাস পর্যন্ত মে দিবস সীমিত পরিসরে পালিত হয়। ১৯৫৩ সালে পল্টনে মে দিবসের জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণি প্রথবারের মতো বিপুল উৎসাহ নিয়ে মে দিবস পালন করে। আদমজীতে ৩০ হাজার শ্রমিক লাল পতাকা নিয়ে সমাবেশও মিছিলে অংশ নেয়। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পূর্ব পর্যন্ত মে দিবস বেশ বড় আকারে সমাবেশের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই সময় ১ মে দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণার দাবি উঠে।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মে দিবস পুনরায় সীমিত আকারে পালিত হয়। ১৯৭০ সালে মে দিবস পালনে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ করা যায়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর শ্রমিকদের বিরাট অংশ বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে। এই আন্দোলনে সব ট্রেড ইউনিয়ন একাত্মতা ঘোষণা করে। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মে দিবস পালিত হয়। স্বাধীনতার পর মে দিবসটি রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়। বঙ্গবন্ধু ১লা মে তারিখকে মহান মে দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করেন। ১৯৭২ সালের মহান মে দিবস উপলক্ষে তৎকালীন সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধু মহান মে দিবসকে জাতীয় দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মে দিবস শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামী ঐতিহ্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে এক মহান বিজয়। সেই বীরত্বের স্মৃতিগাঁথা মেহনতি মানুষের কাছে অমরত্ব পেয়েছে, প্রেরণা হয়ে জ্বলছে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে। তাই প্রতি বছর মহান মে দিবসে
মুক্তি, মর্যাদা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের সংকল্পে আজো সমানভাবে উজ্জীবিত হয়।

কৃতজ্ঞতা এবং তথ্যসূত্র: যুগান্তর ও ভোরের কাগজ (কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও শাহ মোঃ জিয়াউদ্দিন এবং শিশির আচার্য্য।)

“শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই”

মে দিবস - ২০১৮

স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদ

জনাব এ,বি,এম,সিরাজুল হক উপ সচিব (সংস্থাপন)	আহবায়ক
জনাব এ,টি,এম সাইফুল ইসলাম উপ সচিব (শ্রম)	সদস্য
জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির উপ প্রধান	সদস্য
জনাব শাহীন আখতার উপ সচিব	সদস্য
জনাব দিল আফরোজা বেগম উপ সচিব	সদস্য
জনাব এস, এম, এনামুল হক পরিচালক	সদস্য
জনাব মঞ্জুর কাদের খান যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)	সদস্য
জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া উপ মহা পরিদর্শক	সদস্য

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই"

সিটিজেন চার্টার

শ্রম অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ভবন, ৪, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা
web: www.dol.gov.bd

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তর জনগণের সেবায় নিম্নোক্ত আইন ও বিধি বাস্তবায়ন করে থাকে ঃ
* বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ * শিল্প পরিসংখ্যান আইন ১৯৪২ ও বিধিমালা ১৯৬২ * অভ্যন্তরীণ নৌযান শ্রমিক (নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৯২।

বর্ণিত আইন ও বিধিমালার আওতায় শ্রম অধিদপ্তর দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখতে শান্তিপূর্ণভাবে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত শ্রম আইন বাস্তবায়ন, শ্রমিকদের শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসহ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ, চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা, পরিবার কল্যাণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া অভ্যন্তরীন নৌযান শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণসহ শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী তা সরবরাহ করা হয়ে থাকে। শ্রম অধিপ্তরের অধীনে প্রধান কার্যালয়সহ ০৬টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর এবং ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে।

ভিশন ও মিশন ঃ শিল্প সেক্টরে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ বজায় রাখা এবং শ্রম আইন মতে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি ও বিবরণ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০১	ক) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন, খ) শিল্প ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রেজিষ্ট্রেশন গ) জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন রেজিষ্ট্রেশন ঘ) জাতীয় ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান	নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক আবেদন পত্র দাখিল অথবা অনলাইনে ফরম পূরণ করে ।	নির্ধারিত ফরম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) শ্রম বিধির "৫৫(ক),(খ),(গ),(ঙ),(চ)" "৫৬(ক),(খ),(গ)(চ)" "৫৬(চ) (ছ)" "৫৭(খ),(ঘ) এবং শ্রম অধিদপ্তরের কার্যালয় বা ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ	ক) ৫০০/- টাকা খ) ১০০০/- টাকা গ) ৩০০০/- টাকা ঘ) ৫০০০/- টাকা। চালানের মাধ্যমে কোড নং ১-৩১৪১-০০০০-২৬৮১	১) আবেদন পত্র দাখিল ২) আপত্তির সময়সীমা ১৫দিন। ৩) উত্তর প্রদান সময়সীমা ১৫দিন। ৪) রেজিষ্ট্রেশন আবেদন নিষ্পত্তিকরণ সময়সীমা ৬০দিন।	পরিচালক (ট্রেড ইউনিয়ন) ফোন : ৯৫৫৪২৯২

শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ

ক্রমিক	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি ও বিবরণ	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তি স্থান	সেবামূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০২	ক) গঠনতন্ত্র, নাম ও ঠিকানা পরিবর্তন। খ) ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দলিলের সত্যায়িত কপি প্রদান।	স্বব্যাখ্যাত আবেদনের মাধ্যমে	চাহিত কপি ও শ্রম অধিদপ্তর	ক) ১০০০/- টাকা খ) ৩০০/-টাকা চালানের মাধ্যমে জমা কোডনং ১-৩১৪১-০০০০-২৬৮১	ক) ১৫দিন খ) যথাশীঘ্র।	পরিচালক (ট্রেড ইউনিয়ন) ফোন : ৯৫৫৪২৯২
০৩	অংশগ্রহণ কমিটি গঠন ও কার্যাবলী তত্ত্বাবধান করা।	শ্রম আইন এর ২০৫ ধারা ও বিধি ১৮৩ মোতাবেক নূন্যতম ৫০জন স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারী বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন বা মনোনয়নে কমিটি গঠনে সহায়তা করা	নির্ধারিত ফরম "৬৩' ও "৬৪" অনুযায়ী কমিটি গঠন পূর্বক তথ্য প্রেরণ, ০২ মাস অন্তর অন্তর সভা অনুষ্ঠান পূর্বক কার্যবিবরণী দাখিল এবং শ্রম অধিদপ্তরের কার্যালয় ।	বিনামূল্যে	মালিক নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ৩০দিন পূর্বে মহাপরিচালক কে অবহিত করণ। কার্যবিবরণী দাখিল ০৭দিন।	উপ পরিচালক (অংশগ্রহন কমিটি) ফোন : ৯৫৫৭৯২৫
০৪	ক) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) নির্ধারণ। খ) কার্যকরী কমিটির নির্বাচন তত্ত্বাবধান।	একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে গোপন ব্যালটে নির্বাচন অনুষ্ঠান সরেজমিনে তত্ত্বাবধায়ন করা	.....	বিনামূল্যে	১২০দিন	পরিচালক (ট্রেড ইউনিয়ন) ফোন : ৯৫৫২১৮৯
০৫	শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	মালিক এবং সিবিএ মধ্যকার বিরোধ নিস্পত্তি না হলে ত্রিপক্ষীয় ভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করা।	.....	বিনামূল্যে	নূন্যতম ৬০দিন অথবা উভয়পক্ষের সম্মতিতে বর্ধিত মেয়াদ	উপ পরিচালক (সালিশী) ফোন : ৯৫৫৮১৪৯
০৬	কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ	বাৎসরিক লেবার জার্নাল প্রকাশ, ত্রৈমাসিক রিটার্ণ ফরম "সি"; নোটিশ প্রদানের জন্য ফরম "এফ" চাহিত তথ্যাদি	স্বব্যাখ্যাত আবেদন	প্রকাশনা মূল্য	পূর্বের বছরের জার্নাল	উপ পরিচালক (পরিসংখ্যান) ফোন : ৯৫৫৮১৪৯
০৭	অসৎ শ্রম আচরণ/ এন্টি-ট্রেডইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তি	ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা ও নিষ্পত্তি	স্বব্যাখ্যাত আবেদন	বিনামূল্যে	৬০ দিন	উপ পরিচালক (সালিশী) ফোন : ৯৫৫৮১৪৯
০৮	অনলাইন সেবা	ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন, অভিযোগ ও বিভিন্ন ফরম, তথ্য উপাত্ত এবং আইন, বিধিমালা তথ্যাদি।	ওয়েব সাইট www.dol.gov.bd	বিনামূল্যে	২৪ ঘন্টা	সহকারী পরিচালক (আইসিটি) ফোন : ৯৫৬৪৮২৪
০৯	হট লাইন	শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ তাৎক্ষনিক নিষ্পত্তি	.....	বিনামূল্যে	২৪ ঘন্টা	শ্রম অধিদপ্তর ফোন নম্বর : ০৮০০-৪৪৫৫০০০

শ্রম অধিদপ্তরাধীন দপ্তর সমূহের সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

ক্রমিক	সেবার ধরণ	সেবা গ্রহণকারী	সেবা প্রদান কারী প্রতিষ্ঠান
০১	শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ শ্রম আইন, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম প্রশাসন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কার্যাবলী, বিভিন্ন শ্রম কনভেনশন এবং চলমান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চার সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ ও ভাতা প্রদান।	সরকার ও মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধি	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন গাজীপুর (টঙ্গী), চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী
০২	শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ শ্রম আইন, শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব, মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য উৎপাদনশীলতা,শ্রম বান্ধব কর্মপরিবেশ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সুখী পরিবার গঠন, শ্রমিকের জন্য কল্যানমূলক কাজসমূহ ইত্যাদি এক সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান।	শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক / কর্মচারী/মালিক প্রতিনিধি	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন গাজীপুর (টঙ্গী), চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী এবং সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও/টংগী/সরিষাবাড়ী/চাষাড়া/ বন্দর/নরসিংদী/ঘোড়াশাল/আশুগঞ্জ/ চাঁদপুর/ষোলশহর/ কালুরঘাট/রূপসা/খালিশপুর/কুষ্টিয়া/ মংলা/বরিশাল/সপুরা/বগুড়া/সিরাজগঞ্জ /সৈয়দপুর/গাইবান্ধা/ফুঁসকুড়ি/ পাত্রখোলা/ কাপনাপাহাড়/ লোয়াইউনি/শমসেরনগর/ চন্ডিছড়া/চিকনাগুল/ঘাঘড়া/চৌমুহনী।
০৩	বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ।	স্থানীয় শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের সদস্য	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও/টংগী/সরিষাবাড়ী/চাষাড়া/ বন্দর/নরসিংদী/ঘোড়াশাল/আশুগঞ্জ/ চাঁদপুর/ষোলশহর/ কালুরঘাট/রূপসা/খালিশপুর/কুষ্টিয়া/ মংলা/বরিশাল/সপুরা/বগুড়া/সিরাজগঞ্জ /সৈয়দপুর/গাইবান্ধা/ফুঁসকুড়ি/ পাত্রখোলা/ কাপনাপাহাড়/ লোয়াইউনি/শমসেরনগর/ চন্ডিছড়া/চিকনাগুল/ ঘাঘড়া/চৌমুহনী।
০৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।	স্থানীয় শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের সদস্য	
০৫	সংবাদপত্র, টিভি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জামের মাধ্যমে বিনোদন প্রদান।	স্থানীয় শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের সদস্য	
০৬	শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ ও শ্রমিক কলোনী পরিদর্শন।	স্থানীয় শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের সদস্য	

অভিযোগ ও প্রতিকার ব্যবস্থা ঃ

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
০১	জেলা পর্যায়ের দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	পরিচালক বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	ঢাকা- পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ৪,রাজউক এভিনিউ, ঢাকা। ফোন : ০২ ৯৫৭৭৭৩৫ চট্টগ্রাম-পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, জাম্বুরীমাঠ, আগ্রাবাদ, ঢাকা। ফোন : ০৩ ১৭২৩২৫৮ রাজশাহী-পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, গ্রেটাররোড, রাজশাহী। ফোন : ০৭ ২১৭৭২৬২৯ খুলনা- পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, বয়রা, খুলনা।ফোন : ০৪ ১৭৬১১০১ মৌলভীবাজার - উপপরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর , শ্রীমঙ্গল ফোন: ০৮৬২৬৭২৭১৩	যথা সম্ভব দ্রুততম সময়ে
০২	বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে না পারলে	মহাপরিচালক	শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ৪, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা। ফোন : ০২৯৫৫৫৫৩৭	যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে

শ্রম অধিদপ্তর ও তার অধীনের সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন অফিসমূহের নাম ও ঠিকানা

ক্রমিক	দপ্তরের নাম	ঠিকানা
১.	শ্রম অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
২.	ঢাকা বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	শ্রম ভবন (৮ম ও ৯ম তলা) ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	জাম্বুরীমাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
৪.	খুলনা বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	বয়রা, খুলনা।
৫.	রাজশাহী বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
৬.	নারায়নগঞ্জ বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	বাগে জান্নাত মসজিদ গলি, ১৪২, নবাব সলিমুল্লাহ রোড, চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ।
৭.	মৌলভীবাজার বিভাগীয় শ্রম দপ্তর	১০নং ভানুগাছ রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
৮.	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, টঙ্গী	টঙ্গী, গাজীপুর।
৯.	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম	নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
১০.	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, খুলনা	মীরেরডাঙ্গা, খুলনা।
১১.	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, রাজশাহী	উপশহর, তেরখাদা, রাজশাহী।
১২.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া	চকসূত্রাপুর, বগুড়া।
১৩.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ফরিদপুর	পশ্চিম গোয়ালচামট, ২নং সড়ক, ফরিদপুর।
১৪.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ময়মনসিংহ	ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক, মাসকান্দা, ময়মনসিংহ।

ক্রমিক	দপ্তরের নাম	ঠিকানা
১৫.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ভবন নং-২, কক্ষ নং-২০১, সিলেট।
১৬.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুমিল্লা	যাদুঘর রোড, ক্যাডেট কলেজ ১ম গেট সংলগ্ন, কোটবাড়ি, কুমিল্লা।
১৭.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, দিনাজপুর	বালুয়া ডাঙ্গাঁর মোড়, পাহাড়পুর, দিনাজপুর।
১৮.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুষ্টিয়া	৫নং মাহতাব উদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।
১৯.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বরিশাল	আমানতগঞ্জ, বরিশাল।
২০.	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর	আর.কে. রোড, সাতগাড়া, গণেশপুর, রংপুর।
২১.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও	তেজগাঁও, ঢাকা।
২২.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, টঙ্গী	মন্নুনগর, টঙ্গী, গাজীপুর।
২৩.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, জামালপুর	শিমলা বাজার, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।
২৪.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাষাড়া	চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ।
২৫.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বন্দর	বন্দর, নারায়নগঞ্জ।
২৬.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সাঁটিরপাড়া	সাঁটিরপাড়া, নরসিংদী।
২৭.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ঘোড়াশাল	পলাশ, ঘোড়াশাল, নরসিংদী।
২৮.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আশুগঞ্জ	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।
২৯.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রীমঙ্গল	১০নং ভানুগাছ রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
৩০.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ষোলশহর	ষোলশহর, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৩১.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কালুরঘাট	কালুরঘাট, চাঁন্দগাও, চট্টগ্রাম।
৩২.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ফুসকুঁড়ি	ফুসকুঁড়ি, খেজুরীছড়া, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
৩৩.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সমশের নগর	সমশেরনগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
৩৪.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চিকনাগুল	চিকনাগুল, খান চা-বাগান, সিলেট।
৩৫.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, পাত্রখোলা	পাত্রখোলা চা বাগান, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
৩৬.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, লোয়াইউনি	লোয়াইউনি চা-বাগান, কাজলধারা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।
৩৭.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কাপনাপাহাড়	কাপনাপাহাড় চা-বাগান, জুরি, মৌলভীবাজার।
৩৮.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চন্ডিছড়া	চন্ডিছড়া চা-বাগান, চুনারঘাট, হবিগঞ্জ।
৩৯.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চাঁদপুর	পুরাণ বাজার, চাঁদপুর।
৪০.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, বগুড়া	চকসূত্রাপুর, বগুড়া।
৪১.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সপুরা	সপুরা, রাজশাহী।
৪২.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ	ফজলুল হক রোড, মিরপুর, সিরাজগঞ্জ।
৪৩.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা	গোডাউন রোড, গাইবান্ধা।
৪৪.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, লালমনিরহাট	লালমনিরহাট শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কলেজ রোড, লালমনিরহাট।

ক্রমিক	দপ্তরের নাম	ঠিকানা
৪৫.	সরকারী শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, সৈয়দপুর	সৈয়দপুর, নীলফামারী।
৪৬.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, রূপসা	রূপসা, খুলনা।
৪৭.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া	৫নং মাহতাব উদ্দিন রোড, কুষ্টিয়া।
৪৮.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, খালিশপুর	খালিশপুর, খুলনা।
৪৯.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, মংলা	মংলা, বাগেরহাট।
৫০.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, আমানতগঞ্জ	আমানতগঞ্জ, বরিশাল।
৫১.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চৌমুহনী	চৌমুহনী, নোয়াখালী।
৫২.	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ঘাঘড়া	ঘাঘড়া, রাঙ্গামাটি।

“শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই”

মহান মে দিবস-২০১৮

উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি

প্রধান পৃষ্ঠপোষক	ঃ	আফরোজা খান সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রধান সমন্বয়কারী	ঃ	জনাব মোঃ আশরাফ শামীম অতিরিক্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মুখ্য সমন্বয়ক	ঃ	জনাব মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া মহা পরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সমন্বয়ক	ঃ	জনাব শিবনাথ রায় মহা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), শ্রম অধিদপ্তর

অতিথি তালিকা প্রণয়ন/ আমন্ত্রণ পত্র সংগ্রহ ও বিতরণ

১।	জনাব মোঃ আশরাফ শামীম	অতিরিক্ত সচিব।
২।	জনাবা মোঃ আমিনুল ইসলাম	যুগ্ম সচিব (শ্রম)।
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)।
৪।	জনাব মুহাম্মদ তাইয়েবুল ইসলাম	যুগ্ম সচিব (আদালত ও সমন্বয়)।
৫।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচাল (উপ সচিব)।
৬।	জনাব এস,এম, এনামুল হক	পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	পরিচালক
৮।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৯।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
১০।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	পরিচালক (চ:দা:)
১১।	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দীন মাহমুদ	উপ পরিচালক
১২।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী প্রধান (আইও-১)
১৩।	জনাব মিনু আফরোজ	উপ পরিচালক
১৪।	ইঞ্জিনিয়ার ফরিদ আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
১৫।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহাপরিদর্শক
১৬।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম ফকির	উপ পরিচালক
১৭।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
১৮।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	উপ পরিচালক

র‍্যালী ব্যবস্থাপনা

১।	জনাব শিবনাথ রায়	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
২।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
৩।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৫।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
৭।	বেগম আছমা-উল-হোসনা	সহকারী সচিব (নারী ও শিশু শ্রম)
৮।	জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ	পরিচালক (চ:দা:)
৯।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহা পরিদর্শক
১০।	ডাঃ আবু সালেহ মোঃ রিয়াজি	পরিচালক (মেডিকেল) (চ:দা:)
১১।	জনাব মোঃ ফোরকান আহসান	জন সংযোগ কর্মকর্তা
১২।	জনাব আব্দুর রশিদ পাঠান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
১৩।	জনাব মোঃ গাজীউর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সেমিনার আয়োজন

১।	জনাব মোঃ সামসুজ্জামান ভূইয়া	মহাপরিদর্শক
২।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	যুগ্ম সচিব (শ্রম)
৩।	জনাব এস, এম, জাহেদুল করিম	যুগ্ম সচিব (বাজেট)
৪।	জনাব মুহাম্মদ তাইয়েবুল ইসলাম	যুগ্ম সচিব (আদালত ও সমন্বয়)
৫।	জনাব এ,টি,এম সাইফুল ইসলাম	উপ সচিব (শ্রম)
৬।	বেগম মাহবুবা শাহীন	উপ সচিব
৭।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৮।	বেগম আছমা আরা	সিনিয়র সহকারী সচিব
৯।	ডাঃ আবু সালেহ মোঃ রিয়াজি	পরিচালক (মেডিকেল) (চ:দা:)
১০।	জনাব মিনু আফরোজ	উপ পরিচালক
১১।	জনাব মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	উপ মহাপরিদর্শক
১২।	জনাব মোজাম্মেল হোসেন	সহকারী মহাপরিদর্শক
১৩।	জনাব জসিম উদ্দিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১৪।	জনাব মোহাম্মদ কেফাত আলী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (আইও)
২।	জনাব হুমায়ুন কবির	উপ প্রধান
৩।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	পরিচালক
৪।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
৫।	বাংলাদেশশিল্প কলা একাডেমীর প্রতিনিধি	
৬।	জনাব মোহাব্বত হোসেন	উপ পরিচালক
৭।	বেগম মোরশেদা হাই	সহকারী সচিব (আইন)
৮।	জনাব মাসুদা সুলতানা	সহকারী পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	সচিব, নিম্নতম মজুরী বোর্ড

মেইন গেইট ও সড়ক দ্বীপ সজ্জিতকরণ এবং ব্যানার স্থাপন

১।	জনাব শিবনাথ রায়	মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
২।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৩।	জনাব আবু আশরাফী মাহমুদ	পরিচালক (চ:দা:)
৪।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহা পরিদর্শক
৫।	ডাঃ সালাউদ্দিন মাহমুদ	উপ মহা পরিদর্শক (মেডিকেল)
৬।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	উপ পরিচালক (চ:দা:)
৭।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী মহা পরিদর্শক
৮।	জনাব মাহবুবুল আলম	সহকারী পরিচালক
৯।	জনাব কবির উদ্দিন হাওলাদার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
১০।	জনাব সবুর শেখ	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)

মূল প্রবেশ পথে অভ্যর্থনা

১।	জনাব মোঃ আশরাফ শামীম	অতিরিক্ত সচিব
২।	জনাব এ,বি,এম খোরশেদ আলম	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি
৩।	জনাব মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া	মহাপরিদর্শক
৪।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (আইও)
৫।	বেগম জাহানারা বেগম	যুগ্ম সচিব (বাজেট)
৬।	বেগম শাকিলা জেরিন আহমেদ	যুগ্ম সচিব
৭।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৮।	জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ	সহকারী প্রধান

স্মরণিকা সম্পাদনা

১।	জনাব এ,বি,এম,সিরাজুল হক	উপ সচিব (সংস্থাপন)
২।	জনাব এ,টি,এম সাইফুল ইসলাম	উপ সচিব (শ্রম)
৩।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	উপ প্রধান
৪।	জনাব শাহীন আখতার	উপ সচিব
৫।	জনাব দিল আফরোজা বেগম	উপ সচিব
৬।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	পরিচালক
৭।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৮।	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	উপ মহা পরিদর্শক

স্মরণিকা বিতরণ

১।	ড. মোঃ রেজাউল হক	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
২।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৩।	জনাব মহিদুর রহমান	উপ সচিব
৪।	ডাঃ আবু সালেহ মোঃ রিয়াজি	পরিচালক (মেডিকেল) (চ:দা:)
৫।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৬।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	পরিচালক (চ:দা:)
৭।	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	উপ মহা পরিদর্শক
৮।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
১০।	জনাব মোঃ আবু হাসনাত	উপ পরিচালক (চ:দা:)
১১।	বেগম আফরোজা সুলতানা	সহকারী পরিচালক
১২।	জনাব মোঃ আল আমিন	সহকারী মহা পরিদর্শক (সাধারণ)
১৩।	জনাব মোঃ তোফায়েল আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

আসন বিন্যাস ও স্টিকার তৈরি করা

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
২।	ড. মোঃ রেজাউল হক	যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)
৩।	বেগম শাকিলা জেরিন আহমেদ	যুগ্ম সচিব
৪।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
৫।	জনাব মহিদুর রহমান	উপ সচিব
৬।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী	উপ প্রধান (পরিকল্পনা)
৭।	জনাব মোঃ হুমায়ুন করিব	উপ প্রধান
৮।	বেগম দিল আফরোজা বেগম	উপ সচিব (শাখা-১০)
৯।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী প্রধান
১০।	বেগম আছমা-উল-হোসনা	সহকারী সচিব (নারী ও শিশু শ্রম)
১১।	ইঞ্জিনিয়ার ফরিদ আহমেদ	উপ মহাপরিদর্শক
১২।	জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
১৩।	জনাব মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন	পরিচালক (চ:দা:)
১৪।	জনাব মোঃ হাফেজ আহাম্মদ মজুমদার	উপ পরিচালক
১৫।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
১৬।	বেগম রোখসানা চৌধুরী	উপ পরিচালক
১৭।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী পরিচালক
১৮।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহা পরিদর্শক
১৯।	জনাব সৌমেন বড়ুয়া	সহকারী মহাপরিদর্শক
২০।	শিকদার মোঃ তৌহিদ হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক
২১।	জনাব মোঃ মাহবুবুল হাসান	উপ মহাপরিদর্শক
২২।	জনাব মোঃ আব্দুস সাত্তার	শ্রম পরিদর্শক
২৩।	জনাব মোঃ হান্নান সরদার	প্রটোকল অফিসার
২৪।	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	সচিব, নিম্নতম মজুরি বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার স্থাপন

১।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী প্রধান
২।	জনাব মোঃ এমদাদুল হক	অফিস সহায়ক
৩।	জনাব মোঃ লিটন আহম্মেদ	অফিস সহায়ক
৪।	জনাব মোঃ আসাদুল ইসলাম	অফিস সহায়ক

বহিরাঙ্গন অভ্যর্থনা

১।	জনাব এস এম জাহিদুল করিম	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
২।	জনাব শাহীন আখতার	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশিক্ষণ)
৩।	জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ	পরিচালক (চ:দা:)
৪।	জনাব খোরশেদুল হক ভূইয়া	পরিচালক
৫।	জনাব মাসুদা সুলতানা	সহকারী পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন মাহমুদ	উপ পরিচালক
৭।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহা পরিদর্শক
৮।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
৯।	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা

আলোচনা মঞ্চ সজ্জিতকরণ

১।	জনাব খোন্দকার মোস্তান হোসেন	অতিরিক্ত সচিব (আইও)
২।	জনাব এস, এম, এনামুল হক	পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ তৌহিদুল হক ভূইয়া	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৪।	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন মাহমুদ	উপ পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
৬।	জনাব শিকদার মোঃ তৌহিদ হাসান	সহকারী মহা পরিদর্শক

পবিত্র কোরআন শরীফ, গীতা, ত্রিপিটক, বাইবেল ও সঞ্চালক আনা-নেওয়ার দায়িত্ব

১।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	পরিচালক
২।	জনাব মোঃ সাইকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
৩।	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপ মহাপরিদর্শক
৪।	জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন মাহমুদ	উপ পরিচালক
৫।	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
৬।	জনাব ফিরোজুর রহমান	সহকারী পরিচালক (চ:দা)
৭।	জনাব রাকিব মাশরুর খান	সহকারী মহাপরিদর্শক সেফটি)
৮।	জনাব শাহ মোফাখখারুল ইসলাম	সহকারী মহাপরিদর্শক
৯।	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	শ্রম পরিদর্শক
১০।	জনাব মোঃ নাইমুল আজিজ	শ্রম পরিদর্শক

এস,বি/ডিউটি পাসের ব্যবস্থা করা

১।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
২।	জনাব শাহীন আখতার	উপ সচিব (প্রশাসন)
৩।	জনাব মোঃ শামসুল আলম খান	যুগ্ম মহা পরিদর্শক (চ:দা:)
৪।	জনাব মাসুদা সুলতানা	সহকারী পরিচালক
৫।	জনাব মাহমুব আলম	সহকারী পরিচালক
৬।	জনাব মোঃ জহিরুল হক	গবেষণা সহকারী
৭।	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল হক ভূইয়া	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)
৮।	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চ:দা:)

প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবস্থাপনা

১।	জনাব অমর চান বণিক	মননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব
২।	জনাব মোঃ আকতারুল ইসলাম	জনসংযোগ কর্মকর্তা
৩।	জনাব শফিকুল ইসলাম	উপ পরিচালক
৪।	জনাব ফোরকান আহসান	তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা

মোবইল/ব্যাগ সংরক্ষণ

১।	জনাব শফিকুল ইসলাম	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
২।	জনাব এনামুল হক রাকিব	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ
৩।	জনাব মোঃ উজ্জ্বল হোসেন	অফিস সহঃ কাম কম্পিউার মুদ্রাঃ
৪।	জনাব জহুরুল হক বুলবুল	গবেষণা কর্মকর্তা
৫।	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম	অফিস সহায়ক

গেঞ্জি, টুপি বিতরণ

১।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এসহান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
২।	ইকবাল আহমেদ	উপ-মহাপরিদর্শক
৩।	জনাব আবুল হাসনাত	উপ পরিচালক (চ:দা:)
৪।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	পরিচালক
৫।	ডাঃ রাজন তালুকদার	সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
৬।	জনাব মোঃ শাহীনুর ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
৭।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
৮।	জনাব মোঃ আবদুস সামাদ সিকদার	দপ্তরী

ফোকাল পয়েন্ট

১।	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	যুগ্ম সচিব (শ্রম)
২।	জনাব এস,এম এনামুল হক	পরিচালক
৩।	জনাব মঞ্জুর কাদের খান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)

দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি

১।	জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ	পরিচালক (চ:দা:)	সভাপতি
২।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহাপরিচালক (চ:দা:)	সদস্য
৩।	জনাব মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	উপ-মহাপরিদর্শক	সদস্য
৪।	জনাব অধীর চন্দ্র বালা	রেজিষ্ট্রার, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	সদস্য
৫।	জনাব সালাউদ্দিন মাহমুদ	উপ পরিচালক	সদস্য সচিব

আয়-ব্যয় হিসাব সংক্রান্ত কমিটি

১।	জনাব মোঃ সামসুজ্জামান ভূইয়া	মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)
২।	জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন)
৩।	জনাব মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা	যুগ্ম পরিচালক
৪।	জনাব শামসুল আলম খান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
৫।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	উপ পরিচালক (চ:দা:)
৬।	মিসেস রোখসানা চৌধুরী	উপ পরিচালক

স্মরণিকা ও ক্রোড়পত্রের বাণী প্রণয়ন

১।	জনাব এস,এম, এনামুল হক	পরিচালক
২।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
৩।	বেগম রোখসানা চৌধুরী	উপ পরিচালক
৪।	জনাম মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী পরিচালক
৫।	জনাব মেহেদী হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক
৬।	জনাব মোঃ আবু হাসানাত	উপ পরিচালক (চ:দা:)

প্রচার সংক্রান্ত কমিটি

১।	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন	প্রকল্প পরিচালক (উপ সচিব)
২।	বেগম শামীমা সুলতানা বারী	পরিচালক (চ:দা:)
৩।	জনাব রফিকুল ইসলাম ফকির	উপ পরিচালক
৪।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সরকার	সহকারী পরিচালক
৫।	বেগম শারমিন সুলতানা	সহকারী মহাপরিদর্শক (নিরাপত্তা)

খসড়া ভাষণ প্রণয়ন

১।	জনাব আবু আশরীফ মাহমুদ	পরিচালক (চ:দা)
২।	ডাঃ সৈয়দ আবুল এহসান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক (চ:দা:)
৩।	জনাব তৌহিদুল হক ভূইয়া	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৪।	জনাব মোঃ আমিনুল হক	পরিচালক
৫।	জনাব এস এম সালাউদ্দিন	সহকারী পরিদর্শক (সাধারণ)

দাওয়াত কার্ড প্রণয়ন

১।	জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ	উপ পরিচালক
২।	জনাব মোঃ আল আমিন	সহকারী মহাপরিদর্শক
৩।	জনাব তৌহিদুল হক ভূইয়া	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)
৪।	জনাব শিকদার তৌহিদ হাসান	সহকারী মহাপরিদর্শক

অনুষ্ঠানসূচি

৩: ৩০ : আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ

৪:০০ : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন

৪:০১ : পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে তেলাওয়াত/পাঠ

৪:০৯ : সচিব এর স্বাগত বক্তব্য

৪:১২ : শ্রমিক প্রতিনিধির বক্তব্য

৪:১৫ : সভাপতি, বিজিএমইএ-এর বক্তব্য

৪:১৮ : সভাপতি, বিইএফ-এর বক্তব্য

৪:২১ : আইএলও প্রতিনিধির বক্তব্য

৪:২৪ : বিশেষ অতিথির বক্তব্য

৪:২৭ : বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান

৪:৩৭ : সভাপতির বক্তব্য

৪:৪৩ : **মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ**

: সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

- অনুগ্রহপূর্বক আমন্ত্রণপত্র সাথে আনবেন। এ আমন্ত্রণপত্র হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- ব্রিফকেস, মোবাইল ফোন, হাত ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, ক্যামেরা, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সাথে না আনার জন্য অনুরোধ করা হল।
- অনুষ্ঠান শুরুর অন্তত ৩০ মিঃ পূর্বে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

“শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই
সোনার বাংলা গড়তে চাই”

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের স্থির চিত্র

মহান মে দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান মে দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

মহান মে দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট রাষ্ট্রায়াত্ব, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা স্বায়ত্বশাসিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশনের প্রতিবেদন হস্তান্তর।

মহান মে দিবস, ২০১৭ এ মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে আলোচনা করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা সহায়তার চেক দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান মে দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মহান মে দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী, মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রীসহ জাতীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

মহান মে দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

মহান মে দিবস, ২০১৭ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি, সভাপতি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

১০৬তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি।

১০৬তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে উপস্থিত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি সহ অন্যান্য ডেলিগেটবৃন্দ।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ আইএলও এর হেড কোয়ার্টারে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি এর সাথে আইএলও'র Director General Mr. Guy Ryder.

৩৩১তম ILO গভর্ণিং বডির সভায় উপস্থিত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি এবং শ্রম সচিব আফরোজা খান সহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত শারলোটা স্লাইটার মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাত।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি ৫ এপ্রিল, ২০১৮ স্পেকট্রা কনভেনশন হলে বাংলাদেশ এইচআরএম সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন এর শুভ উদ্বোধন করেন।

শ্রম সচিব আফরোজা খান-কে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন অতিরিক্ত সচিব জনাব মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন।

প্রিয়বাংলা সাংস্কৃতিক নিকেতন কর্তৃক আয়োজিত গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল হাজিরার শুভ উদ্বোধন করছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি।

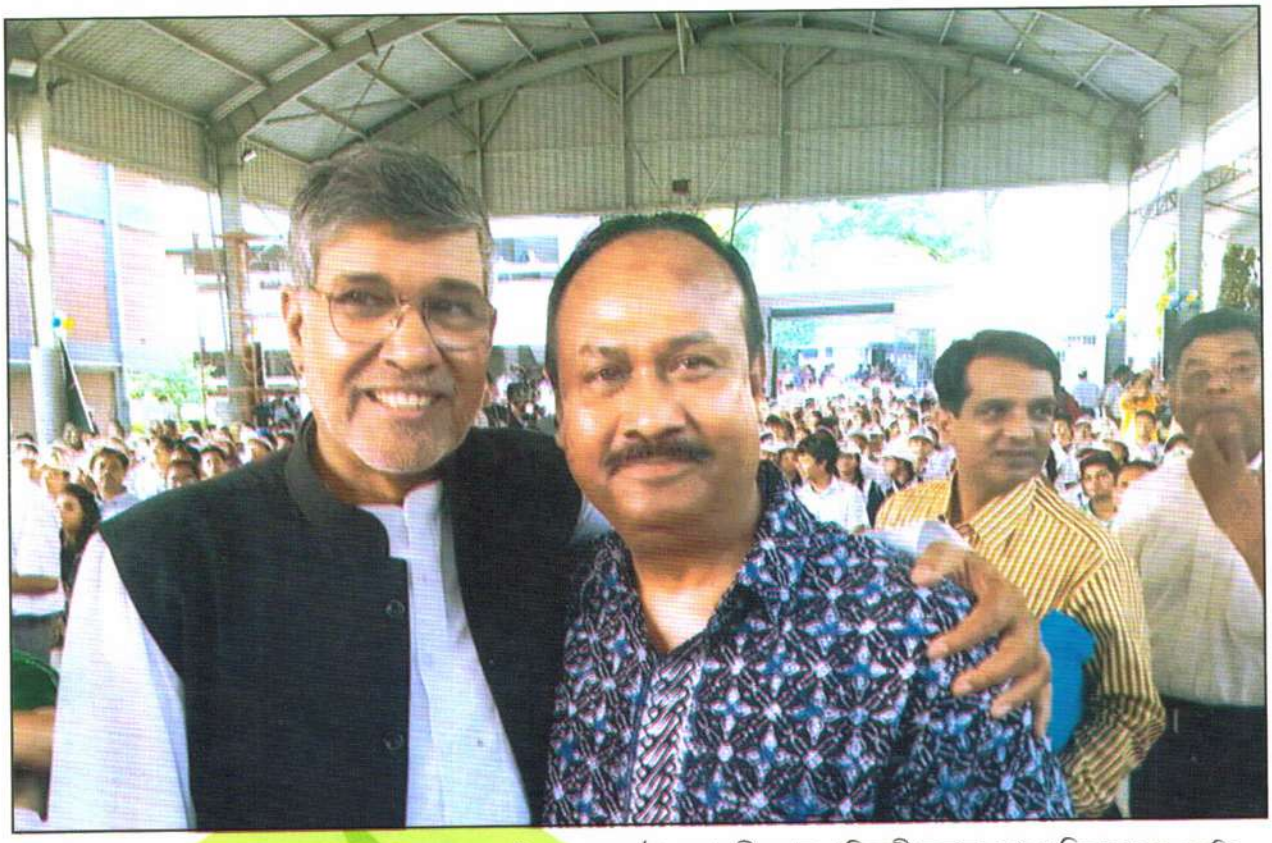

100 Million for 100 Million Campaign উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি এর সাথে ভারতের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জনাব কৈলাশ সত্যার্থী।

চট্টগ্রাম রেডিসন ব্লু হোটেলে আয়োজিত 2nd BSHRM Chittagong Summit-এ প্রধান অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি।

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী ও শ্রম সচিব এর নিকট বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস এর পক্ষ থেকে WPPF এর চেক হস্তান্তর।

মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এম.পি ও মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি এর নেতৃত্বে আইএলও Director General Mr. Guy Ryder এর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা।

স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত শোভাযাত্রা।

হাজী এম.এ মান্নান বি.এ বিটি বিদ্যাপীঠ এর পক্ষ থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি কে সম্বর্ধনা।

ইউরোপীয় পার্লামেন্টারী ডেলিগেট এর সাথে দ্বিপাক্ষিক সভায় উপস্থিত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী এবং শ্রম সচিবসহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

এমপ্লয়মেন্ট ইন্‌জুরি ইন্সুরেন্স স্কীম এর Consultative meeting এ মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি এবং শ্রম সচিব আফরোজা খান সহ অন্যান্য অংশীজন।

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ এ কমিউনিটি পুলিশিং ডে, ২০১৭ এর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি।

আইএলও কর্তৃক আয়োজিত Stakeholder Workshop on Green Jobs এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন শ্রম সচিব আফরোজা খান।

বিশ্ব শিশু দিবস-২০১৭ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে শিশুদের সাথে আনন্দঘন মূহুর্তে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি।

Best Practices in Occupational Safety and Health in South Korea প্রোগ্রামে আফরোজা খান, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য ডেলিগেটবৃন্দ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং শ্রম সচিব এর সাথে সিয়াম সিমেন্ট (বাংলাদেশ) লিঃ প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের চেক হস্তান্তর।

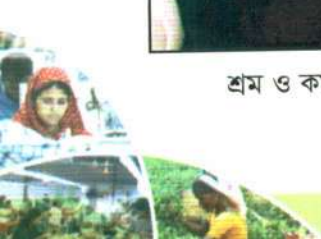

Bilateral Agreement with Nanyang Polytechnic International, Singapore, about Tripartite Concurrent Leaders Programme.

১০৬তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে মাননীয় আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী এবং ILO Director General Mr. Guy Ryder সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

Bilateral meeting with ILO representative about elimination of child Labor(IPEC) at ILO head quarter.

ঘাঘরা শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি, উপস্থিত ছিলেন শ্রম সচিব আফরোজা খান।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত Workshop on SDGs for targets এর মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি, শ্রম সচিব আফরোজা খান ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

4th Global Conference on sustainable eradication of Child Labor in Buenos Aires, Argentina এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি।

লন্ডনে The Education World Forum এর প্রোগ্রামে মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি ও অন্যান্য ডেলিগেটবৃন্দ।

Second Meeting of the Steering Committee of Islamic Conference of Labor & Employment Minister at Jakarta, Indonesia.

প্রাক্তন শ্রম সচিব জনাব মিকাইল শিপার এর বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী এবং শ্রম সচিব সহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত মহান মে দিবস, ২০১৭ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত শ্রমিক প্রতিনিধিবৃন্দ।

কিশোরগঞ্জের ইটনা উপজেলার থানেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭০ বছর পূর্তি উৎসবে উপস্থিত মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি।

মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী এবং শ্রম সচিব এর সাথে বার্জার পেইন্টের প্রতিনিধিবৃন্দের সাক্ষাৎ এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের চেক হস্তান্তর।

আমেরিকার সানফ্রানসিস্‌কোতে বিশ্বব্যাংক, বিভিন্ন ব্র্যান্ড এবং বায়ার প্রতিনিধিদের সাথে ১৯/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি।

নব নির্মিত শ্রম ভবনের কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন মাননীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি এবং শ্রম সচিব আফরোজা খান।

Training on Conciliation of Labour Disputes Organised by SDIR Project of ILO in Collaboration with DOL in Presence of Mr. Shib Nath Roy, Director General, Department of Labour.

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মুজিবুল হক এম.পি এর সাথে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক জনাব মোঃ সামছুজ্জামান ভূইয়া।

সহযোগিতায়...

WISHING THE VERY BEST FOR MAY DAY-2018

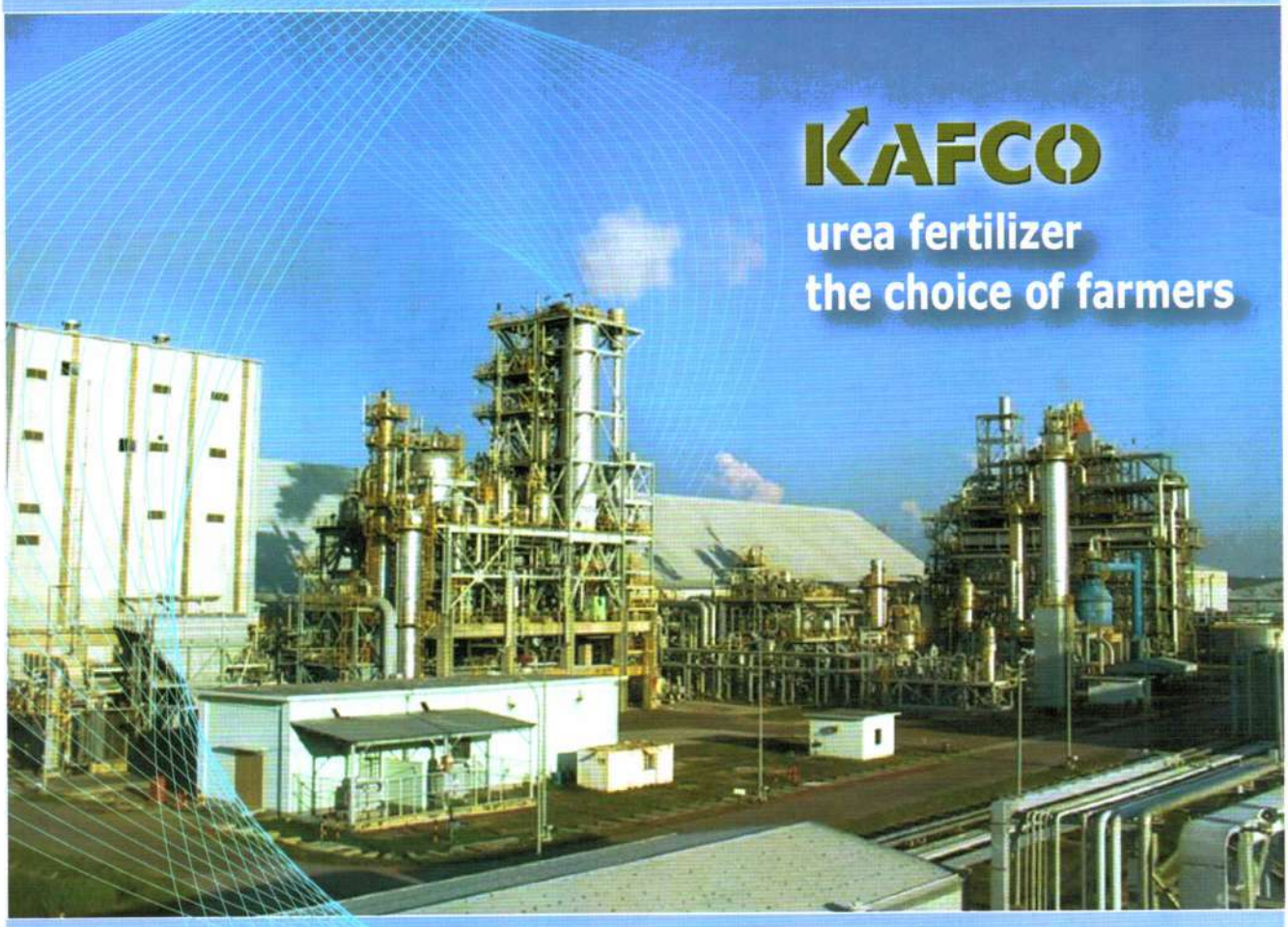

In service to farmers for the past 23 years

Proud to have contributed to the growth of Agriculture

KAFCO
Partner in progress – farmers' friend

Karnaphuli Fertilizer Company Limited
Leading Fertilizer Producer in Bangladesh

→ Linde Bangladesh Limited
Consolidating for growth
THE LINDE GROUP
Linde

Radisson BLU
DHAKA
WATER GARDEN
YOUR
BUSINESS HOTEL
IN A RESORT SETTING
Sprawling over 7 acres of manicured gardens with water features, Radisson Blu Dhaka Water Garden is a business hotel with an ambiance of an exclusive resort. Away from the hustle & bustle of the city, the hotel exudes an air of surprising serenity.
RADISSON BLU DHAKA WATER GARDEN
Airport Road, Dhaka Cantonment, Dhaka 1206, Bangladesh
Phone: +880 2 9834555, Fax: +880 2 9834554
radissonblu.com/hotel-dhaka

axiata
roam
robi
Worry-Free Roaming
Unlimited data, local calls and SMS
@only Tk.999 daily, dial *140*10*6#
HOTEL
ROME
FIRST TIME IN BANGLADESH
For more details visit:
www.robi.com.bd/current-offers/roaming-bundle
visit: /RobiFanz
For your personal safety, avoid disclosing personal information or your PIN
an axiata company
robi.com.bd
ignite the power within

BANGLALINK 4G
7:30AM
100%
LIVE
163M
banglalink
banglalink
4G
বাংলাদেশ এমন দেখেনি আগে
যা দেখি নতুন লাগে
বাংলালিংক-এর নতুন শক্তিশালী নেটওয়ার্কে ইউটিউব ভিডিও স্ট্রিমিং, ফেসবুক লাইভ, ভিডিও কল,
ডাউনলোড-আপলোডসহ যেকোনো ইন্টারনেট এক্সপেরিয়েন্স এতোটাই স্মুথ হবে যে সবকিছু নতুন লাগবে।
বিস্তারিত: banglalink.net/4G
asiaticjwt/Banglalink/2018

প্রকাশনায়

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বিএফডিসি কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স
(৩য় ও ৪র্থ তলা), ২৩-২৪ কাওরান বাজার
ঢাকা-১২১৫।
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৫৫০১৩৬২৬
e-mail : chiefdife@gmail.com

শ্রম অধিদপ্তর

৪ রাজউক এভিনিউ, শ্রম ভবন, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৯৫৫৫৫৩৭
ফ্যাক্স ঃ +৮৮ ০২ ৯৫৫৮১৭৯
e-mail : director_deptoflab@yahoo.com

ডিজাইন ও মুদ্রণে ঃ

ইনোভেটিভ ওয়ে সলিউশন লিঃ
৩৩, কাওরান বাজার, শাহ্আলী টাওয়ার (৫ম তলা), ঢাকা-১২১৫।
ফোন: +৮৮-০২-৫৫০১৩২৫২, ০১৯১৮২৮৬৬৮৩, ০১৮৬৪২১২৪১২
E-mail: iwsl2015@gmail.com

PHP Family

www.phpfamily.co

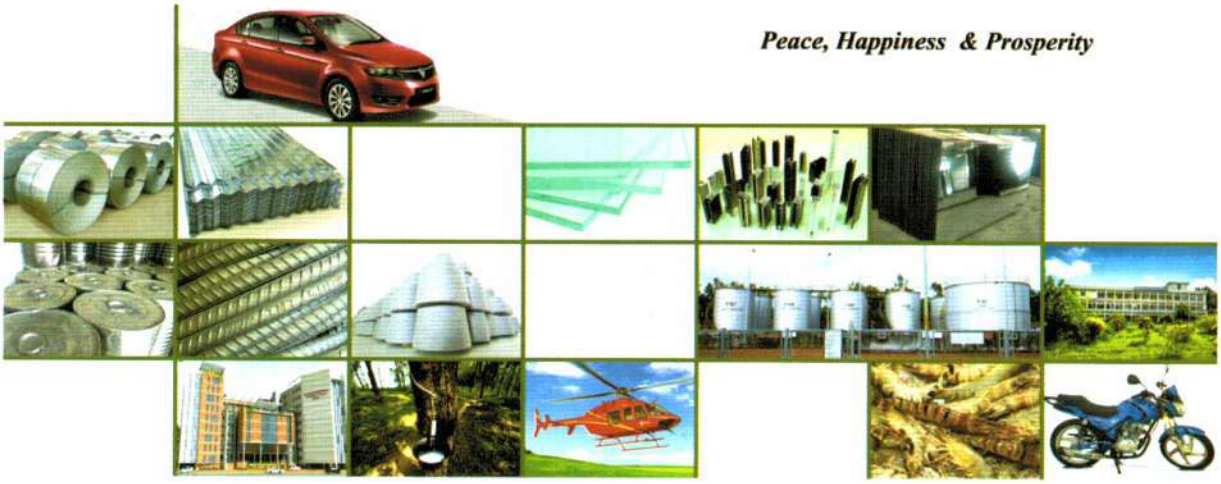

Peace, Happiness & Prosperity

Automobiles Aviation Healthcare Financial Services Ship Breaking & Re-cycling Latex & Rubber
Stocks & Securities Petro Refinery Education Property Management Steel Shipping
Insurance Power Electrical Equipment Textile Fisheries Media
Trading Glass Asphalt Aluminium Cold Storage

Serving The Nation in Silence

Corporate Office : PHP House, 31 Agrabad C/A, Chittagong, Bangladesh. Tel : +88-031-2511037-41, Fax : +88-031-726982

Temporary Office : PHP Centre, 40/1 Zakir Hossain Road, Chittagong, Bangladesh. Tel : +88-031-632316-21, Fax : +88-031-2854036

Holcim
Strong Structure

স্বপ্নের নির্মাণের পিছনের
কারিগরদের
অভিবাদন

VANITA
PREMIUM BATHROOM & KITCHEN TILES

Stunning & Supreme

Vanita Sugar Glaze Tiles
Glaze that shines in light

Premium textured bathroom & kitchen tiles with international designs for the first time in Bangladesh. Make your home glamorous and classy. Now get ready for compliments!

Vanita by Akij Ceramics

+880 1755621492-93

BY AKIJ CERAMICS

www.bsrm.com
'সম্ভব না' হলো সম্ভাবনা:
বিশাল পদ্মার বুকে প্রথম জাগলো স্বপ্নের স্থাপনা
জাতির এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে
তাঁর সময়োপযোগী দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও সাহসী নেতৃত্বের জন্য আমরা আন্তরিক অভিবাদন জানাই।
এই ন্যাশনাল প্রজেক্টে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সাথে নিবেদিত ভূমিকা পালনের জন্য আরো
অভিনন্দন জানাই সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় । সেতু বিভাগ । বাংলাদেশ ব্রিজ অথরিটি । বাংলাদেশ সেনাবাহিনী
কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন (কেইসি) । চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন-কে।
বিএসআরএম এই সম্ভাবনাময় মাইলফলকের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে এবং সম্মানজনক এই প্রকল্পে রিইনফোর্সড
স্টিল সরবরাহকারী হিসেবে মনোনীত হতে পেরে দারুণ গর্বিত। বড় ডায়ামিটার, অতি শক্তিশালী ও হাই ডাকটিলিটি-সম্পন্ন
ইস্পাতের চাহিদা অনুযায়ী BS 4449 Grade 500C-এর মানদণ্ড পুরোপুরি নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিএসআরএম তার প্রকৌশল সামর্থ্য
প্রমাণ করেছে। ইউ.কে-তে ৫০ লাখ সাইক্লিক লোডের ফ্যাটিগ টেস্টে টানা ৪ বছর ধরে সফলভাবে উত্তীর্ণ ৩২ এমএম, ৪০ এমএম
এবং ৫০ এমএম ডায়ামিটারের রিইনফোর্সড স্টিল উৎপাদনে সক্ষম দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম।
BSRM
building a safer nation

রঙ করতে
ঘরময়
ধুলো-ময়লা
আর নয়
বার্জার পেইন্টস্
বাংলাদেশ লিমিটেড-এর
পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা
সবার কাছে বাড়ি রঙ করা মানেই সারা ঘরে ধুলো-ময়লা এবং রঙের
ছড়াছড়ি। এইসব পেইন থেকে মুক্তি দিতেই বার্জার পেইন্টস্ নিয়ে
এসেছে এক্সপ্রেস পেইন্টিং টুলস্। বাড়ি রঙ করার এই আধুনিক
সার্ভিসে ট্রেইনিং প্রাপ্ত দক্ষ পেইন্টার দ্বারা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির
মাধ্যমে ধুলো-ময়লা কম ছড়িয়ে সাধারণ পদ্ধতির তুলনায় অনেক
কম সময়ে ঘর-বাড়ি রঙ করা যায়। রঙও হয় নিখুঁত উজ্জ্বল এবং
নিশ্চিত করে স্মুদ ফিনিশ।
BERGER
express
painting

কাপড়কে রাখে
নতুনের মতো উজ্জ্বল*
RIN
থাকুন উজ্জ্বল, সবসময়

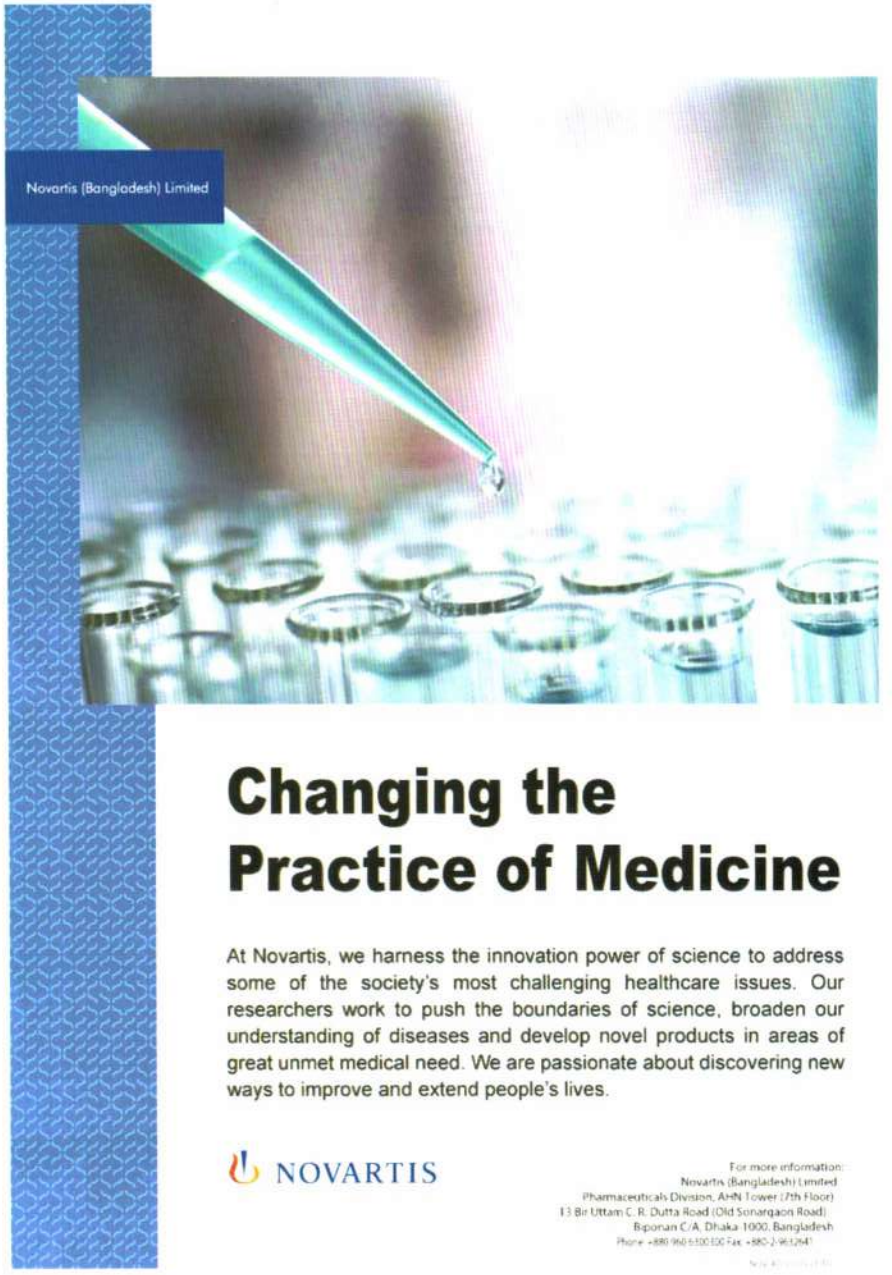
Novartis (Bangladesh) Limited
Changing the
Practice of Medicine
At Novartis, we harness the innovation power of science to address some of the society's most challenging healthcare issues. Our researchers work to push the boundaries of science, broaden our understanding of diseases and develop novel products in areas of great unmet medical need. We are passionate about discovering new ways to improve and extend people's lives.
NOVARTIS
For more information:
Novartis (Bangladesh) Limited
Pharmaceuticals Division, AHN Tower (7th Floor)
13 Bir Uttam C. R. Dutta Road (Old Sonargaon Road)
Biponan C/A, Dhaka-1000, Bangladesh

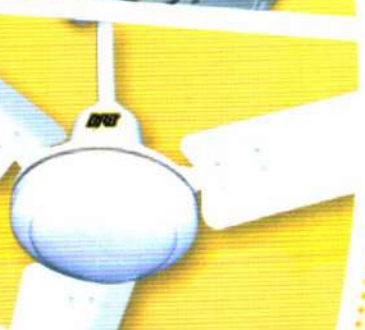

Since 1978
BRB
অন্যতম বিশ্বে...
...বাংলাদেশে শীর্ষে
আমাদের উৎপাদিত পণ্য সম্ভার
Achievements
President Award
Awarded by Honorable President
National Export Trophy (Gold)
Awarded by Honorable Prime Minister
Certification
ACM ISO 9001
UKAS
CPRI APPROVED
GL APPROVED
TÜV
Awards
BIZZ
NPO
বি এস টি আই অনুমোদিত
বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ
ISO 9001-2015 certified company
প্রধান কার্যালয় ও কারখানাঃ বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া-৭০০০, বাংলাদেশ
web: www.brbcable.com

The Shade of LIFE

PRAN

www.pranfoods.net

Delighting consumer taste buds across the globe, PRAN have taken the noble oath to ensure the best in quality brands of food and beverages to millions of people in more than 121 countries of the world. We are proud of our journey, which started in Bangladesh in 1981, to reach you. Our pursuit for happiness will continue till we see that precious smile of fulfillment on YOUR face!

ORION

ORION GROUP is a leading conglomerate in the country with diversified portfolios in Pharma & Healthcare, Construction & Real Estate, Cosmetics & Toiletries, Power Generation & Energy, Infrastructure Development, High-tech Agro Products, Food & Restaurant Chain, Sports & Events, Textiles & Garments and Home Appliance sectors. Apart from significant contribution in pharmaceutical and healthcare sector in the country over the years, Orion has heavily focused in power generation, engineering & construction and infrastructure development sectors of the country. Being involved into these, ORION is consistently successful in all major investment undertakings and is contributing significantly to the country's economic growth and stability through adoption of appropriate business to business strategy. In this context, Orion has successfully developed partnership with the government, Foreign lenders & exims as well as brought foreign, expertise and technology wherever required.

Corporate Office : Orion House, 153-154 Tejgaon Industrial Area, Dhaka-1208, Bangladesh. Tel : +88-02-8870133, Fax : +88-02-8870130. E-mail : orion@orion-group.net, Web : www.orion-group.net

BRITISH AMERICAN TOBACCO
BANGLADESH

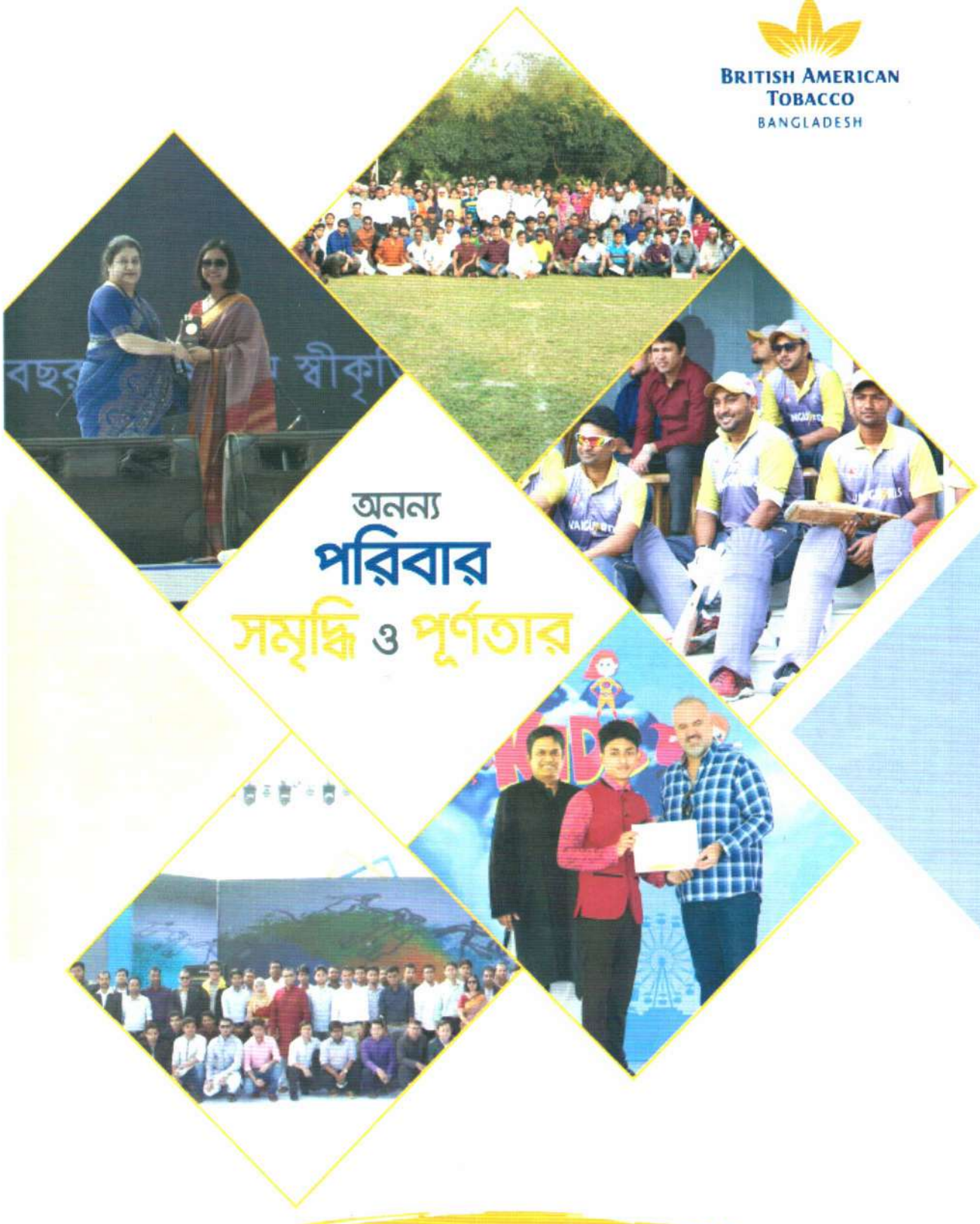

অনন্য পরিবার সমৃদ্ধি ও পূর্ণতার

THE WESTIN
DHAKA

Catering Excellence Through Perfection

Five Star Catering Experience at your Doorstep

- Specially crafted menu by our international masterchefs
- Fully equipped with state of the art logistics
- Compliant with all international standards of hygiene
- Full event management support
- Portable live stations

For reservations: **+88017556422023**

"কাজ শেষে সুস্থ শরীরে বাসায় ফিরব"

SR
KSL

কবির স্টিল লিমিটেড (জাহাজ বিভাজন বিভাগ)

বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

একটি হংকং কনভেনশন অনুযায়ী নির্মাণাধীন সবুজ-জাহাজ পুনঃপক্রিয়াজাতকরণ ইয়ার্ড

আমাদের নীতি

সবার আগে নিরাপত্তা পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা

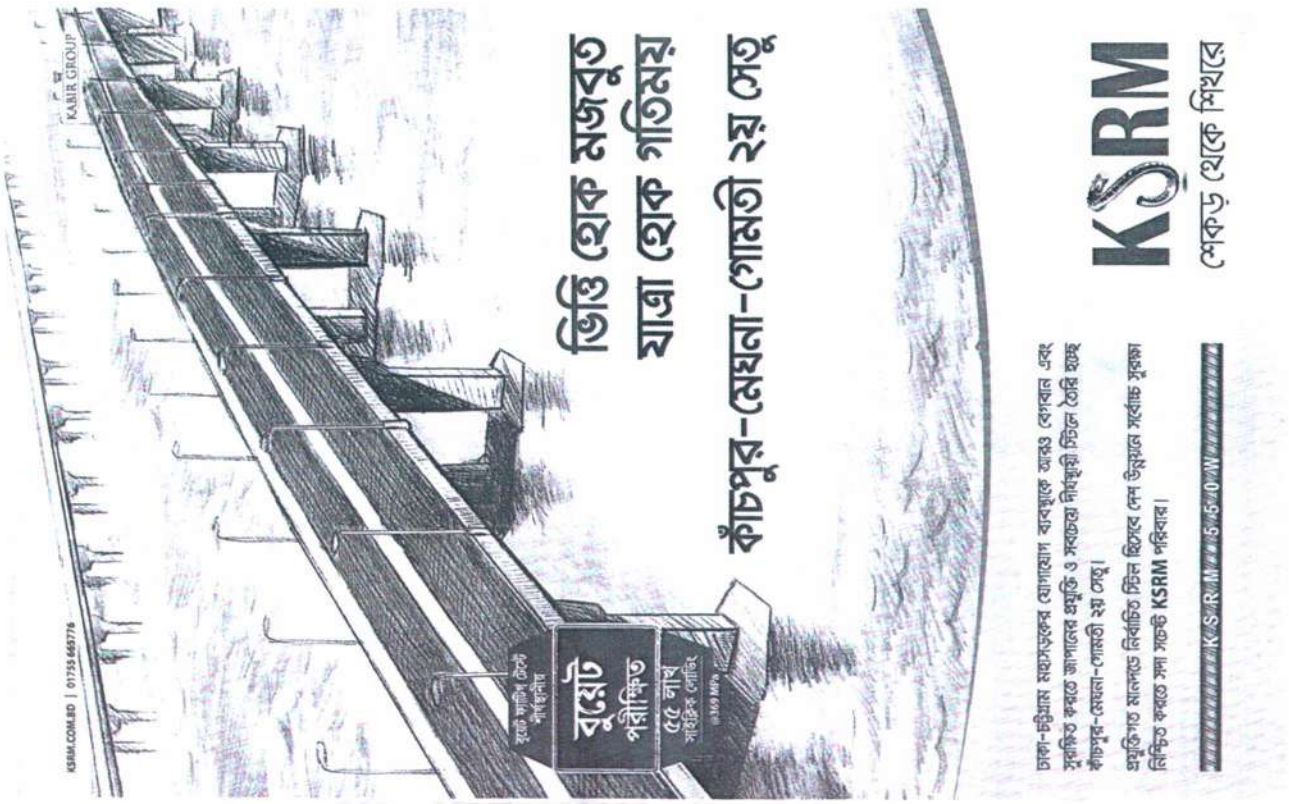

"কাজ শেষে সুস্থ শরীরে বাসায় ফিরব"

SR
KSBL

খাজা শীপ ব্রেকিং লিমিটেড

মাদাম বিবির হাট, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

একটি ISO ৯০০১, ১৪০০১, ১৮০০১ ও ৩০০০০ সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

আমাদের নীতি

সবার আগে নিরাপত্তা পরিবেশবান্ধব ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা

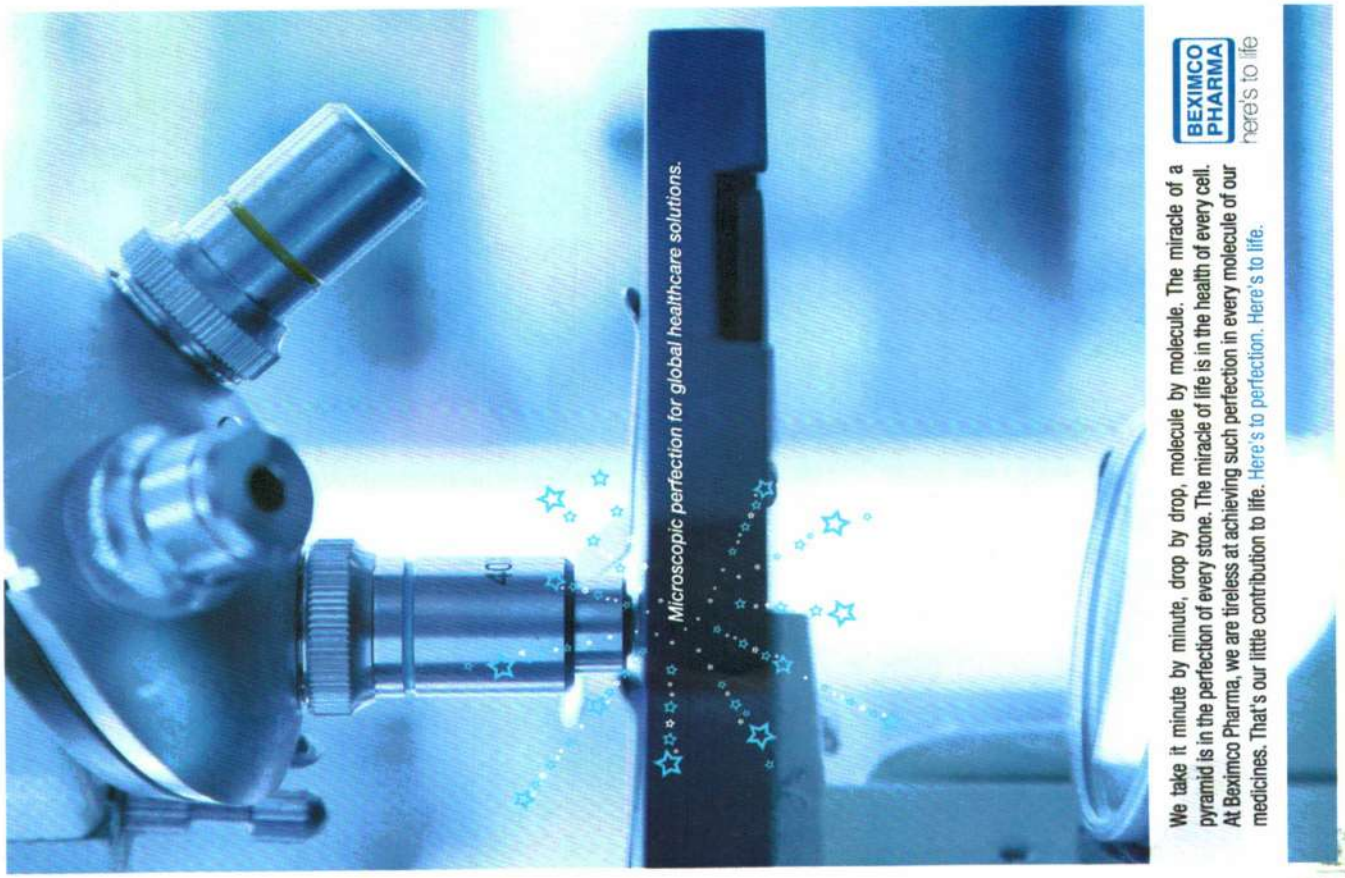

STATION 12
STATION 1
STATION 10
HARDWORKING
& COMFORTABLE WITH IT
HAPPY MAY 1ST DAY
মহান মে দিবস ২০১৮ এ
সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।
Bata

১৮ বছর ধরে
ভালোবাসার
কোমল যত্নে
বসুন্ধরা টিস্যু
Bashundhara
মে দিবস
শ্রমিকের ঘামের বিনিময়ে
পূর্ণতা পায় সকল শৈল্পিক সৃষ্টি...
বসুন্ধরা টিস্যু'র
পক্ষ থেকে তাঁদের জানাই
আন্তরিক ভালোবাসা
/hygienelovers.btissue
www.bashundharatissue.com
বসুন্ধরা পেপার মিলস্ লিঃ
কেয়ার লাইন: ১৬৩৩৯
Bashundhara
ATTA, MAIDA, SUJI
MADE BY EXPERTS FOR THE EXPERTS
বসুন্ধরা
আটা / ATTA
বসুন্ধরা
ব্রাউন আটা / BROWN ATTA
বসুন্ধরা
ময়দা / MAIDA
বসুন্ধরা
সুজি / SUJI
Bashundhara
Food & Beverage Industries Ltd.
The Home of Nutrition